মূর্ত্তিপূজার গোড়ার কথা

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

মূর্তিপূজার গোড়ার কথা

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায়
ইসলাম প্রচার সমিতি

ইপ্রস. ঢাকা

ইপ্রস প্রকাশনা নং : ১৮

প্রকাশনায় :
ইসলাম প্রচার সমিতি
১২৯, মিরপুর রোড
কলাবাগান, ঢাকা-৫

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর, ১৯৮২ ইং
আশ্বিন, ১৩৮৯ বাং
জেলহজ্জ, ১৪০২ হিঃ

স্বত্ত্বাধিকারে :
ইপ্রস, ঢাকা

মুদ্রণে :
চিশ্‌তিয়া প্রিন্টিং প্রেস
২২/২, শেখ সাহেব বাজার,
ঢাকা-৫।

প্রচ্ছদে : 'অংকন'
২৫৩, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

মূল্য :
সাদা—২০·০০ টাকা মাত্র
নিউজ—১৬·০০ ,,

প্রাপ্তিস্থান :

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস রোড
(বাংলা বাজার) ঢাকা-১

মদিনা পাবলিকেশন্স,
১, প্যারিদাস রোড
বাংলা বাজার, ঢাকা-১

শতাব্দী প্রকাশনী
৭১/এ, কাজী আলাউদ্দীন রোড
ঢাকা-২

মিল্লাত লাইব্রেরী,
২৫, নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার ঢাকা-১

প্রকাশনা বিভাগ
ইসলাম প্রচার সমিতি
১২৯, মিরপুর রোড,
কলাবাগান, ঢাকা-৫
ও
অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

MURTIPUJAR GORAR KATHA
(Idolatry & it's Origin)
By ABUL HOSSAIN BHATTACHERJEE
Published by : Islam Prochar Samity
Price : White—20·00 News—16·00

অনেক মনীষী বলেছেন :

"সত্যকে জানা কঠিন, গ্রহণ করা সুকঠিন এবং মেনে চলা সর্বাধিক কঠিন।"

শ্রদ্ধেয় মনীষীর অতি মূল্যবান কথাটির সাথে বিনয়ের সাথে একটি কথা আমরা যোগ করতে চাই। কথাটি হলো :

"একাজ যত কঠিনই হোক সত্যপ্রিয় মানুষদিগের কাছে তা কোন দিনই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা। কেননা, যাঁরা প্রকৃতই সত্যের সাধক সত্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তাঁদের কাছে জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা"।

একটি বিশেষ আবেদন ঃ

ইসলাম প্রচার সমিতি বিশেষ করে এর প্রকাশনা বিভাগের সৌজন্যে "মূর্তিপূজার গোড়ার কথা" আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলে ধরা সম্ভব হলো। উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৬৮ সাল থেকে এই সমিতি সীমিত সাধ্য-শক্তি অনুযায়ী সাধারণভাবে সকল মানুষ এবং বিশেষভাবে অমুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের কাছে ইসলামের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও সার্বজনীনতাকে তুলে ধরা এবং ইসলাম গ্রহণের কারণে যেসব নওমুসলিম নিঃস্ব ও নিঃসম্বল হয়ে পড়েন তাদের আশ্রয়, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্ততঃ এই উপমহাদেশে এ ধরণের আর কোন প্রতিষ্ঠান আছে কিনা সেকথা আমার জানা নেই। এর "নিউ কনভার্টস হোম"-এ এক সঙ্গে ৫৫ জন নওমুসলিমকে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা রয়েছে। সম্প্রতি সমিতির মহিলা বিভাগ খোলা হয়েছে। আপাততঃ ১০ জন নওমুসলিম মহিলা এখান থেকে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে বিভিন্ন কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে।

সমিতির প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক এ পর্যন্ত ২০ খানা পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। ডাকযোগে কুরআন অধ্যয়ন শাখার সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১৩ হাজারের উর্ধে। এবং ইপ্রস, কমার্শিয়াল কলেজে টাইপ ও সাঁটলিপি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বর্তমানে ৬০ জন।

আজিজনগর পার্বত্য চট্টগ্রাম ১০০ একর প্রকল্প, চট্টগ্রামের সিরাজুল ইসলাম ফাউন্ডেশন, ঢাকার অদূরে টঙ্গী ও ডেমড়ার বাস্তুহারা কলোনীর জনকল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি প্রকল্প ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ২৩টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে এই সমিতি জনসেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সদস্যবৃন্দের মাসিক চাঁদা, বিত্তশালী ব্যক্তিদিগের প্রদত্ত জাকাত, এককালীন দান, কোরবানীর চামড়া এবং পুস্তক পুস্তিকা বিক্রয়-লব্ধ অর্থ ছাড়া এর আয়ের স্থায়ী কোন উৎস নেই।

এই বিরাট ব্যয়বহুল অথচ অতীব প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানটির প্রতি সকলের সহানুভূতিশীল দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলির বহুল প্রচারে সহায়তা দানের জন্য শিক্ষিত ও ইসলাম দরদী ব্যক্তিদিগের কাছে বিশেষ আবেদন রেখে প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

বিনীত আরোজগুজার

আবুল হোসেন ভট্টাচার্য্য

পূর্বকথা

মহান আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে "মূর্তিপূজার গোড়ার কথা"কে আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলে ধরা সম্ভব হলো। এ জন্যে তাঁর মহান দরবারে জানাই অন্তরের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা।

আমি লেখক, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতির কোনটাই নই। পুস্তক লিখে প্রসংশা অর্জন, সম্মান লাভ, অর্থপ্রাপ্তি প্রভৃতির সামান্যতম ইচ্ছা এবং আগ্রহ আমার নেই; কেন নেই উপসংহারে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

আমার অতি নগণ্য জ্ঞানবুদ্ধি এবং দীর্ঘজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে যে সত্যের সন্ধান আমি পেয়েছি তাকে সত্য করে তুলে ধরাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

অতএব আমার দুর্বল ও অযোগ্য হাতে কোনরূপে আমার কথাগুলোকে পরিবেশনের চেষ্টা আমি করেছি। কতটুকু সফল হয়েছি অথবা মোটেই হয়েছি কিনা তা সুধী পাঠক বর্গেরই বিচার্য।

আধুনিক পাঠকদিগের ধৈর্য, কর্মব্যস্ততা, ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠের মন-মানসিকতা, কাগজের ক্রমবর্ধমান উর্ধমূল্য, ছাপা খরচের প্রশ্ন প্রভৃতির কথা চিন্তা করে অনেক বন্ধু-বান্ধব এবং হীতাকাংখী ব্যক্তি ক্ষুদ্র আকারের পুস্তিকা প্রকাশের উপদেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু একেতো মূর্তিপূজার সূচনা এবং ব্যাপ্তি এমনই একটি বিষয় যা অল্প কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে অল্প কথায় মনের ভাবকে তুলে ধরার কাজে আমার দুঃখজনক অযোগ্যতা, আর সর্বোপরী এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কথাগুলোকে পুষে রাখা এবং আমার সাথে সাথে কবরে নিয়ে পঁচিয়ে ফেলার ইচ্ছা না থাকা প্রভৃতি কারণে তাঁদের অতি মূল্যবান এবং একান্ত সময়োপযোগী উপদেশ পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। সেজন্যে আমি সকাতরে তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

তবে তাঁদের মূল্যবান উপদেশের কথা মনে রেখে মূর্তিপূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে এমন ভাবেই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি যাতে মূর্তিপূজা সংক্রান্ত যে বিষয়টি যিনি জানতে আগ্রহী সূচীপত্র দেখে ঠিক সে বিষয়টিকে তিনি বেছে নিতে পারেন।

পৃথিবীর উদ্দেশ্যে রচিত একটি সূক্ত আছে (৫।৮৪)। সেখানে পৃথিবীকে পর্বত সকলের ধারক রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন গাছ-গুলি শূন্যে পড়েনা—কারণ পৃথিবী তাদের দৃঢ় ভাবে ধরে রাখে।

৩) অপ—জল অন্তরীক্ষে উৎপন্ন হয় এবং খাদে প্রবাহিত হয়। তা সমুদ্রের দিকে গমন করে। জল বৃষ্টি পান করে। তা অন্ন সঞ্চয়, করে দেয়। জল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে। জল স্নেহময়ী জননীর মত। জল মানুষকে শুদ্ধ করে। তাই আমরা তাকে মাথায় ঢালি। জল মানুষকে দুস্কৃতি হতে মুক্তি দেয়। এই ধরণের ধারণা হতেই বোধ হয় পরবর্তী কালে নদীতে স্নানের রীতি হিন্দু সমাজে প্রচলিত হয়ে ছিল। জলের উপরে চারটি সূক্ত আছে।

৪) সোম—নামে এক শ্রেণীর লতা ছিল। পার্বত্য অঞ্চলে সে লতাগুলি জন্মাতো। তার পাতা পাথরে নিষ্পেষিত হয়ে যে রস বাহির হ'ত তাকেই সোম বলা হয়।

বিভিন্ন সূক্তে সোম কিভাবে উৎপাদিত হত তার বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথমে তা জল দিয়ে ধোয়া হত। তারপর পাথর দিয়ে নিষ্পিষ্ট হত। তার রঙ ছিল হরিত বর্ণ। তারপর তা যজ্ঞে ব্যবহারের জন্য কলসের মধ্যে স্থাপিত হত। তাকে দুধের সঙ্গে মেশান হত।

অগ্নিতে যেমন ঘৃত আহুতি দেয়া হত তেমন সোমেরও আহুতি দেওয়া হত। বর্ণনা আছে—সোম পান করে ইন্দ্রের শক্তি বর্ধিত হত। সেকালের মানুষও সোম পান করে উৎফুল্ল হত। তা নিশ্চয় তাদের প্রিয় পানীয় ছিল, যেমন ঘৃত তাদের প্রিয় খাদ্য ছিল। তাই দেবতাদের নিকটও তা আহুতি আকারে দেওয়া হত।

মনে হয় সোম রস--অত্যন্ত প্রিয় পানীয় ছিল এবং সেই কারণে তা একজন বিশিষ্ট দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে জন্য দেখি তার উদ্দেশ্যে ১২০টি সূক্ত রচিত হয়েছে। সমগ্র নবম মন্ডলে যতগুলি সূক্ত আছে—সবই পবমান সোমের উদ্দেশ্যে রচিত। 'পবমান' অর্থ ক্ষরণশীল। অর্থাৎ সোম রসই এখানে দেবতা।

দুর্ভাগ্য ক্রমে এই সোমলতার কোনও সন্ধান এখন পাওয়া যায় না। সরস্বতী

নদীর মত তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল তার স্মৃতি এবং অশেষ গুণের কথা ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে রক্ষিত হয়ে আছে।

অন্তরীক্ষ স্থানের দেবতা

৫) **ইন্দ্র**—একদিক হতে বিবেচনা করলে ইন্দ্র ঋগ্বেদের মধ্যে প্রধান। ঋগ্বেদের সূক্তগুলির এক চতুর্থাংশ তাঁর প্রশস্তিতে নিবেদিত।

দুর্দমনীয় যোদ্ধারূপেই তিনি পরিকল্পিত। অগ্নি এবং পূষা তাঁর ভ্রাতা। মরুৎগণ—তাঁর সহায়। বজ্র তাঁর অস্ত্র। ত্বষ্টা তাঁর জন্য বজ্র নির্মাণ করেছিলেন। কোথাও তা লৌহ নির্মিত বলে উল্লেখ হয়েছে কোথাও প্রস্তর নির্মিত বলে উল্লেখ হয়েছে। দুটি হরিত বর্ণ অশ্বদ্বারা পরিচালিত সোনার রথে তিনি আরোহণ করেন। তিনি সোমরস পান করতে ভাল বাসেন।

তাকে প্রধানত তিনটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। প্রথমত, তিনি বৃত্রকে সংহার করে মেঘ হতে বারিবর্ষণের পথ উন্মুক্ত করে দেন। দ্বিতীয়ত তিনি দেবতায় অবিশ্বাসী মানুষদের দুর্গ সমন্বিত আবাস স্থানগুলি ধ্বংস করে তাদের বিনাশ করেন। তৃতীয়ত, তিনি বিষ্ণুকে সংরক্ষিত করার জন্য অনেক-গুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছেন।

বৃত্রকে কোথাও অহিও বলা হয়েছে। যে সব বর্ণনা পাই তা হতে মনে হয় মেঘের মধ্যে বারিকে অবরুদ্ধ করে রাখে যে শক্তি তাকেই বৃত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে। বৃত্র বারিধারা পুষ্ট হয়ে নদীগুলিকে প্রবাহিত হতে দেয় না। তাই সে দানবরূপে কল্পিত। তার ক্রোধ হতে উৎপন্ন আর একটি দানব ছিল। তার নাম শুষ্ণ। ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করে উভয়কেই বধ করে ছিলেন। ফলে মেঘের মধ্যে আবদ্ধ সঞ্চিত বারিধারা মুক্ত ও ভূপতিত হয়ে নদীগুলিকে পুষ্ট করেছিল।

তাঁর দ্বিতীয় ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত তার একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও আছে। তিনি এই ভূমিকায় বীর যোদ্ধারূপে পরিকল্পিত। তিনি আর্য জাতির রক্ষক। তার জন্য তিনি দস্যুদের বধ করতেও কুন্ঠিত নন। (৩।৩৪।৯)। এই দস্যুদের দাসও বলা হয় এবং আর্য জাতি হতে পৃথক করা হয় (১০।১০২।৩)। তিনি শত্রুদের পরাজিত করবার জন্য বল দ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংশ করেন (১।৫৬।৭)।

এই সব উক্তি হতে মনে হয়—আর্য জাতির ভারতে প্রবেশের পর স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত সংঘর্ষ হয়। তাদেরই দাস বা দস্যু বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হরাপ্পা সংস্কৃতি আবিস্কারের পর আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে এদেশে আর্যদের আগমনের আগে—যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা তাদের থেকে উন্নত মানের ; তা নগর ভিত্তিক সংস্কৃতি। সুতরাং তাদের জয় করতে হলে নগর ধ্বংস করা প্রয়োজন। সম্ভবত আর্যদের কোনও পরাক্রান্ত নেতা স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানে আর্যদের যুদ্ধে নেতৃত্ব গ্রহণ করে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁরই আদর্শে যেন ইন্দ্র পরিকল্পিত হয়েছেন। তাই তাঁর আর এক নাম পুরন্দর। এও বলা হয়েছে তিনি বিপক্ষ নগরগুলি ভেদ করেছেন এবং শত্রুর অস্ত্র নত করেছেন (১।১৭৪।৮)।

তাঁর তৃতীয় ভূমিকা হল তিনি বিশ্ব স্থিতির জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কায করেছেন। তিনি পৃথিবীকে দৃঢ় করেছেন। পর্বতদের সংহত করেছেন। তিনি আন্তরীক্ষ নির্মান করেছেন এবং দ্যুলোক স্তম্ভিত করেছেন।

৬) **রুদ্র**—রুদ্রকে উদ্দেশ্য করে মাত্র তিনটি সুক্ত আছে। কিন্তু তার তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। ঋগ্বেদে শিবের উল্লেখ নাই। কিন্তু শিব পৌরানিক যুগে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেবতা রূপে পরিগণিত হন। রুদ্রই সম্ভবত পরবর্তী কালে শিবে—পরিণত হয়েছেন।

রুদ্রের সাথে মরুৎগণের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। রুদ্র তাঁদের পিতা এবং পৃশ্নি অর্থাৎ ঝড়ের মেঘ তাঁদের মাতা। বেদে রুদ্রের যে চিত্র আঁকা হয়েছে তাতে তিনি ক্রোধপরায়ন এবং ধ্বংস প্রবণ রূপে পরিকল্পিত। এখানে ভক্তির প্রেরণা যেন ভয়। তাঁকে হব্য দিয়ে খুশী করবার চেষ্টা করা হয় যাতে তিনি মানুষ, পশু ইত্যাদি হিংসা হতে বিরত থাকেন (১।১১৪।৮). তিনি উগ্র স্বভাব (২।৩৩।৯) এবং ক্রোধ পরায়ণ (২।৩৩।৫)। তবে তিনি সর্ব শ্রেষ্ঠ ভিষকরূপে খ্যাত (২।৩৩।৪) সুতরাং তাঁর একটি কল্যাণের দিকও আছে।

৭) **পর্জন্য**—পর্জন্যের উদ্দেশ্যে মাত্র তিনটি সুক্ত রচিত হয়েছে। যিনি অন্তরীক্ষের পুত্র রূপে পরিকল্পিত (৭।১০২।১)। পর্জন্য মেঘ দিয়ে অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করেন। তিনি মেঘ হতে বারি বর্ষণ করেন। ফলে গবাদি পশু

পুষ্টিলাভ করে, ওষধি সকল উজ্জীবিত হয় ; নদী অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হয়। এই ভাবে পর্জন্য পৃথিবীর সকল জীবের হীত সাধন করে (৫।৮৩)।

দ্যু স্থানের দেবতা

৮) **সূর্য**—সূর্য বেগবান অশ্ব রথে যুক্ত করে আকাশ পথে গমন করেন (১০।৩৭।৩)। আবার বলা হয়েছে—তিনি হরিৎ নামে সাতটি অশ্বীবাহিত রথে চলেন। জ্যোতি তাঁর কেশ (১।৫০।৮)। সূর্য আকাশে ঊষাকে অনুসরণ করে। সূর্য সকল স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীর আত্মাস্বরূপ (১।১১৫।১)। সূর্যের রোগ বিনাশক শক্তিরও উল্লেখ করা হয়েছে। সূর্য হৃদরোগ হতে মানুষকে মুক্ত করেন এবং হরিমান রোগ সারিয়ে দেন (১।৫০।১১-১২)। সম্ভবত পশুরোগ বা ন্যাবা রোগকে হরিমান রোগ বলা হত। কারণ তাকে হরিদ্রায় স্থাপন করার উল্লেখ আছে। বিশ্ব-ভুবন এবং প্রাণিবর্গ সূর্যের আশ্রিত (১০।৩৭।১)।

৯) **সবিতা** সবিতা সূর্যের কিরণে কিরণ যুক্ত। তিনি উজ্জ্বল কেশ বিশিষ্ট (১০।১৩৯।১)। সবিতা জ্ঞানী, সুমহান ও পুজনীয় (৫।৮১।১)। সবিতা পিশঙ্গ পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তিনি প্রতিদিন জগৎকে নিজ নিজ কার্যে স্থাপন করেন (৪।৫৩।৩)। মনে হয় সবিতার ধীশক্তির জন্য তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রটি রচিত হয়েছে। মন্ত্রটি তৃতীয় মন্ডলের ৬২তম সুক্তের দশম ঋকে পাওয়া যায়। মনে হয় সূর্যের সঙ্গে সবিতার সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ট। দশম মন্ডলের ১৫৮ সুক্তে দেখা যায় সূর্যকে কখনও সূর্য বলা হয়েছে, কখনও সবিতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে। সম্ভবত তাঁরা ভিন্ন নামে পরিচিত অভিন্ন দেবতা।

১০) **বিষ্ণু**—বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবনে অবস্থিত করেন (১/১৫৪/২)। মানুষ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ দেখতে পায় কিন্ত তাঁর তৃতীয় পদক্ষেপ ধারণা করতে পারে না। উপরে যেসব পাখী ওড়ে তারাও তা ধারনা করতে পারেনা (১।১৫৫।৫)। সম্ভবত এই তিন পদক্ষেপ সূর্যেরই আকাশে তিন স্থানে অবস্থিতির ইঙ্গিত করে।

প্রাতঃকালে সূর্য দিগন্তে, সন্ধ্যায় পশ্চিম দিগন্তে এবং মধ্যাহ্নে আকাশের

মধ্যস্থলে। মধ্যে গগণে যখন সূর্য বিরাজ করে তখন তা মানুষের বা পাখীর নাগালের বাইরে চলে যায়। এই সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে একটি তাৎপর্য পূর্ণ উক্তি আছে। তা বলে—বিষ্ণু বৎসরের চারটি নব্বই দিবসের সমষ্টি নিয়ে বৎসরের চক্র। কাজেই বিষ্ণু ঋতুর নিয়ামক দেবতা। এদিক থেকে দেখলেও তিনি সূর্যেরই সমস্থানীয় হয়ে দাঁড়ান।

১১) **মিত্র**—মিত্র পৃথিবী ও দ্যু লোককে ধারণ করে আছেন। তিনি অনিমেষ নেত্রে সকলের দিকে চেয়ে আছেন (৩।৫৯।১১)। তিনি নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করেছেন (৩।৫৯।৭)।

প্রত্যুষে সূর্যোদয় হলে মিত্র লৌহকীলক সমন্বিত সুবর্ণ নির্মিত রথে আরোহণ করেন (৫।৬২।৮)। দ্যুতিমান সূর্য মিত্র ও বরুণের চক্ষু স্বরূপ (৭।৬৩।১)। কেবল মিত্রকে অবলম্বন করে মাত্র কয়েকটি সূক্ত আছে। মিত্র ও বরুণকে একত্র করে অনেকগুলি সূক্ত আছে। সেগুলি এমন ভাবে রচিত যে কোনটি মিত্রের বিশেষ গুণের পরিচায়ক তা বোঝা যায় না। তবে এটা বোঝা যায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সংযোগ-আছে। তিনি কি সূর্যের আনুসঙ্গিক দেবতা ?

১২) **পূষা**—পূষা দীপ্তি সম্পন্ন (৬।৫৩।৩)। ছাগ তাঁর বাহন (৬।৫৫।৪) তিনি রথি শ্রেষ্ঠ। তিনি সূর্যের হিরন্ময় রথচক্র নিয়ত পরিচালিত করছেন (৬।৫৬।৩)। আবার বলা হয়েছে তিনি সূর্যের দৌত্য কার্য সম্পাদন করেন এমন কি সূর্য রূপে প্রাণীদের প্রকাশিত করেন (৬।৫৮।২)। ঊষা তার ভগিণী। রাত্রি তাঁর পত্নী (৬।৫৫।৫)।

এসব বর্ণনা হতে পূষা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেনা। মোটা-মুটি মনে হয় সূর্যের সাথে তাঁর নিবিড় ঘনিষ্টতা আছে। বোধ হয় সূর্যের রথচালক রূপে তাঁর ভূমিকাই সব থেকে গ্রহণ যোগ্য। ১০।৯৩২।৪ সূক্তে বলা হয়েছে তিনি সূর্য হতে ভিন্ন।

১৩) **বরুণ**—বরুণ মহা দেবতারূপে কল্পিত। তিনি শোভন কর্মা। তিনি মানুষের জন্য অন্নের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি দ্যুলোক, ভূলোক ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান (১।২৫।২০)।

বরুণ জগতের নায়ক। তিনি জল সৃষ্টি করেছেন। বরুণের নির্দেশে

নদী সকল প্রবাহিত হয় (২।২৮।৪)। তিনি সূর্যের পরিক্রমনের জন্য অন্ত-রীক্ষকে বিস্তারীত করেছেন, অশ্বগণকে বল, ধেনুগণকে দুগ্ধ এবং হৃদয়ে সংকল্প প্রদান করেছেন।

তিনি স্পষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন। তাঁর সুমহতী প্রজ্ঞা (৫।৮৫।৬)। তিনি সূর্যকে দীপ্তির জন্য নির্মাণ করেছেন। তিনি সমুদ্রকে স্থাপন করেছেন। তিনি সমস্ত সৎপদার্থের রাজা। অপরাধ করলে বরুণ দয়া করেন (৭।৮৭।৭)। বরুণ ভুবন সমূহের ধারক, তিনি সপ্ত সিন্ধুর ঈশ্বর (৮।৪১।৯)। বরুণ সমস্ত ভুবনের সম্রাট, আমরা তাঁর ক্রোড়ে বর্তমান (২।৪২।২)।

উপরে যে তথ্যগুলি স্থাপিত হয়েছে তা হ'তে বরুণ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ঋগ্বেদের এক চতুর্থাংশ সূক্ত নিবেদিত। বরুণের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তের সংখ্যা খুবই কম। মিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত আকারে অনেকগুলি সূক্ত পাওয়া যায়; কিন্তু তাদের মধ্যে বরুণের বৈশিষ্ট পরিস্ফুট হয়ে উঠেনি। তাতে কিছু যায় আসে না। উপরে বরুণের উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তগুলি হতে যে তথ্য সংগৃহিত হয়েছে তা হতেই তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়।

বরুণ জগতের নায়ক। তাঁর নির্দেশেই নদী সকল প্রবাহিত হয়ে পৃথি-বীকে শস্য মন্ডিত করে। সুতরাং তিনি বিশ্বের রাজা। তিনি ধৃতব্রত। বিশ্বকে পরিচালিত করবার কাজে তিনি নিযুক্ত। তিনি বিশ্বকে ক্রোড়ে ধারণ করেন। তিনি প্রজ্ঞাবান। তিনি অন্যায় সহ্য করেন না; কিন্তু অন্যায়কারীকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং তিনি অনেক মহৎ গুণের আকর। এইদিক থেকে বিবেচনা করলে তিনি সুনিশ্চিত ভাবে বৈদিক দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে ইন্দ্রের চরিত্রের তুলনা করা যেতে পারে। ইন্দ্র বীর্যবান, তিনি সোমরস পান করতে ভালবাসেন। তাঁর যোদ্ধা হিসাবে ভূমিকাটিই সব থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বৃত্রকে হত্যা করে মেঘ হতে বারিবর্ষণের পথ সুগম করে দেন। তিনি আর্য জাতির বন্ধু। তিনি দাস জাতির শত্রু। তিনি দাস জাতির শত শত দূর্গ ধ্বংস করে পুরন্দর নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ইন্দ্র মহৎ নন, তিনি বীর। বরুণ বীর

নন, তিনি নানা মহৎ গুণের আধার। নানা মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করে তিনি ধৃতব্রত আখ্যা পেয়েছেন। ইন্দ্রকে আমরা ভয় করব; কিন্তু বরুণকে আমরা ভক্তি করব।

১৪) **দ্যু**—দ্যু সম্বন্ধে কোনও পৃথক সূক্ত ঋগ্বেদে নাই। দ্যু ও পৃথিবীকে যুক্ত করে গুটি কয়েক সূক্ত পাওয়া যায়। সেই সূক্তগুলি হতে দ্যু সম্বন্ধে পৃথক ধারণা করা যায় এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না। মোটামুটি দ্যু'কে বিশ্বের পিতা বলে কল্পনা করা হয়েছে এবং পৃথিবীকে মাতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। বিশ্বের পিতা মাতা হিসেবে তাঁদের যুক্ত ভাবে গুণ কীর্তন আছে এবং তাঁদের কাছে অনেক ধরণের প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে।

১৫) অশ্বিযুগল—অশ্বিদ্বয়ের উপর গুটি পঞ্চাশেক সূক্ত রচিত হয়েছে। তাঁদের তাঁদের রথের তিনটি চাকা আছে, রথটি ত্রিকোণ (১/৩৪/৫)। তাঁদের প্রথমে আকাশে আবির্ভাব হয়। উষা তাঁদের অনুসরণ করেন (১/৪৬/১৪১)। তাঁরা চবন ঋষিকে জরামুক্ত করেছিলেন (১/১১৬/১০) এবং ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন (১/১১৬/১৬) তাঁরা উৎকৃষ্ট ভিষক (১/১৫৭/৬)। অশ্বিদ্বয় মধুবিদ্যা-বিশারদ (৫/৭৫/৯)। মধুবিদ্যা কি জানা নেই। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুবিদ্যার কথা আছে। কিন্তু তা আধ্যাত্মবিদ্যার সমার্থ বোধক। সে অর্থে নিশ্চিত ঋগ্বেদে তা ব্যবহৃত হয়নি।

অশ্বিযুগলের বিষয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক যে তথ্য পাওয়া যায় তা'হল তাঁরা সূর্যের দুহিতা সূর্যাকে বিবাহ করেছিলেন। এ বিষয়ে ১/১১৯/৫ ও ৫/৭৩/৫ সূক্তে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই দুই দেবতার সঙ্গে সূর্যার বিবাহের বিস্তারিত বিবরণ পাই ১০/৮৫ সূক্তে।

যেখানে বলা হয়েছে সোম সূর্যার পানি প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু তিনি অশ্বিদ্বয়কেই পতিত্বে বরণ করিলেন। সুতরাং এখানে একটি অভিনব তথ্য পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে এক নারীর একাধিক পতি থাকতে পারত। সুতরাং দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চ পাণ্ডবের বিবাহের অতীতে যে কোনও নজির ছিলনা তা বলা যায় না।

১৬) **উষা**—উষা আকাশের দুহিতা (১/৯২/৭)। সূর্য তাঁর পতি

(১/৯২/১১)। উষা রাত্রির ভগিনী (১/১১৩/৩। উষা অরুণ অশ্বযুক্ত রথে আগমন করেন এবং আগে আগে গিয়ে সূর্যের গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করে দেন (১/১১৩/১৬)। গৃহিনী জাগরিত হয়ে যেমন সকলকে জাগরিত করেন উষা তেমন বিশ্ববাসীকে জাগরিত করেন (১/১২৪/৪)। উষা আদিত্যের দুহিতা রূপেও কল্পিত হয়েছেন ৪/৫১/১। বিকল্পে বলা হয়েছে উষা অরুণবর্ণ বলীবর্দ রথে যোজনা করেন (৫/৮০/৩।

১৭) **রাত্রি**—কেবল রাত্রিকে বিষয় করে মাত্র একটি সূক্ত পাওয়া যায়। তবে উষা সম্বন্ধে যে সব সূক্ত রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে অনেক গুলিতে রাত্রি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। রাত্রি কৃষ্ণ বর্ণা ও উষা শুভ্রবর্ণা (৬/১২৩/৯)। উভয়ে পরস্পর ভাগিনী রূপে কল্পিত। তাঁদের মধ্য কোনও বিরোধ নেই। কেউ কাউকে বাধা দেন না এবং স্থির ভাবে অবস্থান করেন না। তাঁরা একের পর অন্যে একই পথে বিচরণ করেন (১/১১৩/৩) উষা রাত্রির জ্যেষ্ঠা ভাগিনী (১/১২৪/৮)। রাত্রি নক্ষত্র যুক্ত হয়ে শোভা ধারণ করেন। উষার আগমনে যেমন নানা জীব জেগে ওঠে রাত্রির আগমনে সকলে শয়ন করে নিদ্রা যায়। রাত্রি আকাশের কন্যা (১০/১২৭/৮)।

১৭) যম—যম সম্বন্ধে মাত্র দুইটি সূক্ত আছে। দুটিই দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিতে (১০/১৫) যম ও যমীর কথোপকথন পাই। যম ও যমীর সম্বন্ধ ভ্রাতা ও ভগিনী। এখানে যমী যমের সহিত সহবাস কামনা করছেন। কিন্তু যম প্রত্যাখ্যান করছেন এই বলে যে সহোদরা ভাগিনী অগম্যা। ভাগিনীতে যে উপগত হয় সে পাপী। অপর সূক্তটিতে (১০/১৪) যম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। যম পিতৃলোকের রাজা। তা স্বর্গে অবস্থিত। প্রেতাত্মাদিগের যমই পথ দেখিয়ে সেখানে নিয়ে যান, সেস্থান আলোকোজ্জ্বল। পিতৃ লোকের দ্বারের পাহারা দিচ্ছে দুটি কুকুর। তাদের বর্ণ বিচিত্র এবং চারটি করে চক্ষু।

১৯) **বৃহস্পতি**— মনে হয় বৃহস্পতির সঙ্গে ব্রহ্মণস্পতির খুব ঘনিষ্ট সংযোগ আছে। বৃহস্পতি মন্ত্র উৎপাদন করেন (২/২৩/২) এবং বৃহস্পতি মন্ত্র সমূহের স্বামী (২/২৩/১)। বৃহস্পতি ভাল মন্ত্র উচ্চারণ করেন (১/৪০)। বৃহস্পতি পুরোহিত (২/২৪/৯ বৃহস্পতি প্রভৃত প্রজ্ঞাবান (৪/৫০/২) বৃহ-

শপতি অমিত্রদের অভিভূত করেন এবং পুরী সকল বিদীর্ণ করেন (৬/৭৩/২)। এখানে মনে হয় তিনি ইন্দ্রের অনুরূপ আচরণ করেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বেদ থেকে দেবতাদিগের সংখ্যা কত সুনির্দিষ্ট রূপে তা' জানা সম্ভব নয়। ৩/৯/৯ এবং ১০/৫১/৬ ঋক্ অনুযায়ী এই সংখ্যা যে ৩৩৩৯; ইতিপূর্বে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি। অথচ কোন বেদেই এতগুলি দেবতার নাম এবং পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই সংখ্যার মধ্যে যে প্রস্তর খন্ড, ধনুক, মন্ডূক (ভেক) প্রভৃতিকেও দেবতা হিসাবে ধরা হয়েছে ইতিপূর্বে সে কথাও আমরা জানতে পেরেছি। এমতাবস্থায় আসলে দেবতা বলতে কি বুঝায় বেদ থেকে সে কথা বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

উপরে প্রসিদ্ধ এবং প্রায় সর্বজন পরিচিত কতিপয় দেবতার নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মাঝে রাত্রি, উষা, পর্জন্য, সূর্য, সবিতা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা এবং প্রাকৃতিক পদার্থকে দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এদের যে পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে তা-ও অদ্ভুত।

বরুণ, বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতির যে সব পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে এ'রা প্রসিদ্ধ বীর অথবা বিশেষ প্রভাবশালী মানুষ ছিলেন বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। তবে এদের কার্য্যকলাপ এবং অলৌকিকত্ব সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়েছে তা থেকে এ' দিগকে অতিমানব বলে ধারণা সৃষ্টিই স্বাভাবিক. আর হয়েছেও তা-ই।"

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বলতে পারি যে মূর্তি বা প্রতিমা বলতে বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি বা প্রতিমাকেই বুঝায় এবং এইসব মূর্তি বা প্রতিমাদিগকেই উপাস্য জ্ঞানে পূজা করা হয়ে থাকে। সেই কারণেই দেব দেবী বা দেবতা বলতে কি বুঝায় এতক্ষণ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হল

বৈদিক যুগে দেব দেবী বা দেবতাদিগের প্রতি বিশ্বাস গড়ে' উঠার প্রমাণ এই আলোচনা থেকে পাওয়া গেল। এখন জানা আবশ্যক যে—সে সময়ে এসবের মূর্তি নির্মাণ এবং পাদ্য অর্ঘ ও ভোগ নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়ে আধুনিক কালের মতো পূজার্চনার ব্যবস্থা ছিল কি না।

সেকথা জানতে হলে তদানিন্তন কালের উপাসনা পদ্ধতির সাথে আমাদিগকে অবশ্যই পরিচিত হতে হবে। অতএব সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে :

বেদ এবং গীতায় চার শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে। তারা হ'ল—আর্ত, অর্থার্থী, ভক্ত এবং জিজ্ঞাসু।

যে আর্ত সে বিপদ থেকে পরিত্রাণ লাভ, যে অর্থার্থী সে অভাব বা ইচ্ছা পূরণ, যে ভক্ত সে শ্রদ্ধা নিবেদন আর যে জিজ্ঞাসু সে তার অনুসন্ধিৎসা মিটানোর জন্য কোন না কোন শক্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায় এবং প্রাণের আকুতি প্রকাশ করে।

বেদের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে এটা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায় যে—বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্ত এবং অর্থার্থীর মনোভাব নিয়েই ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত দেব দেবী তথা অগ্নি, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ, রাত্রি, উষা, পর্জন্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ইন্দ্র, বরুণ, যম, বিষ্ণু প্রভৃতি বীর বা অনন্য সাধারণ মানুষদিগের উদ্দেশ্যে প্রশস্তি মূলক বেদমন্ত্র রচনা করতঃ উপাস্য জ্ঞানে তাদের উদ্দেশ্যে উহা পাঠ করা হয়েছে এবং কাতরভাবে প্রাণের আকুতি প্রকাশ করা হয়েছে।

বৈদিক যুগে এই প্রশস্তিগান ও আকুতি প্রকাশের রীতিটি ছিল অনন্য সাধারণ। পৃথিবীর কোন দেশে ইহা প্রচলিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই রীতির নাম—যজ্ঞ। অবশ্য পারস্যের মানুষেরা যজ্ঞের অনুকরণে অগ্নি পূজা করতেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে—সেকালের ঋষিরা প্রকৃতির বুকে যেখানেই শক্তি বা সৌন্দর্যের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন তার উপরেই দেবত্ব আরোপ করতঃ স্তোত্র রচনা করেছেন। এই স্তোত্রের নাম তাঁরা দিয়েছেন—সূক্ত।

বলাবাহুল্য এমনি ভাবেই অগ্নি দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অগ্নি শুধু দেবতা-ই নন—তিনি পুরোহিতও। কেননা অগ্নিতেই অন্য দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করা হ'ত।

এমন ভাবে বায়ু, বরুণ, সূর্য প্রভৃতিকে দেবতা এবং উপাস্য বলে প্রতিষ্ঠা

দান করা হয়েছে। প্রত্যুষে আকাশের রক্তিমাভায় ঋষিদিগের মন মুগ্ধ হয়েছে
তাই তাকে ঊষা নামে অভিহিত করতঃ দেবত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এদের
উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি পাঠ এবং প্রাণের আকুতি নিবেদনের জন্য বেদমন্ত্র বা সূক্ত
রচনার কথা ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি।

কিন্তু শ্রদ্ধা নিবেদন বা প্রার্থনা জানানোর জন্য শুধু স্তোত্র পাঠই যথেষ্ট
বলে বিবেচিত হয়নি, তার সাথে কিছু আনুসঙ্গিকেরও প্রয়োজন অনুভূত
হয়েছিল। বলাবাহুল্য এই আনুসঙ্গিকের নামই হ'ল—যজ্ঞানুষ্ঠান।

সেই যুগটি যে খুবই সহজ সরল ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই
কারণে যজ্ঞের উপকরণ সমূহও ছিল খুবই সাদাসিধা ধরণের এবং সহজ লভ্য।

যজ্ঞের জন্য একটি বেদী নির্মিত হ'ত। তার পাশে একটি গর্ত খনন করা
হ'ত এবং গর্তের নাম দেয়া হয়েছিল—যজ্ঞকুন্ড। কাঠ দিয়ে এই গর্তের
মধ্যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্র পাঠ হ'ত বা সুর
সহযোগে গানের মতো করে গাওয়া হ'ত।

যজ্ঞের আহুতি হিসাবে অগ্নিতে ঘৃত অথবা সোম-লতার রস নিক্ষেপ করা
হ'ত। ঘোড়া, গরু, ছাগল প্রভৃতি পশু এমন কি "নরমেধ" নামক যজ্ঞে নর বা
মানুষও যে আহুতি হিসাবে যজ্ঞকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তেমন প্রমাণও বিদ্যমান
রয়েছে।

অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, বিশ্বজিৎ, রাজসূয়, নরমেধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন
নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'ত বলে জানতে
পারা যায়।

এই সব যজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে
যেতেন। যজ্ঞের সংজ্ঞা হিসাবে এই সব অনুষ্ঠানকে "দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য
ত্যাগ যজ্ঞ" বলা হ'ত।

অর্থাৎ—অগ্নি জ্বালানোর কাঠ, আহুতির জন্য ঘৃত, সোমরস, পশু প্রভৃতি ত্যাগ
বা সরবরাহ করতে হ'ত। যিনি তা করতেন তাকে বলা হত "যজমান"।
বলাবাহুল্য যজমানের কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হ'ত বলেই এই ত্যাগ
বা সরবরাহের দায়ীত্ব তাদিগকেই বহন করতে হ'ত।

যজমানের কল্যাণার্থে যাঁরা এই যজ্ঞ পরিচালনা করতেন তাঁদিগকে বলা

হত—ঋত্বিক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এদের ভূমিকা ছিল ভিন্ন ভিন্ন;
সুতরাং নাম বা উপাধিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল।

যিনি এই উদ্দেশ্যে নির্মিত বেদীর উপরে বসে বা দন্ডায়মান অবস্থায়
বেদের সূক্ত পাঠ করতেন তাঁর নাম বা উপাধি "হোতা। যিনি সুর সহযোগে
গানের মতো করে সূক্ত পাঠ করতেন তার নাম বা উপাধি ছিল—"উদগাতা"।
যিনি অগ্নিতে আহুতি প্রদান করতেন তাঁকে বলা হ'ত—"অধ্বর্যু"।

এইতো হ'ল বৈদিক যুগের উপাস্য এবং উপসনা প্রণালীর মোটামুটি
পরিচয়। এ থেকে তদানিন্তন কালে মূর্তি নির্মাণ বা মূর্তি পূজার সামান্যতম
ইঙ্গিতও আমরা পাইনা। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে বেদের যে
হাজার হাজার মন্ত্র রয়েছে তার মাঝে মূর্তি নির্মাণ বা মূর্তিপূজার সামান্যতম
ইঙ্গিত বহন করে এমন একটি মন্ত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এর একটি মাত্র কারণই থাকতে পারে। আর তা'হল--দেবতার মূর্তি নির্মাণ
এবং উপাস্য জ্ঞানে পূজা করার সাথে গোটা বৈদিক যুগের মানুষদিগের
সামান্যতম পরিচয়ও ছিল না।

উপরের এই কথাটিকে স্মৃতি পটে জাগরূক রেখে অতঃপর আমরা বৈদিক-
যুগ-পরবর্তী উপনিষদীয় যুগে মূর্তি পূজার উদ্ভব ঘটেছিল কি না সে কথা
জানতে চেষ্টা করবো।

তবে আমাদিগকে সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে—পৃথিবীর
সকল দেশে একই সময়ে এবং একই সাথে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটেনি। আর
যে সব দেশে মূর্তিপূজার অবসান ঘটেছে তা-ও একই সময়ে এবং একই সাথে
সংঘটিত হয়নি। তাছাড়া "বৈদিক যুগ" বলতে যে বেদ অধ্যুষিত এবং বেদের
শিক্ষা প্রচলিত ছিল এমন অঞ্চলকেই বুঝতে হবে সে কথাটিও আমাদের
মনে থাকা প্রয়োজন।

উপনিষদের দেবতা

উপনিষদের দেবতা সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই উপনিষদ বলতে কি
বুঝায় সে কথা জানা প্রয়োজন।

উপনিষদ বেদেরই অঙ্গ-বিশেষ। কর্মকান্ড ও জ্ঞান কান্ড হিসাবে বেদের

মোটামুটি দু'টি ভাগ রয়েছে। যজ্ঞ সম্পকীয় বিষয় গুলি কর্ম কান্ডের
অন্তর্ভুক্ত আর বিভিন্ন তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচিত বিষয় গুলি জ্ঞান কান্ডের
অন্তর্ভুক্ত। উপনিষদে বিশেষ ভাবে ব্রহ্ম তত্ত্বের আলোচনা থাকায় উহা'ক
জ্ঞান কান্ডের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নিতে হয়।

কোন পন্ডিত উপনিষদকে "রহস্যাপক জ্ঞান" বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর
মতে এই জ্ঞান রহস্যপূর্ণ বিধায় শিক্ষার্থীগণকে গুরুর সান্নিধ্যে বসে ইহা
অর্জন করতে হ'ত বলে এর নাম হয়েছে উপনিষদ। কোন পন্ডিতের মতে
উপনিষদ বলতে বুঝায় একটি সভা। যেথানে গুরু হতে সামান্য ব্যবধানে
শিক্ষার্থীরা তাঁকে ঘিরে বসতো এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতো। গুরুর
সান্নিধ্যে বসে এই জ্ঞানের চর্চা করা হ'ত বলে এর নাম হয়েছে উপনিষদ।

অষ্টোত্তর শত উপনিষদের সংকলক পন্ডিত বাসুদেব শর্মার মতে—উপ
অর্থে বুঝায় গুরুর উপদেশ হতে যা লাভ করা যায় ; নি অর্থে নিশ্চিত জ্ঞান
আর সৎ অর্থে বুঝায় যা জন্ম মৃত্যুর বন্ধনকে খন্ডন করে। সুতরাং উপনিষ
দের অর্থ দাঁড়ায়—"গুরুর নিকট হতে লব্ধ যে নিশ্চিত জ্ঞান জন্ম মৃত্যুর
বন্ধনকে খন্ডন করে।

নানা কারণে কোন কোন পন্ডিত এই অর্থ গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁদের
মতে উপনিষদ অর্থ—যা এক প্রান্তে অবস্থিত। অর্থাৎ—বেদের এক প্রান্তে
রয়েছে বলেই—এর নাম হয়েছে—উপনিষদ।

উপনিষদকে বেদান্তের সমার্থ-বোধক বলেও ধরে নেয়া যেতে পারে। কারণ
বেদান্তের অর্থও হল—যা বেদের অন্তে বা শেষে রয়েছে।

উপনিষদের এই অর্থই গ্রহন যোগ্য বলে আমরা মনে করি। কারণ ইহাতে
ব্রহ্ম তত্ত্ব সম্পর্কীয় আলোচনা রয়েছে। কথাটিকে পরিষ্কার করে বুঝতে
হলে সামান্য পটভূমিকা প্রয়োজন। উক্ত পটভূমিকা হল :

বৈদিক যুগের প্রথম দিকে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বৈদিক ঋষিদিগের
মধ্যে যে "আর্ত" এবং "অর্থার্থী"র মানসিকতা বিরাজমান ছিল তদানিন্তন
কালে রচিত বেদমন্ত্রের উদ্ধৃতি এবং ভাষ্যকারের অভিমত থেকে ইতিপূর্বে
আমরা সেকথা জানতে পেরেছি।

অবশ্য এই মানসিকতা গড়ে' উঠার যথেষ্ট কারণও ছিল। বিষয়টিকে

খুলে বললে বলতে হয় যে—জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু, ঝড়, তুফান, ভূমিকম্প, প্লাবন,
মড়ক, মহামারী, হিংস্র শ্বাপদ, শত্রুদল প্রভৃতির আক্রমনে প্রতিরোধ প্রতি-
রক্ষার উপায় অবলম্বন হীন সে দনের দুর্বল অসহায় মানুষদিগের মাঝে
আর্ত মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া মোটেই অন্যায় বা অস্বাভাবিক ছিল না।

অনুরূপ ভাবে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, পানীয়, আশ্রয়, আত্মরক্ষা প্রভৃতির
অলংঘ্য তাকীদ স্বাভাবিক নিয়মেই তাদের মধ্যে সহজে ও নির্বিঘ্নে প্রচুর
খাদ্য, পর্যাপ্ত পশু-সম্পদ, অঢেল পরিমাণ বিত্ত বিভব প্রভৃতি লাভের প্রবল
আকাঙ্খা বা আর্থার্থীর মানসিকতা সৃষ্টি করে ছিল। বলাবাহুল্য এটাকেও
নিশ্চিত রূপেই অন্যায় ব অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে না।

অবশ্য এই মানসিকতা সৃষ্টির অন্য একটি কারণও ঘটে গিয়েছিল বলে
জানতে পারা যায়। সেই কারণটি হল—সামাজিক অনৈক্য ও বিশৃংখলা।
বিষয়টিকে খুলে বললে বলতে হয় :

ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার কল্পনা
সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দল উপদল এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ বৈষম্যের
সৃষ্টি করে চলেছিল।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে—সমাজে জড়াগ্রস্থ, রুগ্ন, দরিদ্র,
বিদ্যার্থী, যোদ্ধা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার এবং ভিন্ন ভিন্ন পেশার
মানুষ রয়েছে।

এমতাবস্থায় জড়া-গ্রস্থ ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই জড়া থেকে অব্যাহতি লাভের
জন্য "জড়া-নাশী" দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়োজন অনুভব করে এবং
তার উপাসনায় রত হয়। জড়াগ্রস্থ নয় বা যাকে বা যা' দিগকে জীবনে
জড়া গ্রস্থ হ'তে হয় না সে বা তারা সারা জীবন "জড়া নাশী" দেবতার উপাসনা
করেনা বা তার প্রয়োজনও বোধ করে না।

অনুরূপ ভাবে বিদ্যার্থী ব্যক্তি বা ব্যক্তিরাই উপাসনা আরাধনার মাধ্যমে
বিদ্যাদেবীর সন্তুষ্টি অর্জনে প্রয়াসী হয়ে থাকে। বিদ্যার্জনের প্রয়োজন বোধ
করে না এমন ব্যক্তিরা জীবনে কখনো বিদ্যাদেবীর উপাস । করেনা বা করার
প্রয়োজন বোধ করে না। তারা হয়তো তাদের প্রয়োজনানুযায়ী কেউবা ধন-
দাত্রী দেবীর, কেউবা শক্তিদাতা দেবতার আবার কেউবা অন্য দেবতার উপ-
সনাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

এমনি ভাবে প্রয়োজনের তাকীদে এক এক দল এক এক দেবতাকে নিজেদের
প্রধান বা একমাত্র উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করে বা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বলা
বাহুল্য এই ভিন্নতার কারণে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান, দলাদলি এবং হিংসা
বিদ্বেষ সৃষ্টি না হয়ে পারে না।

বর্তমানেও আমরা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গানপত্য, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী
প্রভৃতি অসংখ্য দল উপদল এবং তাদের পারস্পারিক হিংসা বিদ্বেষ পূর্ণ কার্য-
কলাপ স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

মনে রাখা প্রয়োজন যে আলোচ্য সময়েই এটার সূত্রপাত ঘটেছিল এবং
তারই জের হিসাবে আজও সেই দলাদলি ও বিভেদ বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে
হয়তো চিরদিনই বিদ্যমান থাকবে।

তবে বৈদিক ঋষিগণ এই "বহুদেববাদ"-এর কুফল উপলব্ধি করতে পেরে-
ছিলেন এবং তার অবসান ঘটানোর উদ্যোগও গ্রহণ করেছিলেন।

ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বহুদেববাদ-এর অবসান ঘটিয়ে ভিন্ন ভিন্ন দল-
উপদলের মনযোগকে একটি মাত্র কেন্দ্রের প্রতি নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা
তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

তাছাড়া সে সময়ে তাঁদের মন-মানসও গভীরতর চিন্তার উপযোগী হয়ে
পড়ে' উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এই অবস্থায় আর্ত ও অর্থার্থীর
মানসিকতা পরিবর্তিত হয়ে সেখানে যে ভক্তি ও জিজ্ঞাসার মানসিকতার
সৃষ্টি হয়েছিল ইতিপূর্বে সে কথাও আমরা জানতে পেরেছি। তবে ভক্তি
অপেক্ষা জিজ্ঞাসার দিকটিই যে সমধিক প্রবল ছিল। পরবর্তী আলোচনা
থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে ভক্তি এবং জিজ্ঞাসা সম্পর্কে দু'কথা
বলার প্রয়োজন বোধ করছি :

ভক্তিভাজন বা ভক্তিভাজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকা যে অপরিহার্য এবং
একটি বিশেষ মানবীয় গুণ—সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে
পারে না। তাছাড়া ভক্তির সাথে মুক্তির সম্পর্ক যে অতীব ঘনিষ্ট সে কথাও
কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কিন্তু সেখানেও কে প্রকৃত ভক্তি ভাজন আর কে তা নয়, কার প্রতি কতটুকু

ভক্তি থাকা সঙ্গত ও স্বাভাবিক আর এই ভক্তি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ কি
প্রভৃতি বিষয়গুলিও বিশেষ ভাবে ভেবে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ'কথাও
ভেবে দেখতে হয় যে—এই ভক্তির মধ্যে অতিভক্তি, অন্ধ ভক্তি, কপটতা, ভাব-
প্রবনতার উচ্ছাস প্রভৃতির সামান্যতম অস্তিত্বও রয়েছে কি না।

অনুরূপ ভাবে জিজ্ঞাসা, মন-মানসিকতার প্রশ্নেও বলা যেতে পারে যে,
জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসা মানুষের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তিই
তার মাঝে অজানাকে জানার উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে ; নিত্য নূতনের
সন্ধানে হাতছানি দেয়।

কিন্তু এই জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধিৎসারও একটা নীতি-নিয়ম আছে—মাত্রা
পরিমান আছে—ভাল মন্দ আছে। এ নিয়ে বিস্তারীত আলোচনার প্রয়োজন
নাই। কেন না, অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় এবং প্রজ্ঞাহীন জিজ্ঞাসা আর ভুল
বিভ্রান্তিকর, মিথ্যা, হেঁয়ালীপূর্ণ, অনুমান-নির্ভর এবং দুর্বোধ্য উত্তর যে
ব্যক্তি, সমাজ এমন কি গোটা জাতীয় জীবনে কত বড় অশান্তি ও বিপর্যয়
সৃষ্টি করতে পারে—তার বহু বাস্তব নিদর্শন ইতিহাসের পাতা এমন কি
আমাদের চোখের সম্মুখেও বিদ্যমান রয়েছে।

বলাবাহুল্য আলোচ্য সময়ে ভক্তি ও জিজ্ঞাসা সম্পর্কে এসব কথা চিন্তা
করার মতো মন-মানসিকতাই গড়ে উঠেছিল না। সুতরাং তদানিন্তন মন-
মানস দিয়ে যতটুকু চিন্তা করা সম্ভব ততটুকু চিন্তাই যে তাঁরা করেছিলেন সে
কথা অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে। আর তার পরিণাম যা হওয়া স্বাভা-
বিক তাই যে হয়েছিল অতঃপর তথ্য প্রমাণাদির সাহায্যে সে কথাই তুলে ধরা
হবে।

সুবিখ্যাত এবং হিন্দু সমাজের সর্বজন-মান্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ চতুর্থ
অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে :

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদবায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ ব্রহ্ম তদা পস্তং প্রজাপতিঃ।

অর্থাৎ—তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই পবন, তিনিই সোম, তিনিই
শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সলিল এবং তিনিই প্রজাপতি; সেই পরমাত্মা ব্যতীত
এই ব্রহ্মান্ডে আর কিছুই নাই। এই অখিল সংসার ব্রহ্মময়।

বলাবাহুল্য অগ্নি, আদিত্য, সোম, পবন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহ দৃশ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন হলেও আসলে তারা যে পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন নয় এবং ব্রহ্ম নামক বিশ্বব্যাপী বিরাজিত এক মহান সত্তারই অংশ স্বরূপ এবং তিনিই যে ওসবের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাশক দিগকে সেকথা বুঝানো এবং এতদ্বারা তাঁদের মনোযোগকে একটিমাত্র কেন্দ্রের প্রতি নিবদ্ধ করাই—এই মন্ত্রের মূল লক্ষ্য।

অতঃপর আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে উক্ত উপনিষদের পরবর্তী তৃতীয় শ্লোকটিতে বলা হয়েছে ঃ

ত্বংস্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দন্ডেন বঞ্চয়সি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতো মুখঃ॥

অর্থাৎ—হে দয়াময় ভগবান ! তুমিই নারী, তুমিই পুরুষ, তুমিই শিশু, তুমিই বালিকা এবং তুমিই বৃদ্ধরূপে দন্ড ধারণ পূর্বক অনন্ত জগতে বিদ্যমান রহিয়াছ।

সুপ্রসিদ্ধ ভাগবত গ্রন্থের রচয়ীতা বিষয়টিকে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য স্বয়ং ভগবানের বরাত দিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ

সর্বভূতে স্বাত্মনি চ সর্বাত্মাহমব স্থিত;
মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তর পা বৃতম্।
ঈক্ষেত চাত্মনি চাত্মা নং যথা খমম লাশয় ঃ
বিসৃজ্যস্ময় মানান স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকী
প্রণমেদ্দন্ডবৎ ভুমা-বশ্ব চান্ডাল গোখরম্॥

অর্থাৎ—আমি সর্বাত্মা; আমি তোমার হৃদয়েও আছি, সর্বভূতেও আছি। নির্ম্মল চিত্ত হইয়া আপনাতেও সর্বভূতে আমাকে অন্তরে বাহিরে পূর্ণ দর্শন করিবে। যিনি সর্বভূতে আমার সত্তা দর্শন করেন তাহার অহংকার, স্পর্ধা, অসূয়া ও অভিমান নাশ হইয়া থাকে। লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, স্বজনের

পরিহাস উপেক্ষা করিয়া কুকুর, চন্ডাল, গো-গর্দভ, পর্যন্ত সমুদয় জীবকে দন্ডবৎ প্রণাম করিবে।

ভাগবত পুরাণ এবং শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
প্রণীত "ভারত আত্মারবাণী" ৫০ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন দেখা দেয় যে বিশ্বের সব কিছুই যদি ব্রহ্মের অংশ বা ব্রহ্মময় হয় তবে চন্ডাল কুকুর গো-গর্দভ প্রভৃতিকে দন্ডবৎ প্রণাম করার এই নির্দেশকে কে পালন করবে ? আর কেন-ই বা পালন করবে ?

এক্ষেত্রে তো মান-মর্যাদা এবং অধিকারের দিক দিয়ে বিশ্বের ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র, মানুষ-জানোয়ার প্রভৃতি সব কিছুই সমান, ব্রহ্মময় এবং ভেদাভেদ হীণ।

যেহেতু প্রণাম বা নমস্কার করার অর্থই হল কারো প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা নীচতা স্বীকার করা। এমতাবস্থায় যেখানে ছোট বড় বা ভেদাভেদ নাই সেখানে আনুগত্য প্রদর্শন বা নীচতা স্বীকারের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

এমন কি এ ক্ষেত্রে স্বয়ং ভগবানও কারো প্রণাম বা আনুগত্যের দাবী করতে পারেন না। কেননা সবই তো তিনি। অতএব কার কাছে তিনি আনুগত্যের দাবী করবেন ? আর কেন-ই বা করবেন ?

এ সম্পর্কে আমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সেটা ছিল বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসার যুগ। কাজেই একটি জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে তদানিন্তন ঋষিদিগের মনে অসংখ্য জিজ্ঞাসা এসে নূতন করে ভীড় জমিয়েছে এবং ঋষিগণও তাঁদের নিজ নিজ যোগ্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ওসবের এক একটা উত্তর সাব্যস্থ করতঃ বেদমন্ত্র রচনা করেছেন।

বলাবাহুল্য পৃথিবীতে যত জিজ্ঞাসা আছে এবং হ'তে পারে তার মধ্যে ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর সম্পর্কীয় জিজ্ঞাসাটিই সর্বাধিক জটিল, সর্বাধিক সূক্ষ্ম এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অথচ সকল মানুষের চিন্তাশক্তি সমান নয়; চিন্তার গভীরতা এবং ব্যাপকতাও সকলের সমান বা একইরূপ হতে পারে না। ফলে ব্রহ্মতত্ব নিয়ে যে মত-ভেদের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে সে কথাটি আমাদিগকে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে।

তাছাড়া স্বাভাবিক প্রগতিশীলতা এবং পরিবেশের ভিন্নতার কারণে একই ব্যক্তির একদিনের চিন্তাধারা যে অন্যদিন পরিবর্তিত হতে পারে এবং তার ফসলও যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এমন কি বিপরীতমুখীও হতে পারে সে কথাটি-কেও আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। এ সম্পর্কে একটি মাত্র উদাহরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

ইতিপূর্বে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের যে সব শ্লোক উদ্ধৃত করা হয়েছে তার একটিতে ঋষি বলছেন—

"তিনিই অগ্নি, তিনিই আদিত্য, তিনিই পবন, তিনিই সোম তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই সলিল এবং তিনিই প্রজাপতি"। অথচ উক্ত ঋষিই সেই উপনিষদের অন্যত্র বলছেন—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং
> নেমা বিদ্যু তো ভান্তি কু তো হয় মগ্নিঃ
> তমেব ভান্ত মনু ভাতি সর্ব্বং
> তস্য ভাসা সর্ব্ব মিদং বিভাতি ॥

অর্থাৎ—আদিত্যদেবও সেই পরমাত্মার নিকটে প্রকাশ পাইতে সমর্থ নহেন, তাঁহাকে প্রকাশ করিতে চন্দ্রেরও সামর্থ নাই সুতরাং অগ্নি তৎ সকাশে কিরূপে প্রকাশ পাইবে?

—শ্বেতাশ্বতরোপ নিষৎ ষষ্ঠ মঃ ১৪ শ্লোক।

লক্ষ্যণীয় যে—পূর্বোক্ত শ্লোকটিতে যেখানে ব্রহ্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনিই অগ্নি, তিনিই পবন, তিনিই সোম ইত্যাদি বলা হ'ল সেখানে পরবর্তী এই শ্লোকটিতে "আদিত্য তাঁহার কাছে প্রকাশ পাইতে পারে না," "চন্দ্র তাঁহাকে আলোকিত করিতে পারে না" "তারকাগণ তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে না" ইত্যাদি বলা শুধু তাৎপর্যহীনই নয় পরস্পর বিরোধীও।

এই পরস্পর বিরোধীতা বা মতভেদের কারণ কি সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আভাস দেয়া হয়েছে, তথাপি বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য পুনরুক্তি করতঃ বলা যাচ্ছে যে—সময় এবং পরিবেশের ভিন্নতার কারণে মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন বা ভিন্নতা সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আর

তার ফসলও যে ভিন্ন এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণেরও হতে পারে সে কথাও আমাদিগকে মনে রাখতে হবে।

বলাবাহুল্য উপরের এই উদ্ধৃতিদ্বয় সেই ভিন্নতা এবং বৈপরীত্যেরই পরিচয় বহন করছে। এ সম্পর্কে উক্ত উপনিষদ থেকে আরও একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

উক্ত শ্লোকটি হ'ল ঃ

> যে না বৃত্তং নিত্য মিদং হি সর্ব্বং
> জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ব্ব বিদ্যঃ।
> তেনে শিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ
> পৃথ্ব্যপ্ তেজো হ নিল খানি চিন্ত্যম্।

—শ্বেতাশ্বতরোপ-নিষৎ ষষ্ট অঃ ২য় শ্লোক।

অর্থাৎ—"যে পরাৎপর পরমেশ্বর নিরন্তর এই ব্রহ্মান্ড ব্যাপ করিয়া বিরাজ করিতেছেন, তিনি কালেরও সৃষ্টি কর্তা, সর্ববেত্তা ও অবিদ্যাদি দোষ বর্জিত। তাঁহার আদেশেই ব্রহ্মান্ডের কার্য নিষ্পন্ন হইতেছে। অতএব পূর্বে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতকে জগৎ—কারণ বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, অধুনা সে সন্দেহের নিরাময় হইয়া গেল।"

প্রথম অবস্থায় কোন কিছু সম্পর্কে এই রূপ ধারনা সৃষ্টি, পরবর্তী সময়ে সন্দেহের উদ্রেক এবং উন্নততর জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে অতীত ধারণায় পরিবর্তন ও সন্দেহের নিরসন এটা নূতন, অভিনব, এবং অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং ঋষিদিগের বেলায়ও এটা যে ঘটেছে এখানে তারই প্রমাণ আমরা পাচ্ছি।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতিতে হাজার হাজার মন্ত্র বা ঋক রয়েছে। শত শত ঋষি এমন কি তাদের অনেকের স্ত্রী পুত্রাদি কর্তৃকও সুদীর্ঘ সময়ে এই সব মন্ত্র বা ঋক সমূহ রচিত হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা তাঁদের পরিবার পরিজন কর্তৃক এগুলোর রচনা, সময়ের ব্যবধান, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশ প্রভৃতিই যে কোন কোন ক্ষেত্রে এক ঋক বা মন্ত্রের সাথে অন্য ঋক বা মন্ত্রের গড়মিল, পার্থক্য এমন কি বৈপরীত্য ঘটার কারণ উপরোদ্ধৃত মন্ত্রটি থেকে তারই সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

তাছাড়া ব্রহ্ম-তত্ত্বের মতো এমন একটি অতীব জটিল, সূক্ষ্ম, গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মত-ভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আর হয়েছিলও তা-ই।

মতভেদ যে ক্ষতিকর এবং অবাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই নাই। কিন্তু এই মতভেদ থেকেই—সত্যের সন্ধানে ঋষিদিগের অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

বলাবাহুল্য তাঁদের এই মতভেদের মধ্যে বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। অথচ তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নাই। বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গেলে আলোচনার অঙ্গহানি ঘটে। অগত্যা বাধ্য হয়ে অতঃপর "ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড" উপশিরোনাম দিয়ে অতি সংক্ষেপে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাচ্ছে।

ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ড

ব্রহ্ম চর্মচোখে পরিদৃশ্যমান নন; কারণ যা স্থূল নয় তা চর্মচোখে পরিদৃশ্যমান হতে পারে না। যেহেতু তিনি স্থূল নন অতএব তিনিও চর্মচোখে পরিদৃশ্যমান হ'তে পারেন না। তাছাড়া চোখের সীমাবদ্ধতা রয়েছে—আবার ক্ষেত্র বিশেষে এই সীমাবদ্ধতা অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে সংকুচিতও। অতএব চর্মচোখে তাঁকে দেখার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এর পরে জ্ঞান চোখের কথা : অন্য কোন প্রাণীর জ্ঞান আছে কি না সে কথা আমরা জানি না। মানুষ যে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান প্রাণী সে কথা আমাদের জানা রয়েছে। আর এ কথাও জানা রয়েছে যে—তার জ্ঞানও চর্মচোখের মতোই একান্ত রূপে সীমাবদ্ধ এবং ক্ষেত্র বিশেষে তার সীমাও অত্যন্ত শোচনীয় ভাবে সংকুচিত।

অতএব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন দাঁড়ায় যে—তবে সেই অসীম অনন্তকে জানার উপায় কি? অথবা কোন উপায় আছে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তর : উপায় অবশ্যই আছে। তবে সে উপায়ের দ্বারাও তাঁকে সম্যক রূপে জানা সম্ভব নয়। কারণ তিনি অসীম এবং অনন্ত। অর্থাৎ যোগ, পূরণ, আন্দাজ, অনুমান, হিসাব-নিকাশ প্রভৃতি কোন কিছুরই নাগালের মধ্যে তিনি নন। নাগালের মধ্যে আনার অর্থই হল—তাঁকে সীমাবদ্ধ করা—তাঁর অসীমত্বকে অস্বীকার করা।

তবে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জানা সম্ভব চর্মচোখ ও জ্ঞানচোখের মাধ্যমে চেষ্টা সাধনার দ্বারা ততটুক জানা যেতে পারে এবং ততটুকু জানা দ্বারাই মানুষের প্রয়োজন মিটতে পারে।

উপরে যে উপায়টির কথা বলা হ'ল তাকে আমরা "বিশ্ব-অভিজ্ঞান" বলে অভিহিত করতে পারি। বিশ্ব-অভিজ্ঞান বলতে আমরা বিশ্বকে জানা এবং ভাল করে বা জানার মতো করে জানার কথাই বুঝাতে চাচ্ছি। কারণ বিশ্বকে জানা ছাড়া বিশ্ব প্রভুকে জানা এমন কি তাঁর অস্তিত্বের উপলব্ধি এবং প্রাথমিক পরিচয় জানারও দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। অন্য কথায়, ব্রহ্মকে জানতে হলে ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে হবে। কেননা এ ছাড়া তার অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণই নাই।

যেহেতু অনেকেই ব্রহ্মতত্ব জানাকে একটি ধর্মীয় কাজ বলে মনে করেন অতএব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বা ধর্মগ্রন্থ থেকেই আমরা ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। তবে এ কাজে যথেষ্ট অসুবিধাও রয়েছে। আর মোটামুটি ভাবে তা' হ'ল—ব্রহ্মাণ্ড বলতে যা বুঝায় তার পৃথিবী, মেদিনী, ধরা, ধরিত্রী, বসুন্ধরা প্রভৃতি অনেকগুলি নাম রয়েছে এবং প্রতিটি নামের পশ্চাতেই ইহার উৎপত্তি সম্পর্কীয় এক একটি উপাখ্যান এক একটি ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। এই উপাখ্যান গুলি এমন ভাবেই হেঁয়ালীতে পরিপূর্ণ যে আসল ঘটনা খুঁজে বের করা সম্ভবই নয়।

এখন কথা হ'ল : নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও জিনিসতো একটি-ই। আর একটি জিনেসের উৎপত্তির পরস্পর বিরোধী ভিন্ন ভিন্ন এতগুলি কারণ থাকতে পারে না। এমতাবস্থায় কোন্ কারণটি সত্য আর কোন্‌টি তা নয় সেটা নির্ণয় করা এবং এই দুর্বোধ্য হেঁয়ালীর ধূম্রজাল থেকে তাকে বের করে আনাও কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম গ্রন্থের এই ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করার মতো অসম্ভব, শ্রম সাধ্য, জটিল এবং স্পর্শকাতর কাজে আমরা যেতে চাই না। আমরা শুধু "ব্রহ্মাণ্ড" নামটির তাৎপর্য জানতে চেষ্টা করবো এবং সহজে ও সংক্ষেপে এ কাজ সমাধা করার জন্য আশুতোষ দেব মহাশয়ের "নূতন বাঙ্গালা অভিধানে" "ব্রহ্ম" শব্দের বিপরীতে যে কথাগুলি লিখিত রয়েছে নিম্নে সেগুলিকে হুবহু উদ্ধৃত করবো।

ব্রহ্মা—"জগৎ সৃষ্টি কর্তা। প্রলয়ের শেষে ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে প্রলয়ের অন্ধকার দূর হয় ও কারণ বারিতে সৃষ্টি বীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণময় অন্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অন্ড বিভক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। সাবিত্রী তাহার পত্নী এবং দেব সেনা ও দৈত্য সেনা তাঁহার পুত্র কণ্যা। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, দক্ষ, এবং নারদ তাঁহার এই দশজন মানস পুত্র সৃষ্টি কার্যের জন্য আদিষ্ট হন এবং নারদ অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।"

এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে "ব্রহ্ম" এবং "ব্রহ্মা" এক কথা নয়; একজনের নামও নয়। ব্রহ্ম মূল আর ব্রহ্মা তাঁর আদেশ পালনকারী মাত্র। পরবর্তী আলোচনা থেকে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উদ্বৃত অংশ টুকুতে ব্রহ্মা ও ভগবান এ দু'টি নাম রয়েছে এবং ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্তা বলা হলেও তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টির কাজটি যে সমাধা হয়নি বরং তা যে ভগবানের ইচ্ছায় সমাধা হয়েছে সে কথা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। খুব সম্ভব এখানে ভগবান বলতে ব্রহ্মকেই বুঝানো হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে প্রলয়ের অন্ধকার দূরীভূত হওয়া, কারণ-বারিতে সৃষ্টিবীজ নিক্ষিপ্ত হওয়া, সুবর্ণময় ডিম্বের উৎপত্তি, অন্ডবিভক্ত হওয়া, আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তি, ডিম্বের ভিতর থেকে ব্রহ্মার আবির্ভাব এসব গুলিই ঘটেছিল ভগবান বা ব্রহ্মের ইচ্ছায়। অন্ততঃ উদ্ধৃতিটি থেকে সে কথাই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হল এসব কাজগুলি মায় আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তির কাজ-টিও যদি ভগবান ব্রহ্মের ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে তা হলে ব্রহ্মা কি সৃষ্টি করলেন?

এর পরেও দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মার নির্দেশে তাঁর মানস পুত্র মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি দশজনের মাত্র নারদ ছাড়া নয় জন এই সৃষ্টির কাজ সমাধা করেছিলেন।

অথচ তাঁর এই মানস পুত্র দিগের অধিকাংশই বেদমন্ত্রের রচয়ীতা। এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বেদ রচনার কাজ শুরু হয়েছিল বলে

জানতে পারা যায়। এই দশ জনের কোন কোন জন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই যুদ্ধও সংঘটিত হয়েছিল এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। এমতাবস্থায় বহু সহস্র বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সৃষ্টির কাজে তাদের অংশ গ্রহণ কি করে সম্ভব হতে পারে? তা'হলে কি এখন থেকে মাত্র পাঁচ কি ছয় হাজার বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে?

কোন কোন ধর্ম গ্রন্থের মতে ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্মের প্রণব হল "ওঁ" বা "ওম"। ওসব গ্রন্থের ব্যাখ্যাতাও ভাষ্যকার প্রভৃতিরা এই ওঁ বা "ওম"-এর মধ্যে "অ" "উ" এবং "ম" এই তিনটি অক্ষর বিদ্যমান থাকার দাবী করেন।

তাঁদের মতে এই তিনটি অক্ষরের "অ" দ্বারা ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, "উ" দ্বারা বিষ্ণু অর্থাৎ পালন কর্তা, এবং "ম" দ্বারা মহাদেব অর্থাৎ ধ্বংস কর্তাকে বুঝায়।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি বেদ এবং উপনিষদই এই "ওঁ" কে "একাক্ষর" বলেছেন। কারণ এই একটি মাত্র অক্ষরের সাহায্যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে স্মরণ করা হয়, সেই কারণেই এই অক্ষরটির নাম রাখা হয়েছে প্রণব বা পুৎনাম [প্র—নু (স্তুতি করা)+অপ্ করণ]।

অথচ বেদও উপনিষদের পরবর্তী কালের কতিপয় ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারগণ উক্ত একাক্ষরের মধ্যে অ, উ, এবং ম এই তিনটি অক্ষরের আবিস্কার করতঃ তিন অক্ষরে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা রুদ্র নামে তিনজন স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বরের কল্পনা করতঃ একক ব্রহ্মকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

লক্ষ্যনীয় যে ইতিপূর্বে বৈদিক ঋষিগণ যেমন ভাবে প্রথমে সকল দেবতা এবং পরে বিশ্বচরাচরের সবকিছুর সমন্বয়ে ব্রহ্ম বা পরম-ব্রহ্মের অবয়ব কল্পনা করে ছিলেন এক্ষেত্রেও উক্ত ব্যাখ্যাতা ও ভাষ্যকারগণ তাঁদের অনুকরণে দাবী করেছেন যে, সেই ব্রহ্ম বা পরম-ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর রূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কাজ করে চলেছেন।
তবে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করলেও আসলে তিনি এক এবং অভিন্ন; বলা-বাহুল্য এটাকে "একে তিন এবং তিনে এক" ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

অথচ সেই পরাৎপর পরমেশ্বরই যে এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা পালন কর্তা প্রভৃতি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রটি থেকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথা আমরা জানতে পেরেছি। বেদ, বেদান্ত এবং উপনিষদে এ ধরণের বহু মন্ত্রই রয়েছে। এমতাবস্থায় "একে তিন এবং তিনে এক"-এর কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কিন্তু অবকাশ না থাকলেও তা করে নেয়া হয়েছে। কেন করে নেয়া হয়েছে তার উত্তর অন্য প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য পুণরুক্তি করে বলতে হচ্ছে যে, বিশেষ ভাবে সেটা ছিল "জিজ্ঞাসার যুগ।"

অতএব ভিন্ন ভিন্ন জনের মনে ভিন্ন ভিন্ন জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটেছে, তাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতা এবং দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চিন্তা গবেষণা করেছেন এবং সেই চিন্তা গবেষণার ফসলকে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র রচনা বা ব্যাখ্যা ভাষ্যের মাধ্যমে স্বার্থক ভাবে তুলে ধরা এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এই "একে তিন এবং তিনে এক"-এর উদ্ভাবনকে সে দিনের প্রেক্ষাপটে অন্যায় বা অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম সম্পর্কীয় বিষয়টি খুবই জটিল, খুবই সুক্ষ্ম, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই স্পর্শ কাতর। সুতরাং এনিয়ে মতভেদ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এসব মতভেদের মধ্যে বহু শিক্ষনীয় বিষয়ও যে রয়েছে সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

বিশেষ করে এখন থেকে পাঁচ ছ' হাজার বৎসর পূর্বের সেই আলো-আঁধারীর বাসিন্দা হয়েও তদানিন্তন ঋষিগণ সত্য উদঘাটনের জন্য কত কঠোর শ্রম ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনা করেছেন তাঁদের রচিত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় মন্ত্রসমূহ থেকে সেকথা আমরা জানতে পারি এবং নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-সাধনার স্পৃহা ও প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারি। অথচ তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। অতএব তাঁদের এই ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কীয় কয়েকটি মাত্র অভিমতকে নিম্নে তুলে ধরেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে।

জীবের মুক্তি কিভাবে সম্ভব? ঋষির মনে এই জিজ্ঞাসার সৃষ্টি যেদিন

হয়ে ছিল, চিন্তা গবেষণা করেই হোক বা অন্য যেভাবেই হোক এর একটা উত্তরও তিনি নির্ধারন করে নিয়ে তদনুযায়ী মন্ত্র রচনা করেছিলেন, উক্ত মন্ত্রটি হল:

স বৃক্ষ কালাকৃতি ভিঃ পরোহন্যো
যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততে যম্।
ধর্ম্মা বহং পাপনুদং ভগেশং
জ্ঞাত্বাত্মস্থমমৃতং বিশ্ব ধাম ।।

অর্থাৎ—পরমেশ্বরের আকার সংসার বৃক্ষের ন্যায় নহে, কালের ন্যায়ও নহে। তিনিই সংসার সৃষ্টির কারণ, তিনি ধর্ম্ম প্রবর্তক, পাপহারী ও অনিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অধিশ্বর। সেই নিত্য বিশ্বাধার পরম পুরুষকে নিজ আত্মাতে আমিই ব্রহ্মের স্বরূপ এই প্রকার অভেদ রূপে চিন্তা করিলে জীব মুক্তি লাভ করিতে পারে।

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ ষষ্ট অঃ ষষ্ট মন্ত্র।

বলা বাহুল্য এখানে "জীব"-এর মুক্তির কথা বলা হলেও আসলে এখানে জীব বলতে মানুষকেই বুঝানো হয়েছে, অন্ততঃ তা-ই অমরা মনে করি। ইতিপূর্বে এক স্থানে যদিও কুকুর ও গোগর্দভাদিকে মানুষের সমপর্যায়-ভুক্ত, অভেদ ও নমস্য বলা হয়েছে তথাপি আমরা মনে করি যে ইতর জীব জন্তুদের অন্ততঃ মানুষের মতো জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রতিভা প্রভৃতি নেই।

এমতাবস্থায় নিজেকে "ব্রহ্ম স্বরূপ" ও "অভেদ" রূপে চিন্তা করার সাধ্য তাদের আছে কিনা সে কথা বলা কঠিন, অতএব এখানে 'জীব' বলতে মানুষকেই লক্ষ্যভূত করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

নিজেকে অসীম অনন্ত ব্রহ্ম স্বরূপ ও অভেদ বলে চিন্তা করা সম্ভব, বাস্তব-সম্মত এবং যুক্তিগ্রাহ্য কিনা সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা এখানে বলতে চাই যে, সে সময়ে এ নিয়ে সাধনা এবং অনুশীলন চলছিল। ফলে একদল নিজদিগকে 'অহং ব্রহ্ম' অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম অন্য কথায় 'আমিই তিনি' অন্য দল নিজ দিগকে সোহহং ব্রহ্ম বা অহং ব্রহ্মাস্মী অর্থাৎ 'তিনিই আমি' বলে দাবী করেছিলেন বলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

ব্রহ্মকে নিয়ে এইসব মতবিরোধ এবং বাকবিতণ্ডার ফলে চার্বাক, কনাদ প্রভৃতিরা তো শুধু ব্রহ্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হন নি ভীষণ ভাবে ধর্মকেও অস্বীকার করেছেন।

গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জৈন প্রভৃতিরা হাজার হাজার ধর্মোপদেশ দিয়েছেন কিন্তু ব্রহ্ম আছেন কি না সে সম্পর্কে একটি কথাও বলেন নি।

এ প্রসঙ্গে শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ লিখিত "ভারত আত্মার বাণী" নামক পুস্তক থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি সুধী পাঠক বর্গকে উপহার দেয়ার লোভ সম্বরণ করতে পারছিনা। উক্ত পুস্তকের একস্থানে তিনি লিখেছেন :

"কথিত আছে, কোন এক পন্ডিতকে মৃত্যুকালে ঈশ্বরের নাম করিতে বলা হইয়াছিল তখন তিনি "পেলব পরমানু" "পেলব পরমানু" বলিতে বলিতে চক্ষু মুদিলেন। ইনি কণাদের পরমানুবাদই সার করিয়াছিলেন, এইমতে পরমনুই জগতের মূল কারণ, সৃষ্টি কর্তা ঈশ্বর কেহ নাই।"

"আর একটি পন্ডিত অদ্বৈতবাদ স্থাপনার্থে এক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়া সংস্কার বশতঃ শিষ্টাচারের অনুবর্তী হইয়া গ্রন্থারম্ভে ঈশ্বরের নম-ক্রিয়া—সূচক কিছু লিখিতে উদ্যোগী হইলেন, অমনি তাঁহার সোহহং জ্ঞান উদিত হইল, কি ভ্রম! আমিই তো তিনি—"অব্ধি অপার স্বরূপ মম লহরী বিষ্ণু মহেশ, প্রণাম করিব কাহাকে? "কাঁহা করু প্রণাম?" কাজেই তাঁহার আর প্রণাম করা হইল না।"

সেকালে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ ছিল বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল, তথায় দেখা যাইত ন্যায় শাস্ত্রী পন্ডিতগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া—তাল চুপ করিয়া পড়ে না পড়িয়া চুপ করে—এই অপূর্ব তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ ছল-তর্ক-বাদ বিতন্ডার ঢেউ উঠাইতেছেন। এই সকল ছিল সেকালের জ্ঞানের চর্চা ও পান্ডিত্যের লক্ষণ আর কর্মের তো অন্তই ছিল না।

বেদের' তেত্রিশ দেবতা তেত্রিশ কোটি হইয়াছিলেন, উপদেবতা[১] অপ-দেবতা, গ্রাম্য দেবতাও অনেক জুটিয়া ছিলেন, এমন কি জ্বর, বসন্ত প্রভৃতিও দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তন্ত্র মন্ত্রের অসৎ ব্যবহার, অভিচার

১. কথাটা নির্ভুল নয়, বেদের দেবতা শীর্ষক নিবন্ধের এ সম্পর্কীয় তথ্য বহুল আলোচনা দ্রষ্টব্য—লেখক।

ব্যভিচারাদিরও অন্ত ছিলনা। প্রভুত্ব, প্রতিষ্ঠা, কামিনী কাঞ্চনাদির কামনায় কলুষচিত্তে এই সকল "ধর্ম-কর্ম" বা ধর্ম বাণিজ্য সম্পন্ন হইত। নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মে ধর্ম-ধ্বজিতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ধর্মপ্রাণতা ছিলনা, ইত্যাদি"

(৫৫-৫৬পৃঃ)।

সে যাহোক, সকলে নিজ নিজ জ্ঞানের উপরে নির্ভর করত : ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে উপরোক্ত মতভেদ-ছাড়াও বেদান্ত কর্তৃক ঘোষিত হয়ে-ছিল—"সার্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অর্থাৎ—সব কিছুই-ব্রহ্ম।

বিষ্ণুপুরাণ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল—" ইদং বিষ্ণুময়ং জগত" অর্থাৎ—এই জগত বিষ্ণুময়।

গীতার ঘোষনায় বলা হ'ল—"বাসুদেবঃ সর্বমিতি" অর্থাৎ—বাসুদেব সমস্ত। ভাগবত পুরাণে বলা হ'ল—"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বং আত্মানম খিলাত্মনাম" অর্থাৎ—কৃষ্ণকে অখিলাত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে, তিনি বিশ্বাত্মা।

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের ঘোষণায় প্রকাশ : "ঈশ সর্বস্ব জগতো ব্রাহ্মণ্‌ বেদ পারগাঃ" অর্থাৎ-বেদপারগ ব্রাহ্মণই সমগ্র জগতের ঈশ্বর।

মার্কন্ডেয় পুরাণের ঘোষণা হ'ল—"বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্র শ্রমেবসন্‌ ই হৈব লোক তিষ্ঠর্চ ব্রহ্ম ভূয়ায় কল্পতে" অর্থাৎ—বেদশাস্ত্র এবং তত্ত্বজ্ঞ মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান।

আর উদ্ধৃতি তুলে ধরার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। যদিও এই নিবন্ধে শুধু উপনিষদ সম্পর্কেই বলার কথা ছিল, তথাপি আলোচনার সুবিধার জন্য পুরাণাদি গ্রন্থের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে হল।

যেহেতু উপনিষদের যুগে ব্রহ্মতত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছিল; অতএব সে সম্পর্কীয় আলোচনায়ই অধিক মনোযোগ দেয়া হল।

এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্ত এবং অর্থার্থীর মানসিকতা প্রবল থাকার কারণে ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক দেবতা কল্পনা করা হয়েছিল। উক্ত যুগের শেষভাগ এবং উপনিষদের যুগে ভক্তি এবং জিজ্ঞাসার মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠে।

এই পর্যায়ে উপরোক্ত দেবতা সমূহ ছাড়াও ব্রহ্ম নামক সর্ব ব্যাপী এক মহান স্বত্তার অস্তিত্ব কল্পিত হ'তে থাকে। তবে পার্থক্য হ'ল—প্রথম দিকে দেবতারা শুধু দেবতাই ছিলেন। আর শেষ দিকে ব্রহ্মের অংশ হিসাবে শুধু তাদের অস্তিত্বকেই দূরীভূত করা হয়নি তাদের মর্যাদাকেও চরম পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছে।

উপনিষদের যুগে অন্য যে ধারণাটিকে বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল করে তোলার চেষ্টা করা হয়, সেটিকে আমরা সর্বেশ্বর ভিত্তিক একত্ববাদ বলে যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ কুকুর, গো-গর্দভাদিসহ বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মময় বা ব্রহ্মের স্বরূপ, সুতরাং অভেদ এবং নমস্য, এক কথায় "সবই তিনি" আবার "তিনিই সব"।

আর বৈদিক যুগের মতো এ যুগেও যে মূর্তিপূজা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ত ছিল না অর্থাৎ বৈদিক ঋষিদিগের মতো ঔপনিষদিক ঋষিরাও যে মূর্তি পূজার সাথে পরিচিত ছিলেন না এ কথাটিকে বিশেষ ভাবে স্মৃতির পাতায় জাগরূক রেখে পুরাণের দেবতা সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করি।

পুরাণের দেবতাঃ

পুরাণের দেবতা সম্পর্কে জানতে হ'লে প্রথমেই আমাদিগকে পুরাণ শব্দের তাৎপর্য, ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহের মধ্যে পুরাণের স্থান, পুরাণের সংখ্যা, অস্তিত্বের সূত্র বা কিভাবে এবং কোন্ সূত্র থেকে পুরাণ বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যাদি পাওয়া গিয়েছে, পুরাণের প্রণেতা বা প্রণেতাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রণয়নকাল, তদানিন্তন পরিবেশ, পুরাণের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলি জেনে নিতে হবে।

এ সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, বেদ ও উপনিষদ বহির্ভূত বহু সংখ্যক দেবদেবীর কল্পনা, মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ, বর্তমান পদ্ধতিতে তাদের পূজার্চনার পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রভৃতি পুরাণেরই অবদান। এমন কি খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে যে, পুরাণের শিক্ষার উপরে ভিত্তি করেই হিন্দু সমাজের বর্তমান কাঠামোটি গড়ে' উঠেছে।

এমতাবস্থায়—"মূর্তিপূজার গোড়ার কথা" জানতে হলে এসবের উদ্ভব

ঘটানোর পশ্চাতে বিদ্যমান কারণ সমূহ যে আমাদিগকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে সেকথা বলাই বাহুল্য। অতএব আসুন, প্রথমেই আমরা অভিধানের আলোকে পুরাণ শব্দের তাৎপর্য কি সে কথা জানার চেষ্টা করি।

পুরাণ শব্দের তাৎপর্য ঃ

পুরাণ বলতে আমরা সাধারণতঃ প্রাচীন বা পুরাতণকে বুঝে থাকি। কিন্তু এখানে তার কিছুটা ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রথমে আমরা অভিধানের সাহায্যে এই ব্যতিক্রম সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবো এবং পরে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করবো। অভিধানের মতে এই পুরাণ শব্দের তাৎপর্য হ'ল ঃ

১। কোন ব্যক্তি বা দেশের সুপ্রাচীন কাহিনী; স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ মন্বন্তর, বংশানুচরিত এই পঞ্চলক্ষণযুক্ত ব্যাসাদি মুণি প্রণীত গ্রন্থ শ্রেণী বিঃ। ১৬ পণ, ১ কাহন, পুরা—নী+ড, কর্ম ; বি; ক্লী।

২। প্রাচীন, পুরাতন, অনাদি। পুরা+তন (ট্য) ভাবার্থে (বিকল্পে ত লোপ)। বিন, স্ত্রী, নী।

এ থেকে মোটামুটি ভাবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ প্রভৃতি পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত ব্যাসাদি মুণি প্রণীত গ্রন্থ শ্রেণীকেই এখানে পুরাণ বলা হয়েছে।

কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ পাঠ করেছেন এমন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, অভিধানোক্ত এই পঞ্চলক্ষণ ছাড়াও প্রায় প্রতিটি পুরাণেই বেদ ও উপনিষদ বহির্ভূত বহু দেব-দেবীর পরিচয়, তাদের অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম, জন্ম-বৃত্তান্ত ও কার্য কলাপ, বা লীলা কাহিনী তীর্থস্থান সমূহের উৎপত্তি ও মাহাত্মের বর্ণনা, প্রায়শ্চিত্ত, তত্ত্ব, প্রেতবাদ, পিশাচবাদ, স্বর্গ ও নরকের বিবরণ প্রভৃতি বিদ্যমান রয়েছে।

কোন কোন পুরাণে সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে শুরু করতঃ সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় সংক্রান্ত বিবরণও লিপিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

এমন ধরণেরও কতিপয় পুরাণ রয়েছে, যে গুলোতে একজন দেব বা দেবীকে প্রধান ও সর্বমূলাধার রূপে এবং অন্য সব দেব-দেবীকে তাঁর অধীন ও হেয় রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, সৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেবদেবীদিগের উদ্ভব ও কার্যকলাপ প্রভৃতি অতি প্রাচীন কালের ঘটনা। অতি প্রাচীন কালের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকার কারণে যদি এই সব গ্রন্থের 'পুরাণ' নামকরণ করা হয়ে থাকে তবে সেটাকে যথার্থই বলতে হয়।

কিন্তু অসুবিধা হ'ল: এসব ঘটনাগুলো অতি প্রাচীন কালের হলেও এসবের বিবরণ বহনকারী আলোচ্য গ্রন্থ গুলি মোটেই প্রাচীন কালের নয়; এমনকি বেদ বেদান্ত উপনিষদ প্রভৃতি রচনার বহু পরবর্তী সময়ে এগুলো রচিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে পুরাণ নামকরণ যথার্থ হয়েছে কি না সুধী পাঠকবর্গ সেকথা ভেবে দেখতে পারেন।

ধর্মগ্রন্থ সমূহের মধ্যে পুরাণের স্থান:

পবিত্র বেদ-ই যে হিন্দু সমাজের সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনমান্য ধর্মগ্রন্থ সেকথা সকলেরই জানা রয়েছে। গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে বেদ-এর পরবর্তী স্থান সমূহ দখল করে রয়েছে যথাক্রমে বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতি ও সংহিতা—তারপরে পুরাণের স্থান। এদিক দিয়ে বেদের তুলনায় গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরানের স্থান—ষষ্ঠ।

বিভিন্ন শাস্ত্র ও প্রখ্যাত মুণি-মহাপুরুষদিগের সুস্পষ্ট অভিমত: সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান বিধান হিসাবে বেদের নির্দেশ বা বিধি-বিধানই সর্বাগ্রগণ্য এবং অবশ্য পালনীয় বা বাধ্যতামূলক। বেদে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে এমন বিষয় সম্পর্কে অন্য কোন গ্রন্থের নিদেশ কোন ক্রমেই মান্য ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যে সব বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ নাই কেবলমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই অন্যান্য গ্রন্থের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে; তবে সে ক্ষেত্রেও যাতে কোন ক্রমেই বেদের শিক্ষা বিরোধী কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয় সেদিকে তীব্র দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় বেদের পরে যথাক্রমে বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতি ও সংহিতার সাহায্য নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সকলের শেষে পুরাণের সাহায্য নেয়ার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। আশাকরি ধর্মীয়

গ্রন্থ সমূহের মধ্যে গুরুত্ব ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরাণের স্থান কোথায়—এ থেকে সুস্পষ্টরূপেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

পুরাণের সংখ্যা:

পুরাণের সংখ্যা আঠারো; যথা—ব্রাহ্ম-পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কন্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্ম বৈবর্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম, মাৎস্য, গারুড় ও ব্রহ্মান্ড।

এছাড়া সমসংখ্যক উপ-পুরাণও রয়েছে। উহাদের নাম: আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিব, ধর্ম্ম, দুর্বাসঃ, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মারীচ এবং ভাস্কর।

অভিধানের মতে: উপ অর্থ—হীন। (আশুতোষ দেব-এর নূতন বাঙ্গালা অভিধান ২৭২ পৃঃ উপ-পুরাণ শব্দ দ্রষ্টব্য)। এই অর্থে উপ-পুরাণ বলতে হীন পুরাণ সমূহকেই বুঝাচ্ছে। খুব সম্ভব পুরাণের তুলনায় গুরুত্ব ও মর্যাদা কম বা অল্প হওয়ার জন্যই "হীন" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

সে যা হোক, পুরাণ এবং উপ পুরাণ মিলে মোট পুরাণের সংখ্যা আমরা ছত্রিশ খানা বলে ধরে নিতে পারি।

কিন্তু এই ধরে' নেয়ার বেলায় কিছুটা সমস্যাও রয়েছে। কারণ উক্ত অভিধান লেখক 'সাহিত্য-পরিচয়' ভাগে উপ-পুরাণের যেসব নাম উল্লেখ করেছেন উপরের তালিকার সাথে তার বেশ কিছু গড়মিল পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত "সাহিত্য পরিচয়" ভাগে (১০৪২ পৃষ্ঠা) তিনি উপ-পুরাণের যে সব নাম উল্লেখ করেছেন সেগুলি যথাক্রমে: সনৎকুমার' নারসিংহ, স্কন্দ, শৈবধর্ম, দৌর্বাসব, নারদীয়, কাপিল, বামন, ঔশনস, ব্রহ্মান্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, সাম্ব, সৌর, পরাশর, মারীচ, ও ভার্গব।

লক্ষ্যণীয় যে—প্রথম তালিকার আদি, বায়ু, নন্দিকেশ্বর, পদ্ম, দেব ও ভাস্কর এই কয়টি নামকে দ্বিতীয় তালিকায় স্থান দেয়া হয়নি। তদ্স্থলে সনৎকুমার, স্কন্দ, ব্রহ্মান্ড ও ভার্গব নাম লিখিত রয়েছে।

অন্যদিকে নারদ, পদ্ম, স্কন্দ, ব্রহ্মান্ড ও বামন নাম পুরাণের তালিকাভুক্ত হওয়া স্বত্ত্বেও সেগুলিকে আবার উপ-পুরাণের তালিকায়ও স্থান দেয়া হয়েছে।

বলাবাহুল্য পুরাণের ভূমিকা যে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় এই নাম বিভ্রাট তারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে।

অস্তিত্বের সূত্র ঃ

"পুরাণ শব্দের তাৎপর্য" শীর্ষক আলোচনা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে ঃ স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ প্রভৃতি পঞ্চ লক্ষণ যুক্ত বেদব্যাসাদি মুনি-প্রণীত গ্রন্থ শ্রেণীকে পুরাণ বলা হয়ে থাকে।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন দেখা দেয় যে স্বর্গ, প্রতিস্বর্গ, বংশ প্রভৃতির যে সব বিবরণ পুরাণ সমূহে বিদ্যমান রয়েছে সেগুলো কিভাবে এবং কোন সূত্র থেকে পাওয়া গিয়েছিল ? এবং বেদব্যাসাদি মুনিগণ-ই বা পুরাণ প্রনয়ণ কালে কিভাবে এবং কোন সূত্র থেকে সেগুলো সংগ্রহ করেছিলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপ সুপ্রসিদ্ধ পদ্ম পুরাণের "সৃষ্টি খন্ড" প্রথম অধ্যায়ে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে আলোচনার সুবিধার জন্য তার সার-সংক্ষেপকে ক, খ প্রভৃতি কতিপয় ভাগে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

ক) লোক সকল নিঃশেষ হ'লে কেশব[1] ব্রহ্মার[2] আদেশে বাজি (ঘোড়া) রূপে বেদ সকল আহরণ করেন। কোন এক সময়ে অসুরগণ চারিবেদ, অঙ্গ সকল, পুরাণ, ন্যায়[3] প্রভৃতি নিখিল শাস্ত্রই অপহরণ ও আত্মসাৎ করেছিল।

কল্পারম্ভে কেশব মৎস্য রূপে উহা আহরণ করেন এবং অর্ণবোদক[4] মধ্যে থেকেই উক্ত নিখিল শাস্ত্র চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করেন। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা পরে উহা মুনিগণের নিকট বর্ণনা করেন। তখন থেকেই পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের প্রচার হয়।

পুরাণের শ্লোক সংখ্যা একশত কোটি। মানুষ এই শত কোটি শ্লোক-বিশিষ্ট পুরাণ অবধারণ করতে সক্ষম নয় বিধায় ব্যাসদেব দ্বাপর যুগে উহা অষ্টাদশ ভাগে বিভাগ পূর্ব্বক সমষ্টিতে চারিলক্ষ শ্লোকাত্মক পুরাণ ভূতলে প্রকাশ করেন। দেবলোকে অদ্যাপি সেই শতকোটি শ্লোকাত্মক পুরাণই চালু রয়েছে। উপরোক্ত চারিলক্ষ শ্লোকের মধ্যে পদ্ম সংজ্ঞিত পুরাণ মহা পুণ্য-জনক। এই পুরাণ পঞ্চ পঞ্চাসৎ সহস্র শ্লোকে পরিপূর্ণ।[5]

১। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু—পালনকর্তা ঈশ্বর; ২। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর,
৩। ন্যায় শাস্ত্র, ৪। সমুদ্রগর্ভ ৫। পঞ্চান্ন হাজার।

খ) কতিপয় শ্লোকের পরে উক্ত সৃষ্টি খন্ডেই ব্যাসদেব ও পুরাণ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে উক্ত পুরাণ থেকে তার হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

"ভগবান ব্যাস সত্য মূর্ত্তি ব্রহ্ম বাক্যানুবর্ত্তী পুরাণ পুরুষ। তিনি সং-শিতাত্মা, মানব ছদ্মরূপী বিভু। তিনি জাতমাত্র সরহস্য সর্ব্ববেদ তাঁহার জ্ঞান গোচর হইয়াছিল।......কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি মহাভারত কর্ত্তা হইতে পারে ?"

এখানে লক্ষ্যণীয় যে "ক" চিহ্নিত অংশের বর্ণনায় ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আদেশে কেশব বা বিষ্ণু অর্থাৎ পালন কর্তা ঈশ্বর "ঘোড়ারূপে" বেদ সকল আহরণ করেন বলে বলা হয়েছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণনা এবং গোটা হিন্দু সমাজের বিশ্বাসানুযায়ী এঁরা উভয়েই এক এক জন স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বর। এমতাবস্থায় একজন কতৃক আদেশ দান এবং অন্যজন কর্তৃক তা পালন করার তাৎপর্য বোধগম্য নয়। তারপরে যেখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্রই সব কিছু হয়ে যাওয়ার কথা এবং তা-ই স্বাভাবিক সেখানে তাঁকে কেন ঘোড়ার রূপ ধারণ করতঃ বেদ আহরণ করতে হবে সে কথাও বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

উপরোক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ "ব্রহ্মার আদেশে কেশব বাজিরূপে বেদ সকল 'আহরণ' করেন।" এথেকে বুঝতে পারা সহজ যে, ব্রহ্মা এবং কেশব এ উভয়ের একজনও বেদের স্রষ্টা বা রচয়ীতা নন—আহরণকারী মাত্র। অতএব এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়—তা'হলে বেদের স্রষ্টা বা রচয়ীতা কে ?

নানারূপ পরিবর্তন, ক্ষয়ক্ষতি এবং সংস্কার-সংশোধনের পরে বর্তমানে পুস্তকাকারে যে বেদ বিদ্যমান রয়েছে তার পাঠক মাত্রেরই জানা রয়েছে যে এখন থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর পূর্বে বিভিন্ন মুনি-ঋষি ও তাদের কারো কারো সন্তান-সন্ততি দ্বারা বেদ রচনার কাজ শুরু হয়েছিল।

উক্ত পাঠক মাত্রেরই একথাও জানা রয়েছে যে—প্রতিটি বেদ-মন্ত্রের শুরুতেই সেই মন্ত্রের রচয়ীতা ও উদ্দিষ্ট দেবতার নাম এবং কোন ছন্দে ও কি উদ্দেশ্যে পাঠ করতে হবে স্পষ্টাকরে সে কথা লিখা রয়েছে।

ফলে কোন ঋষি বা কোন ঋষির সন্তানসন্ততিদিগের কে কোন বা কোন কোন মন্ত্র রচণা করেছেন বেদের পৃষ্ঠা উন্মোচন করার সাথে সাথেই তা আমাদের চোখে পড়ে। বেদ-মন্ত্র সমূহ যে মুণি ঋষিদিগের দ্বারা রচিত কতিপয় বেদমন্ত্রেও স্পষ্টাক্ষরে সে কথা বলা হয়েছে।

অতএব ইহা বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। আর এসব রচণার কাজ যে এখন থেকে মাত্র ছ' হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল—তারও ঐতিহাসিক প্রমান রয়েছে।

এমতাবস্থায় পুরাণ বর্ণিত উপরোক্ত ঘটনা অর্থাৎ ব্রহ্মার আদেশে কেশব কর্তৃক ঘোড়ারূপে বেদমন্ত্র সমূহ আহরিত হওয়ার কথা যে বাস্তব-সম্মত, সত্য-ভিত্তিক এবং বিশ্বাস যোগ্য নয় অতি সহজেই সেকথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

অতঃপর "খ" চিহ্নিত বিবরণের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেও আমাদিগকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কেননা, বেদব্যাস মুনি যে "মানব ছদ্মরূপী বিষ্ণু" এবং "সাক্ষাৎ নারায়ণ" তিনি নিজে কুত্রাপি এমন দাবী করেছেন বলে একটি প্রমানও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত থেকেও তেমন কোন আভাস যে পাওয়া যায় না অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে। পরবর্তী আলোচনায়ও সে সম্পর্কে তথ্য প্রমানাদি তুলে ধরা হবে।

তাছাড়া "জাতমাত্রই" বেদব্যাস মুণির "স রহস্য" সর্ববেদ জ্ঞান গোচর হওয়ার কথাটিও স্বাভাবিক এবং বিশ্বাস যোগ্য হ'তে পারে না।

গ) আলোচ্য বিবরণে অতঃপর বলা হয়েছে যে—পুরাণের শ্লোক সংখ্যা একশত কোটি এবং দ্বাপর যুগে বেদব্যাস মুণি এই পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করেন এবং উহার শ্লোক সংখ্যা সংক্ষিপ্ত করতঃ মাত্র চার লক্ষে পরিণত করেন।

বলাবাহুল্য পুরাণ বা কোন ধর্মীয় গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা একশত কোটি হওয়া কোন রূপেই সম্ভব ও স্বাভাবিক হতে পারেনা। বেদব্যাস মুণি কর্তৃক এই বিরাট সংখ্যাকে মাত্র চার লক্ষে পরিণত করার দাবীও বিশ্বাস যোগ্য নয়। কেননা এক বা দু' কোটিকে চার লক্ষে পরিণত করা হলেও সে কাজকে মোটা-মুটি ভাবে স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যেতো। কিন্তু একশত কোটিকে মাত্র

চার লক্ষে পরিণত করাটা কোন মানুষের কাছেই বিশ্বাস যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না।

তা ছাড়া স্বয়ং কেশব বা বিষ্ণু রূপী ঈশ্বর কর্তৃক বাজিরূপে আহরিত একশত কোটি শ্লোকাত্মক পুরাণকে বেদব্যাস মুণি কোন অধিকারে এমন ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করতে পারেন সে কথাও বোধগম্য নয়।

সেই একশত কোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ অদ্যাপি "দেব লোকে" বিদ্যমান থাকার বর্ণনাকেও সত্য এবং স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়া যায় না।

কেন না "দেব লোক" বলে কোন স্থান যদি থেকেই থাকে তবে নিশ্চিত রূপেই আমাদের এই মরলোক থেকে তা সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। তথাকার অধি-বাসীদিগের আকৃতি, প্রকৃতি, প্রয়োজন, পরিবেশ প্রভৃতিও সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং তা-ই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থেও এই ভিন্নতার প্রমান বিদ্যমান রয়েছে।

এমতাবস্থায় মাটির মানুষদিগের জন্য আহরিত পুরাণের দ্বারা তাঁদের প্রয়োজন মিটতে পারে না—পারা সম্ভবই নয়। অতএব দেবলোকে অদ্যাপি একশত কোটি শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণ বিদ্যমান থাকার এই বিবরণকে সত্য ও স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়া যায় না।

ঘ) উক্ত পুরাণের এ সম্পর্কীয় বিবরণের আরও কয়েকটি পংক্তির হুবহু বঙ্গানুবাদ পাঠক বর্গের সমীপে তুলে ধরা যাচ্ছে।

"চারি বেদ, অঙ্গসকল, পুরাণ, ন্যায়(১) ইত্যাদি নিখিল শাস্ত্রই অসুরেরা অপহরণ পূর্বক আত্মসাৎ করিয়াছিল। কল্পারম্ভে কেশব মৎস্য রূপে এই সকল শাস্ত্র আহরণ করেন। পরে অর্ণবোদক[২] মধ্যে থাকিয়াই—উক্ত নিখিল শাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। চতুর্ম্মুখ(৩) তাহা শুনিয়া পরে মুণিগনের নিকট বেদ বর্ণন করেন। তখন হইতেই পুরাণ শাস্ত্র ও অন্যান্য সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রচার হয়েছিল।"

প্রণিধান যোগ্য যে—এই বিবরণ থেকে কেশব কর্তৃক বাজি বা ঘোড়ারূপে পুরাণ ও পুরাণের ভাষায় "নিখিল শাস্ত্র" আহরণের সময় সম্পর্কে যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা'থেকে অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে সে সময়ে লেখ্য ভাষার উদ্ভাবন তো অনেক দূরের কথা এমন কি তেমন কোন চিন্তাও কারো মনে দেখা দিয়েছিল না।

১। ন্যায়শাস্ত্র, ২। সমুদ্রের জলরাশী, ৩। ব্রহ্মা

অতএব সে সময়ে বাহ্য জগতে পুরাণ বা তথাকথিত নিখিল শাস্ত্রের কোন অস্তিত্বই যে ছিল না সে কথা সুস্পষ্ট রূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

পুরাণ এবং নিখিল শাস্ত্রের প্রচারও যে এই ঘটনার বহু পরে অর্থাৎ কেশব কর্তৃক মৎস্য রূপে সমুদ্রগর্ভ থেকে উহা আহরণ এবং অর্ণবোধক (সমুদ্রগর্ভ) থেকেই ব্রহ্মার নিকট উহা ব্যাখ্যা করার পরেই শুরু হয়েছিল উপরের উদ্ধৃতি থেকে সে কথাও আমরা জানতে পারছি। (পদ্মপুরান সৃষ্টি খন্ড ৪-৫ পৃষ্ঠ) এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে ঃ

o যখন পুরাণ ও নিখিল শাস্ত্র সমূহ শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট ঈশ্বরদ্বয় অর্থাৎ ব্রহ্মা ও কেশবের স্মৃতিতে বিরাজমান ছিল এবং বাহ্যজগতে উহার কোন অস্তিত্বই ছিলনা তখন অসুরগণ কর্তৃক উহা অপহরণ, আত্মসাৎ এবং সমুদ্র গর্ভে নিয়ে যাওয়ার এই বিবরণ কি করে সত্যও বিশ্বাসযোগ্য হ'তে পারে ?

o পৃথিবীর প্রতিটি ধর্ম শাস্ত্রের ঘোষণা এবং কোটি কোটি মানুষের আবাহমান কালের বিশ্বাসানুযায়ী ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, ইচ্ছাময় এবং চরম ও পরম। এমতাবস্থায় তাঁর তুলনায় অতি নগণ্য শক্তির অধিকারী অসুরগণ কর্তৃক পুরাণ সহ নিখিল শাস্ত্রের অপহরণ এবং আত্মসাতের বিবরণ কি করে সত্য ও বাস্তব সম্মত হ'তে পারে ?

o যাঁর ইচ্ছা মাত্রই সব কিছু হয়ে যায় তিনি ইচ্ছা করলেই তো অপহৃত পুরাণাদি উদ্ধার করা সম্ভব হ'ত। এমতাবস্থায় তাঁর মৎস্যরূপ ধারণ ও সমুদ্রে গমনের এই বিবরণকেই বা কি করে সত্য এবং বিশ্বাস যোগ্য বলা যেতে পারে ?

সুধী পাঠকবর্গকেই এসব প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি এবং উক্ত পুরাণের আর একটি মাত্র বিবরণের হুবহু বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করতঃ এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি ঃ

ঘ) "পুরাণ শাস্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্রের আদি, সর্ব্ব লোকের উত্তম, সর্ব্বজ্ঞানের উপপাদক, ত্রিবর্ণের সাধক, পবিত্র এবং শত কোটি শ্লোকে নিবদ্ধ সুবিস্তৃত।" (ঐ, সৃষ্টিখন্ড ৪ পৃষ্ঠা)।

পবিত্র বেদ-ই যে আর্যদিগের আদিতম এবং শ্রেষ্ঠতম ধর্মগ্রন্থ সেকথা সর্বজন বিদিত। ইহার ঐতিহাসিক প্রমানও বিদ্যমান রয়েছে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ একটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সর্বজন বিদিত সত্যকে এমন নির্মম ভাবে নস্যাৎ করতঃ পুরাণকে "সর্ব্বশাস্ত্রের আদি" "সর্ব্ব লোকের উত্তম" ইত্যাদি বলার তাৎপর্য কি সুধী পাঠকবর্গই গভীর ভাবে সেকথা ভেবে দেখবেন বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি।

পরিশেষে একান্ত বেদনার সাথে একথাই বলতে হচ্ছে যে—পুরাণের এই বিবরণের সাহায্যে উহার উৎস সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

"ব্রহ্মার আদেশে কেশব বাজি বা ঘোড়ারূপে পুরাণ এবং নিখিল শাস্ত্র "আহরণ" করেন"—পদ্ম পুরাণের (সৃষ্টি খন্ড ৪ পৃষ্ঠা) বর্ণনা থেকে মাত্র এতটুকুই আমরা জানতে পেরেছি। বলাবাহুল্য আহরণ এবং সৃষ্টি এক কথা নয়, সৃষ্টির কাজটা প্রথমে হ'তে হয়; সৃষ্টির পরেই—আহরণের প্রশ্ন উঠতে পারে।

এ ক্ষেত্রে পুরাণ এবং পুরাণের ভাষায় "নিখিল শাস্ত্র" কে সৃষ্টি করেছে বা কোন উৎস থেকে উহা উৎসারিত হয়েছে পুরাণ সে সম্পর্কে নীরব।

পরক্ষণেই আবার বলা হয়েছেঃ "ভগবান ব্যাস সত্য মূর্তি, ব্রহ্ম বাক্যানুবর্তি পুরাণ পুরুষ। তিনি সংশিতাত্মা মানব ছদ্মরূপী বিষ্ণু। তিনি জাতমাত্র সহরস্য সর্ব্ববেদ তাঁহার জ্ঞান গোচর হইয়াছিল।...... কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকেই সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া জানিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি মহাভারত কর্তা হইতে পারে ?" (ঐ, সৃষ্টি খন্ড ৪ ইং)।

হিন্দু মাত্রেরই একথা বেশ ভাল ভাবে জানা রয়েছে যে উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে যাকে কেশব বলা হয়েছে তাঁরই অপর নাম বিষ্ণু এবং নারায়ণ। আবার এই উদ্ধৃতির উপরোদ্ধৃত অংশে বেদব্যাসকেও সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং বিষ্ণু বলা হয়েছে। জাতমাত্র সরহস্য সর্ববেদ তাঁর জ্ঞান গোচর হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

এমতাবস্থায় এ উভয়ের কে যে আসল বিষ্ণু এবং নারায়ণ সেকথা বুঝতে পারা যেমন সম্ভব নয় তেমনিই বুঝতে পারা সম্ভব নয় যে কেশব কর্তৃক বাজিরূপে পুরাণ আহরণ করা—আর বেদব্যাসের জাতমাত্র সরহস্য সর্ববেদ জ্ঞান

গোচর হওয়া এর কোনটা সত্য এবং বিশ্বাস যোগ্য; আর এই আহরণ এবং জ্ঞান-গোচর হওয়ার উৎসটা কি?

পুরাণের প্রণেতা প্রণেতাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ঃ

পুরাণের উৎস সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব-সম্মত কোন তথ্য প্রমানাদি না পাওয়ার ফলে উহার প্রণয়ন এবং প্রণেতা বা প্রণেতাদিগের যথার্থ পরিচয় পাওয়া সম্পর্ক সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

তবে উৎসের সন্ধান না পাওয়া গেলেও উহার অস্তিত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কেননা পুরাণ নামক গ্রন্থাবলী আমাদের চোখের সম্মুখেই বিদ্যমান রয়েছে। আর এই বিদ্যমানতাই অকাট্যরূপে প্রমান করে যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগের দ্বারা উহা প্রণীত হয়েছে।

অবশ্য এখানেও প্রশ্ন থেকে যায় যে—এই প্রণয়নের সূত্র কি? অর্থাৎ যিনি বা যাঁরা এই প্রণয়ন কার্য সমাধা করেছেন তিনি বা তাঁরা কোন সূত্র থেকে এবং কিভাবে এসব তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংগ্রহণ করেছিলেন? আর সেই সূত্র বাস্তব-সম্মত ও নির্ভরযোগ্য কি না?

এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে যে—ধর্ম একান্তরূপেই বিশ্বাসের বিষয়; আর সে বিশ্বাসকে অবশ্যই স্বতঃস্ফূর্ত হ'তে হবে। এমতাবস্থায় কোন রূপ সন্দেহ, সংসয়, অজ্ঞতা, চাপ প্রয়োগ, অতি ভক্তি, গতানুগতি-কতা, বংশানুক্রমিক ধারণা বিশ্বাস প্রভৃতির সামান্যতম অবকাশও সেখানে থাকতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে—পুরাণ কোন আজে বাজে গল্প গুজব বা নাটক নভেল নয়—উহা এক বিশাল ধর্মগ্রন্থ। আদর্শ জীবন গড়ার মাধ্যমে ইহ-পারলৌকিক শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার যথাযোগ্য প্রেরণা ও পথ-নির্দেশ দানই উহার লক্ষ্য; অন্ততঃ তা-ই হওয়া সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছুকে জীবনের পথ নির্দেশক রূপে গ্রহণ এবং অনুশীলন কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

অতএব পুরাণের ভিত্তি কত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন এবং

সেই ভিত্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠাশীলতা, সামাজিক মান-মর্যাদা প্রভৃতির দিক দিয়ে কত উচ্চস্তরের এবং তাঁকে বা তাঁদেরকে কতবেশী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হওয়া প্রয়োজন সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

পুরাণ প্রণেতা বা প্রণেতাদের সম্পর্কে যে সব হেঁয়ালী, অস্পষ্টতা এবং অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে তা থেকে সুনির্দিষ্ট কোন ধারণায় উপ-নীত হওয়া সম্ভব নয়। ও গুলো ছাড়া তাঁর বা তাঁদের সম্পর্কে জানার আর কোন উপায়ও নাই। অগত্যা পুরাণের বিবরণ অবলম্বন করেই আলোচনায় ব্রতী হতে হচ্ছে। পরে যথাযোগ্য বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটা ধারণায় উপনীত হতে চেষ্টা করা হবে।

পূর্ববর্তী নিবন্ধে উপস্থাপিত সুপ্রসিদ্ধ পদ্ম পুরাণের উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে—বেদব্যাস মুণি একশত কোটি শ্লোক-বিশিষ্ট পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করেন এবং তার শ্লোক সংখ্যাকে সংক্ষিপ্ত করতঃ মাত্র চার লক্ষে পরিণত করেন। এ বিবরণ থেকে আপাততঃ বেদব্যাস মুনিকে আমরা পুরাণ প্রণেতা ধরে নিয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানার চেষ্টা করবো।

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ বা বেদব্যাস মুনি ঃ

বেদব্যাস মুণির আসল নাম "কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ"। বেদব্যাস তাঁর উপাধি। বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করার জন্য তিনি এই উপাধি লাভ করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ নামটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং জন্ম সূত্রেই তাঁর এই নামকরণ করা হয়েছিল। তাঁর জন্ম এবং নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ, মহাভারত, ইতিহাস, অভিধান প্রভৃতিতে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

যুবনাশ্ব রাজা মৃগয়ার জন্য বনে গমন করেন। যুবতী স্ত্রীর কথা মনে জাগ্রত হওয়ায় তাঁর ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। ফলে বীর্য-স্খলন ঘটে। বৃক্ষ পত্রে উক্ত বীর্য সংরক্ষণ করতঃ তিনি সিঞ্চনা নামক পক্ষীকে আহ্বান করেন এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকট তা পৌঁছিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেন।

এই বীর্য দ্বারা গর্ভধারণ করার নির্দেশও তিনি উক্ত সিগুনার মাধ্যমে প্রেরণ করেন।

দুঃখের বিষয় সিগুনা যখন চঞ্চুতে উক্ত বীর্য-পত্র ধারণ করতঃ আকাশ পথে যমুনা অতিক্রম করছিল ঠিক সে সময়ে অন্য একটি সিগুনা পাখি খাদ্য ভ্রমে ছোঁ মেরে পত্রটি কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। ফলে পত্রস্থিত বীর্য যমুনা গর্ভে পতীত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একটি পুঁটি মাছ তা খেয়ে ফেলে এবং গর্ভবতী হয়। পূর্ণ-গর্ভা অবস্থায় উক্ত পুঁটি মাছটি জনৈক ধীবরের জালে ধরা পড়ে এবং অতীব রূপ-লাবণ্যবতী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করার সাথে সাথে মৃত্যু বরণ করে। অগত্যা উক্ত ধীবর কন্যাটিকে নিজ গৃহে নিয়ে যায় এবং পিতৃস্নেহে প্রতিপালন করতে থাকে। মৎস্য গর্ভে জন্ম হওয়ার কারণে কণ্যাটির দেহে মৎস্য-গন্ধ বিরাজমান থাকায় তার নাম রাখা হয়—"মৎস্য গন্ধা"।

বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে কন্যাটির রূপ লাবণ্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু দেহে মৎস্য-গন্ধ বিরাজমান থাকায় যোগ্য বর লাভে ভীষণ অন্তরায় সৃষ্টি হয়।

কোন মুনি-মহাপুরুষের দয়ায় মৎস্য গন্ধ দূরীভূত হ'তে পারে এই আশায় ধীবর কন্যাটিকে যমুনা নদীর খেয়া পারাপারের কাজে নিযুক্ত করে।

সৌভাগ্য বশতঃ একদা মহামুনি পরাশর[১] নদী পার হওয়ায় জন্য উক্ত ঘাটে আগমন করেন এবং কন্যার রূপ লাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ ও কামাতুর হন। মুনির আশীর্বাদে কন্যার দেহের মৎস্য-গন্ধ দূরীভূত হয়ে সেখানে পদ্ম-গন্ধ বিরাজমান হয়।

লজ্জাবশতঃ কন্যাটি রতি দানে ইতস্ততঃ করতে থাকায় মুনির নির্দেশে যমুনার মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ কুয়াসায় আচ্ছন্ন একটি দ্বীপ সৃষ্টি হয় এবং উভয়ে সেখানে রতিক্রিয়া সমাধা করেন। এই রতি ক্রিয়ার ফলে কন্যাটি গর্ভবতী হয় এবং যথা সময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে। কৃষ্ণ দ্বীপে জন্ম হওয়ার কারণে পুত্রটির নাম রাখা হয়—"কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ"। পরবর্তীকালে ইনিই বেদ বিভাগ করেন এবং বেদখ্যান নামে পরিচিত হন।

---

১. "কলৌ পরাপরা স্মৃতাঃ।" অর্থাৎ—কলিকালে পরাশর কর্তৃক প্রবর্তিত বিধানই পালনীয়।—পরাশর সংহিতা।

পরবর্তী বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার হ'লঃ জন্মমাত্রই কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ তপস্যা করতে যান। পরে মৎস্য-গন্ধার নাম পরিবর্তন করতঃ সত্যবতী রাখা হয় এবং শান্তনু রাজার সাথে তিনি বিবাহিতা হন।

শান্তনু রাজার ঔরসে বিচিত্র বীর্য নামে তাঁর এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। বিচিত্র বীর্য অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন এবং অল্প বয়সে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতীত হন।

শান্তনু রাজার সিংহাসের উত্তরাধিকারী না থাকায় সত্যবতী বিশেষ ভাবে চিন্তা-যুক্ত হন এবং কুমারী অবস্থায় পরাশর মুনির ঔরস-জাত এবং জন্মমাত্র তপস্যায়-রত পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণকে আহবান করতঃ বিধবা অম্বিকা এবং অম্বালিকার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করার নির্দেশ দান করেন।

রতি ক্রিয়ায় সময়ে অম্বিকা লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করে থাকার কারণে তার গর্ভে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর অম্বালিকা ভয়ে পান্ডুর বর্ণ ধারণ করেছিলেন বলে তার গর্ভে পান্ডু রোগ-গ্রস্থ এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ফলে তার নাম রাখা হয়—"পান্ডু।"

পাঠক বর্গের মনে প্রশ্ন থেকে যাবে বলে যুবনাশ্ব রাজার প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হচ্ছেঃ

সিগুনার মাধ্যমে প্রেরীত বীর্য যমুনা গর্ভে পতিত হওয়ার ফলে তা যে যুবনাশ্বের স্ত্রীর নিকটে পেঁছানো সম্ভব হয়নি সে কথা সহজেই অনুমেয়। আর উহা পেঁছানো সম্ভব হলেও তদ্বারা কিভাবে তিনি গর্ভবতী হতেন সেটা অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অতএব সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে পরবর্তী বিবরণের সার-সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা যাচ্ছেঃ

দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পরেও স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান না হওয়ার কারণে যুবনাশ্ব রাজা "পুত্রেষ্টি যজ্ঞের" আয়োজন করেন। যজ্ঞে আহূত মুনি মহাপুরুষগণ মন্ত্রঃপূত জল-পূর্ণ একটি মাটির পাত্র যুবনাশ্বকে প্রদান করতঃ উক্ত জল তাঁর স্ত্রীকে পাণ করানোর উপদেশ দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেন।

হঠাৎ পিপাসার্ত হয়ে ভুল বশতঃ যুবনাশ্ব রাজা নিজেই উক্ত মন্ত্রঃপূত জল পান করে ফেলেন। ফলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়। যথা সময়ে তাঁর কুক্ষী

ভেদ করতঃ এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। স্তন্য পানের জন্য নবজাত শিশুটি আর্তনাদ করতে শুরু করলে যুবনাশ্ব ভীষণ ভাবে বিচলিত হন এবং বলেন—কা'কে ধারণ করতঃ এই শিশু জীবিত থাকবে?

সঙ্গে সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্র তথায় আবির্ভূত হন এবং নিজের তর্জনী শিশুটির মুখ গহ্বরে প্রবিষ্ট করান আর সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে অমৃতের ধারা নির্গত হতে শুরু করে। যুবনাশ্বের উপরোক্ত কথার উত্তরে দেবরাজ ইন্দ্র উচ্চারণ করেন—"মাং ধান্যতি"। অর্থাৎ আমাকে ধারণ করতঃ শিশুটি জীবিত থাকবে। ফলে শিশুটির নাম রাখা হয় "মান্ধাতা"।

বলা বাহুল্য—এই নামটির সাথে আমরা প্রায় সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত। প্রাচীন কালের কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই আমরা প্রায়শঃ "মান্ধাতার আমল" বলে মন্তব্যও করে থাকি। অথচ সেই মান্ধাতার জন্ম বৃত্তান্ত আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সে কারণেই মান্ধাতার জন্ম বৃত্তান্ত এখানে তুলে ধরা হ'ল।

উগ্রশ্রবা ঃ

ইনি লোম হর্ষণ-নামক ব্যাসমুণির জনৈক শিষ্যের পুত্র। সুত নামেই ইনি বিশেষভাবে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ পদ্ম পুরাণের বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ

লোম হর্ষণ বেদব্যাস মুনির নিকট থেকে পুরাণ শ্রবন করেন এবং পরে নিজ পুত্র উগ্রশ্রবার নিকট তা বর্ণনা করতঃ তাকে নৈমিষারণ্যে যজ্ঞকার্যে নিরত প্রসিদ্ধ মুনিগণের নিকট তা বর্ণনা করার জন্য প্রেরণ করেন।

(পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টিখন্ড ১—২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

উগ্রশ্রবা সুত জাতির অন্তর্ভুক্ত বিধায় সুত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সুত জাতির আদি পুরুষের উদ্ভব ও "সুত" নামে আখ্যাত হওয়ার কারণ সম্পর্কে উক্ত পদ্ম পুরাণে যে বিবরণ রয়েছে তার হুবহু বঙ্গানুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হ'ল ঃ

পূর্বে ইন্দ্র যজ্ঞ আরম্ভ হইলে সেই যজ্ঞে যখন বৃহস্পতিকে সোমপাত্র প্রদত্ত হইয়াছিল তখন দেবেন্দ্র সেই সোমপাত্র স্পর্শ করেন। শিষ্য হস্তে স্পৃষ্ট হওয়ায় দেব গুরুর সেই সোম দুষিত হইয়া যায়।

সুতরাং হীন সংযোগ বশে উৎকৃষ্ট হবি বিকৃত প্রাপ্ত হয় আর তাহা হইতেই প্রতিলোম সংযোগে সুত জাতির মূল পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। সুত্যাতে (সোম পাত্রে) জাত বলিয়া উহার সুত নামে প্রসিদ্ধি হয়।

—পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খন্ড ২—৩ পৃঃ

শুক ঃ

কতিপয় পুরাণ এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে 'শুক' নামক জনৈক ব্যক্তির নাম দেখতে পাওয়া যায়। "সুত"-এর মতো "শুক"ও বিভিন্ন আশ্রমাদিতে গমন করতঃ পুরাণ মহাভারত প্রভৃতির ব্যাখ্যা করেছেন বলে দাবী করা হয়ে থাকে।

পুরণাদির বিবরণ থেকে শুক-এর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা-ও পুরাণের অধিকাংশ শ্লোকের মতই দুর্বোধ্য হেঁয়ালী ও অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন। অতএব সেদিকে না গিয়ে আশুতোষ দেবের "নতুন বাঙ্গলা অভিধানে" শুক শব্দের উত্তর যে বাক্য গুলি লিখিত রয়েছে নিম্নে সেগুলোকে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে।

শুক—১। রাক্ষস রাজ রাবণের মন্ত্রী (রাম)।

২। বেদব্যাসের পুত্র এক মহর্ষি। তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বাল্যকালেই তপস্যা করতে আরম্ভ করেন। তাঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার জন্য বাহু চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি স্থির থাকেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ-গ্রস্থ হইলে তিনি তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্বে মহাভারত শ্রবণ করান।

—মহাভারত।

পুরাণের সাথে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বলে পরিচিত তিন ব্যক্তি এবং মান্ধাতার অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত আমরা জানতে পারলাম। অতঃপর আমরা পুরাণের প্রাচীনত্ব বা প্রণয়ন-কাল সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো।

বলাবাহুল্য আমাদের মুল আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ "মূর্তি পূজার গোড়ার কথা" জানতে হলে প্রথমেই আমাদেরকে পুরাণের প্রাচীনত্ব বা প্রণয়ন-কাল সম্পর্কে জানতে হবে। কেননা পৌরাণিক যুগে এবং পুরাণের নির্দেশনায়ই কল্পিত দেবদেবীদের মূর্তি নির্মাণ এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে পূজার্চনার উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল।

পুরাণের প্রাচীনত্ব বা প্রণয়ন-কাল সম্পর্কে জানতে হলে তার প্রণেতা বা প্রণেতাদের প্রাচীনত্ব অর্থাৎ এখন থেকে কতকাল পূর্বে তিনি বা তাঁরা জীবিত ছিলেন সে কথা জানা যে একান্ত রূপেই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় সেকথা খুলে বলার কোন প্রয়োজন হয় না।

অতএব পুরাণ প্রণেতা বলে পরিচিত বেদব্যাস মুনি এখন থেকে কতকাল পূর্বে জীবিত ছিলেন বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে সে কথা আমরা জানতে চেষ্টা করবো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও জানতে চেষ্টা করবো যে তিনি প্রকৃতই পুরাণ প্রণেতা ছিলেন কি না।

পুরাণ সমূহের প্রণয়ন কাল ঃ

"জাত মাত্রই" সরহস্য সর্ববেদ বেদব্যাস মুনির "জ্ঞান গোচর" হওয়ার কথা সুপ্রসিদ্ধ পদ্ম পুরাণের উদ্ধৃতি থেকে ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি। তিনি যে স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মার নিকট থেকে চারিবেদ, অঙ্গ সকল, ন্যায় শাস্ত্র, পুরাণ এবং "নিখিলশাস্ত্র" শ্রবন করেছিলেন উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সেকথা জানার সুযোগও আমাদের হয়েছে।

পরবর্তী কালে এই বেদব্যাস মুনিই—পুরাণের একশত কোটি শ্লোককে মাত্র চার লক্ষে পরিণত ও অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত করেছিলেন বলেও উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জানতে পারা গিয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে বেদের বিভাগকর্তা হিসাবেই তিনি "বেদব্যাস নামে অভিহিত ও বিশেষ ভাবে পরিচিত হয়েছেন। তিনি যে প্রকৃতই-বেদের বিভাগ-কর্তা ছিলেন অন্য কোন প্রমাণ ছাড়া শুধু, তাঁর বেদব্যাস নামটিই সে কথার অকাট্য প্রমাণ বহন করছে।

দুঃখের বিষয় তাঁর পুরাণ বিভাগ কর্তা হওয়া সম্পার্কে এ ধরণের বলিষ্ঠ এবং উল্লেখ যোগ্য কোন প্রমাণ বিদ্যমান নেই। অগত্যা দুর্বল ও হেঁয়ালী-পূর্ণ তথ্যাদি নিয়েই আমাদেরকে আলোচনায় ব্রতী হ'তে হবে। আমাদের হাতে এ সম্পর্কীয় যে সব তথ্যাদি রয়েছে সেগুলোর মাত্র কয়েকটিকে বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করে দেখার জন্য নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছেঃ

o বেদব্যাস মুণি যে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর "জন্মদাতা" ছিলেন পূর্ব-বর্তী আলোচনায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। "পিতা" না বলে

"জন্মদাতা" বলার কারণ হ'ল ঃ বেদব্যাস মুনি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্র বীর্যের বিধবা পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর জন্মদান করেছিলেন। অতএব "পিতা" না বলে 'জন্মদাতা" বলাই সমধিক যুক্তি সম্মত বলে বিবেচিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ ঃ জেষ্ঠ্যভ্রাত ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বিধায় কনিষ্ঠ পান্ডু পিতৃ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পান্ডুর মৃত্যুর পরে ধৃতরাষ্ট্রের জেষ্ঠ্য পুত্র দুর্যোধন পিতৃ সিংহাসনের দাবী করেন।

তাঁর এই দাবীর প্রধান কারণ ছিল দু'টি। এক ঃ জেষ্ঠ্য পুত্র হিসাবে ধৃত-রাষ্ট্রই ছিলেন পিতৃ সিংহাসনের ন্যায্য ও ন্যায়-সঙ্গত উত্তরাধিকারী। জন্মান্ধ হওয়ার কারণে কনিষ্ঠ পান্ডুকে সিংহাসনে বসানো হয়। অতএব পান্ডুর মৃত্যুর পরে ধৃতরাষ্ট্রের জেষ্ঠ্য পুত্র হিসাবে দুর্যো-ধনই ছিলেন সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদার। দুই ঃ পান্ডুর পুত্র বলে পরিচিত পঞ্চ পান্ডবের একজনও পান্ডুর ঔরস-জাত ছিলেন না। সুতরাং পান্ডুর সাথে তাঁদের একজনেরও রক্তের সম্পর্ক ছিল না। আর রক্তের সম্পর্ক না থাকলে পিতার সম্পদে উত্তরাধিকার বর্তে না। অতএব এদিক দিয়েও দুর্যোধনের সিংহাসন লাভের দাবীকে অন্যায় বা অযৌক্তিক বলা যেতে পারেনা।

সে যা' হোক, সিংহাসনের অধিকার নিয়ে উভয় দলের মধ্যে প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। আর এই যুদ্ধ যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ সে কথাও কারো অজানা নয়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, বেদব্যাস মুনিকে শুধু পুরাণ প্রণেতা বলেই দাবী করা হয় না; শ্রী মদ্ভাগবদগীতা এবং মহাভারতের প্রণেতা বলেও দাবী করা হয়ে থাকে। আর কতিপয় পুরাণ, শ্রী মদ্ভাগবদগীতা এবং মহাভারতে এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এই সব গ্রন্থ যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে লিখিত হয়েছে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

বলাবাহুল্য, বেদব্যাস মুনি যদি এসব গ্রন্থের প্রণেতা হয়ে থাকেন তবে তিনি যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও বেশ কিছু কাল অর্থাৎ এই গ্রন্থসমূহ প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই জীবিত এবং শক্তি সামর্থের অধিকারী ছিলেন সে

কথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু কতিপয় কারণে অন্ততঃ চিন্তাশীল ও বাস্তববাদী মানুষদের পক্ষে এটা সহজে ও নির্দিধায় স্বীকার করে নেয়া সম্ভব নয়। উক্ত কারণ সমূহের মাত্র কয়েকটির প্রতি নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে আলোকপাত করা যাচ্ছে :

০ বেদব্যাস মুনি যে পান্ডুর জন্মদাতা ছিলেন সে কথাটিকে বিশেষ ভাবে মনে রেখে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গকে অনুরোধ জানিয়ে রাখছি। আমাদেরকে একথাও মনে রাখতে হবে যে পান্ডুর মৃত্যু-কালে তাঁর পুত্র বলে পরিচিত যুধিষ্টির, ভীম, অর্জুণ প্রভৃতিরা যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন। অন্যথায় পান্ডুর মৃত্যুর পরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবতারণা এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

যুবক পুত্রের পিতা হিসাবে মৃত্যুকালে পান্ডু যে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে ছিলেন সে কথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে। পান্ডুর মৃত্যুর পরে সিংহাসন নিয়ে গোলযোগ, শঠতা, ষড়যন্ত্র, আপোষ প্রচেষ্টা, পাশা খেলায় হেরে গিয়ে পান্ডবদের বারো বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে কাটানো, তার পরে ফিরে এসে এমন একটি বিরাট যুদ্ধের আয়োজন এবং যুদ্ধ পরি-চালনা প্রভৃতি সব কিছু মিলে অন্ততঃ বিশটি বৎসরও কেটে গিয়ে থাকলে ততদিন পান্ডুর জন্মদাতা বেদব্যাস মুনির শুধু বেঁচে থাকাই নয়—এই যুদ্ধ সমাপ্তির পরেও সুদীর্ঘ কাল শক্তি সামর্থ সহকারে বেঁচে থেকে এই যুদ্ধের বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় সম্বলিত পুরাণ সমূহ, গীতা এবং মহাভার-তের মতো বিশাল বিশাল গ্রন্থ প্রণয়নের ঘটনাকে সত্য ও স্বাভাবিক বলে অন্ততঃ সহজে ও নির্দিধায় স্বীকার করে নেয়া যায় না। তবে যাঁরা অদ্ভুত অলৌকিক এবং প্রত্যক্ষ সত্যের সাথে সম্পর্কহীন 'কাহিনীকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করাকে ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ বানিয়ে নিয়েছেন তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

০ পুরাণের বিবরণ থেকে ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি—ক) "জাত মাত্র" সরহস্য সর্ববেদ, অঙ্গ সকল, ন্যায় শাস্ত্র, একশত কোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ এবং পুরাণের ভাষায় "নিখিল শাস্ত্র" বেদব্যাস মুনির "জ্ঞান গোচর" হয়েছিল। খ) স্বয়ং সৃষ্টি কর্তাও "চতুর্ম্মুখ" ব্রহ্মার মুখ থেকে তিনি

উপরোক্ত শাস্ত্র সমূহ শ্রবণ করেছিলেন। গ) বেদব্যাস মুনি "মানব ছদ্মরূপী" বিষ্ণু, সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং নিখিল শাস্ত্রের কর্তা।

অন্ততঃ আধুনিক কালের বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষ যে এই বিবরণ ত্রয়ের একটিকেও সত্য, স্বাভাবিক এবং বাস্তব-সম্মত বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য।

০ পুরাণ বা কোন ধর্মীয় গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা একশত কোটি হওয়া এবং বিধাতার দেয়া এই সংখ্যাকে কোন মানুষ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত করণের নামে মাত্র চার লক্ষে পরিণত করার বিবরণকে সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি রয়েছে এমন মানুষেরাও সত্য ও স্বাভাবিক বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করতে পারেন না।

০ বেদব্যাস মুনি যে বেদের বিভাগ কর্তা ছিলেন তাঁর 'বেদব্যাস' নাম-টিই সে কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহণ করছে। তিনি পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থেরও প্রণেতা ছিলেন কি না সে কথা আমরা পরে জানতে চেষ্টা করবো।

বক্ষ্যমান আলোচনার সুবিধার জন্য যদি ধরেও নেয়া যায় যে তিনি ওসব গ্রন্থেরও প্রণেতা ছিলেন তা হলেও তিনি যে বেদ বিভাগের কাজটিই প্রথমে সমাধা করেছিলেন সে কথা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। কেননা ওসব গ্রন্থের প্রায় সবগুলিতেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বিবরণ রয়েছে। আর এ যুদ্ধ যে অনেক পরবর্তী সময়ের ঘটনা সে কথাও কারো অজানা নয়।

তাঁর এই বেদ বিভাগের কাজটি কত কঠিন এবং ধৈর্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল এবারে আসুন সে সম্পর্কে অবহিত হ'তে চেষ্টা করি। এ জন্য প্রথমেই যে আমাদিগকে মোটামুটি ভাবে বেদের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে আমাদিগকে মনে রাখতে হবে যে বেদ আমাদের সম্মুখে রয়েছে তা মূল বেদ অর্থাৎ বেদব্যাস মুনি যে বেদের বিভাগ করেছিলেন তার এক নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী-কৃত "পৃথিবীর ইতিহাস" থেকে মূল বেদ ও বর্তমান বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

ঋগ্বেদের	১২ টি	শাখা	ছিল	বর্তমানে	শাখা	রয়েছে	মাত্র	৫ টি।
সামবেদের	১০০০	,,	,,	,,	,,	,,	,,	৮ ,,
যজুর্বেদের	৮৬ বা ১০০	,,	,,	,,	,,	,,	,,	২ ,,
অথর্ববেদের	১২·৩৩ টি সূক্ত	,,	,,		,,	,,	,,	৫৩০৮ ,,

এখানে গভীর ভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে—এতগুলি শাখা প্রশাখা সমন্বিত মূল বেদের মন্ত্র বা সূক্ত সংখ্যা কত লক্ষ ছিল। আর এই লক্ষ লক্ষ

মন্ত্রের পঠন, মর্মানুধাবন এবং ছন্দ ও বিষয়-বস্তু অনুযায়ী প্রথমে সে গুলিকে চা'র ভাগ এবং পরে প্রতিটি ভাগকে এতগুলি শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত করণ প্রভৃতি কাজ গুলি কত কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ ছিল এবং এই বিরাট কাজে তাঁর জীবনের কত বিরাট অংশ ব্যয় করতে হয়েছিল।

ইতিপূর্বের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বেদব্যাস মুণির জন্ম এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এই উভয় ঘটনার মধ্যে সময়ের যে ব্যবধান সাধারণতঃ তত দিন কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। তবুও যদি ধরে নেয়া যায় যে বেদব্যাস মুণি ততদিন বেঁচে ছিলেন তা হলে ততদিনে তিনি যে বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে ছিলেন সে সম্পর্কে কণা মাত্র সন্দেহও থাকতে পারে না।

বেদ বিভাগের মতো কঠিন ও বিরাট কাজ সমাধা করার পরে কোন ব্যক্তি যখন বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত তখন তাঁর পক্ষে নতুন ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতঃ একশত কোটি শ্লোকাত্মক পুরাণ এবং গীতা, মহাভারত প্রভৃতি বিরাট বিরাট গ্রন্থের প্রনয়ণ ছাড়াও শতকোটি শ্লোকাত্মক পুরাণকে অষ্টাদশ ভাগে বিভাগ করণের কাজ সম্ভব হ'তে পারে বলে কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না।

০ বেদব্যাস মুণি কর্তৃক বেদ বিভাগের উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সে সময়ে সমাজের সকল স্তরে বেদের শিক্ষা ও অনুশাসন বিশেষ ভাবে কার্যকর ছিল এবং বেদ সম্পর্কে আরো গভীর ভাবে জানা, উপলব্ধি করা, চিন্তা গবেষণা চালিয়ে যাওয়া প্রভৃতির একটা আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। ফলে লক্ষ লক্ষ মন্ত্র সম্বলিত বিশাল বেদকে ছন্দ, ধ্বনী, বিষয় বস্তু, প্রয়োগ বিধি, পঠনরীতি প্রভৃতি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন চারিটি খন্ডে এবং প্রতিটি খন্ডকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সমাজের হাতে তুলে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আর সর্বসম্মতি ক্রমে এ কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয় মহা মুণি বেদব্যাসের উপরে।

এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে বেদব্যাস মুণি যদি সখ করে বা নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী এ কাজ করতেন তবে সমাজ বিশেষ করে পশ্চাৎপন্থী ও কুপমন্ডুক সমাজপতিরা এই বেদ বিভাগের কাজকে শুধু একটি গুরুতর অপরাধ ও ধর্ম বিরোধী কাজ বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হতেন না, সকলে সম্মিলিত ভাবে প্রচন্ড আঘাত হেনে একাজকে তো পন্ড করে

দিতেনই উপরন্তু এ কাজের হোতা হিসাবে বেদব্যাস মুনিকেও চরম দন্ডে দন্ডিত না করে কোন ক্রমেই রেহাই দিতেন না।

অতএব বেদব্যাস মুনি যে সর্বসম্মতি ক্রমেই এ কাজ করে ছিলেন এবং সমাজও যে নির্দ্বিধায় ও আগ্রহ সহকারে এই বিভাগকে মেনে নিয়েছিল সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ যে সময়ে সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠতম ও একমাত্র ঐশী বিধান হিসাবে বেদের শিক্ষা ও অনুশাসন সর্বস্তরে চালু রয়েছে এবং যে সময়ে বেদের শিক্ষাকে আরো সহজ, প্রাণবন্ত, ব্যাপক ও আকর্ষণীয় ভাবে চালু করার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা বিদ্যমান রয়েছে সে সময়ে সেই প্রচেষ্টার মুখ্য ভূমিকা পালনকারী বেদব্যাস মুনি পুরাণের মতো নিম্নমানের এবং বেদের প্রতি অবমাননাকর উক্তি রয়েছে এমন গ্রন্থ প্রনয়ণ করতে পারেন সে কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য হতে পারেনা।'[১]

০ কতিপয় পুরাণ ও মহাভারতে বেদব্যাস মুনির জন্ম-বৃত্তান্ত রয়েছে। বেদব্যাস মুনি ওসব গ্রন্থের প্রণেতা হলে প্রশ্ন দেখা দেয় যে তিনি কি ভাবে এবং কোন বিশ্বাস যোগ্য সূত্র থেকে এসব বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেছিলেন। দুঃখের বিষয় বহু চেষ্টা করেও তেমন কোন সূত্রের সন্ধান আমরা পাইনি।

তাঁকে ওসব গ্রন্থের প্রণেতা বলে স্বীকার করা হলে সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করে নিতে হয় যে—সিগুনা পাখি-বাহিত যুবনাশ্বের বীর্য পান করতঃ পুটি মাছের গর্ভ সঞ্চার, সেই গর্ভে মৎস্যগন্ধার জন্ম গ্রহণ, এবং মৎস্যগন্ধার কুমারী অবস্থায় পরাশর মুনির সাথে অবৈধ ভাবে মিলনের ফলে তাঁর নিজের জন্ম লাভ প্রভৃতি কাহিনী সমূহকে তিনি সত্য, অভ্রান্ত এবং বাস্তব-সম্মত বলে বিশ্বাস করেছিলেন। অন্যথায় তিনি যে অন্ততঃ নিজের ও নিজের গর্ভধারিণীর জন্ম সম্পর্কীয় এই সব কাহিনীকে পুরাণের অন্তর্ভূক্ত করতে পারতেন না সে কথা সহজেই অনুমেয়। বলাবাহুল্য বেদব্যাস মুণির মত একজন পন্ডিত ও প্রখ্যাত ব্যক্তি যে এ ধরণের বিশ্বাস পোষণ করতে পারেন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই সে কথা মেনে নিতে পারে না।

০ পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে এমনি ধরণের সূত্রবিহীন এবং অদ্ভুত

---

১. পুরাণকে যে "সর্বশাস্ত্রের আদি" "সর্বলোকের উত্তম" "সর্বজ্ঞানের "উৎপাদক প্রভৃতি বলা হয়েছে প্রসিদ্ধ পদ্ম পুরাণের উদ্ধৃতি থেকে ইতিপূর্বে সে কথা আমারা জানতে পেরেছি।

ও অবাস্তব বহু ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিশ্বাস যোগ্য সূত্রের উল্লেখ না থাকায় ধরে নিতে হয় যে স্বয়ং বেদব্যাস মুনিই কল্পনার সাহায্যে এগুলো রচনা করতঃ পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

অথচ এমন একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, প্রখ্যাত পন্ডিত এবং বেদের বিভাগ-কর্তা বেদব্যাস মুনি কর্তৃক এ ধরনের কাজ সংঘটিত হওয়ার কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস যোগ্য হতে পারেনা। কেন পারে না সে সম্পর্কে একটি মাত্র কাহিনীর বিবরণই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি। কাহিনীটি তাঁর নিজের অন্যতম পুত্র-বধূ সম্পর্কীয়। কতিপয় পুরাণ এবং এবং মহাভারতে সবিস্তারে এই কাহিনীটি বর্ণিত রয়েছে।

বেদব্যাস মুনি যে পান্ডুর জন্মদাতা সে কথা সকলেরই জানা রয়েছে, এই পান্ডুর স্ত্রীর নাম—কুন্তি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশঃ কুন্তি কুমারী অবস্থায় অবৈধ ভাবে সূর্যের সাথে মিলিত হন। ফলে গর্ভের সঞ্চার হয়। কলংক ও কুমারীত্ব নাশের ভয়ে তিনি স্বীয় কাণের মাধ্যমে গর্ভস্থ সন্তানটিকে প্রসব করেন। কাণ বা কর্ণের মাধ্যমে প্রসূত হওয়ার কারণে পুত্রটির নাম রাখা হয়—"কর্ণ"। পরবর্তী কালে এই কর্ণ যে একজন প্রসিদ্ধ দাতা এবং প্রখ্যাত যোদ্ধা রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আংশ গ্রহণ করেছিলেন উপরোক্ত গ্রন্থ সমূহে তার সবিস্তার বর্ণনা রয়েছে।

বেদব্যাস মুনির মতো মানুষ তার নিজের, নিজ মাতা এবং নিজ পুত্র বধূ সম্পর্কীয় এসব কাহিনী রচনা করতঃ সেই কাহিনীকে চির দিনের জন্য মহাভারতের অঙ্গীভূত করবেন অন্ততঃ আধুনিক যুগের চিন্তাশীল মানুষেরা সেকথা সত্য বলে মেনে নিতে পারে না।

বেদের বহুল ও ব্যাপক প্রচারই যে বেদ বিভাগের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ইতিপূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। অন্ততঃ এই প্রচারাভিযান চালু থাকা পর্যন্ত পুরাণ প্রণয়নের প্রশ্নই যে উঠতে পারেনা সেকথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

০ বেদই যে হিন্দু সমাজের সর্ব প্রথম ও সর্ব প্রধান ধর্মীয় বিধান সে কথা কারো অজানা নয়। অতএব যতদিন বেদ মন্ত্রের রচনা, বেদের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন ও বেদ নির্দেশিত পন্থায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান তথা যাগ-যাজ্ঞাদির অনুষ্ঠান কঠোর ভাবে অনুসৃত হয়েছে ততদিন যে পুরাণ-প্রনয়ন ও পুরানের শিক্ষানুযায়ী মূর্তি পূজার উদ্ভব ঘটে নি—ঘটা যে সম্ভবই ছিলনা সেকথা সহজেই অনুমেয়।

যতদূর প্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে দৃঢ়তার সাথে বলা যেতে পারে যে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তী বহু সময় পর্যন্ত বেদ রচনা, বেদের শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন এবং বেদ-নির্দেশিত পন্থায় যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল।

উদাহরণ স্বরূপ অম্বিকাও অম্বালিকা (অর্থাৎ বেদব্যাস মুনি যাদের গর্ভে যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর জন্ম দিয়েছিলেন) কর্তৃক বেদমন্ত্র রচনার কথা বলা যেতে পারে। তদানিন্তন কালে অনুষ্ঠিত একটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বদিগকে লক্ষ্য করতঃ তাঁরা উভয়ে যে কতিপয় বেদমন্ত্র রচনা করেছিলেন আজও তা যজুর্বেদের পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে।

অতএব বেদ মন্ত্র রচনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের কাজ চালু থাকা থেকে সে সময় পর্যন্ত যে পুরাণ প্রনয়ণ ও মূর্তি পূজার উদ্ভব ঘটে নি অত্যন্ত দঢ়তার সাথে সে কথা বলা যেতে পারে।

০ বেদব্যাস মুনি এমন কি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও যে মূর্তি পূজার সাথে সামান্যতম পরিচয়ও ছিল না মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবদগীতার তিনটি মাত্র উদ্ধৃতি থেকে তার অকাট্য প্রমাণ তুলে ধরা যাচ্ছে।

শুধু তা-ই নয়; তাঁরা উভয়েই যে ঈশ্বর বা কোন দেববেদীর মূর্তি কল্পনারও ঘোর বিরোধী ছিলেন এ থেকে তার প্রমাণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বলাবাহুল্য মূর্তি পূজার সাথে বেদব্যাস মুনির যদি পরিচয়-ই না থেকে থাকে তবে মূর্তি পূজার গোড়া পত্তনকারী পুরাণের প্রনয়ণ তো দূরের কথা তার সাথে বেদব্যাস মুনির কোন পরিচয়ও থাকতে পারে না। উক্ত উদ্ধৃতি ও তার বঙ্গানুবাদ যথাক্রমে ঃ

রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্যো ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম।
স্তুত্বা হ নির্বর্চণীয় তপস্বী নো গুরো !
ব্যাপীত্বঞ্চ নিরাকৃতম যত্তীর্থ যাত্রা দিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তর্দাবিকলতা দোষত্রয়ং মদ্ধৃয়ম।।

অর্থাৎ—হে জগদীশ ! তোমার কোন রূপ নাই; অথচ আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি। তুমি অনির্বর্চণীয় অর্থাৎ তোমার গুণের কোন শেষ নাই; অথচ আমি স্তব স্তুতির মাধ্যমে তোমার গুণকীর্তন করতঃ তোমার সেই অনির্বর্চণীয়ত্বকে খর্ব করিয়াছি। তুমি সর্বব্যাপী; অথচ আমি তীর্থ যাত্রা দ্বারা তোমার সেই সর্ব ব্যাপীত্বকে ক্ষুন্ন করিয়াছি। অতএব হে জগদীশ ! তুমি আমার অনুষ্ঠিত এই দোষত্রয়কে ক্ষমা কর।

—মহাভারত।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এম. এ. সপ্ততীর্থ, দর্শন শাস্ত্রী, সিদ্ধান্ত বাগীশ, ভক্তিভূষণও ডাঃ মোজাহার উদ্দিন আহম্মদ, এম. এ, বি-এল, ডি-ফিল, এবং শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, কাব্য জ্যোতিস্তীর্থ, বিদ্যারত্ন. জ্যোতিষাচার্য কর্তৃক রচিত এবং বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "হিন্দু ধর্ম শিক্ষা" নামক পুস্তকে উপরোদ্ধৃত শ্লোকটির পদ্যানুবাদ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নে তা হুবহু উদ্ধৃত করা হলঃ

"রূপ নাহি আছে তব, তুমি নিরাকার,
ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি আকার তোমার।
বাক্যের অতীত তুমি নাহি তব সীমা
স্তবে কিন্তু বলিয়াছি তোমার মহিমা।
সর্বত্র সর্বদা তুমি আছ সমভাবে,
অমান্য করেছি তাহা তীর্থের প্রস্তাবে।
করেছি এতদিন দোষ আমি মূঢ় মতি'
ক্ষমা কর জগদীশ অখিলের পতি।"

[কবিতাটি খুব সুন্দর, প্রাঞ্জল এবং হৃদয় গ্রাহী হয়েছে। তবে দ্বিতীয় পংক্তিতে "ধ্যানে কিন্তু বলিয়াছি" স্থলে "ধ্যানে কিন্তু কল্পিয়াছি" লিখিত হ'লে মূলের সাথে সঙ্গতি রক্ষিত হ'ত। কেননা, মূলে "ধ্যানেন যৎ কল্পিতম" লিখিত রয়েছে।

আসলে ধ্যানের মাধ্যমে ঈশ্বর বা উদ্দিষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে কিছু বলা হয় না—তাঁর রূপের কল্পনাই করা হয়ে থাকে এবং তা-ই শাস্ত্রের নির্দেশ। আশা করি সংশ্লিষ্ট পন্ডিতবর্গ এই দীনের প্রতি রুষ্ট না হয়ে বিষয়টি সম্পর্কে ভেবে দেখবেন।—লেখক।

বেদব্যাস মুনির এ প্রার্থনা বাক্যটি বিশেষ ভাবে প্রনিধান যোগ্য। বলা-বাহুল্য রূপ কল্পনা করার কারনেই যিনি অনুতপ্ত এবং ক্ষমা প্রার্থী হ'ন মূর্তি নির্মাণ এবং মূর্তি পূজার সাথে তার কোন সম্পর্ক বা পরিচয় থাকতে পারেনা।

অব্যক্তং ব্যক্তি মাপন্নং মন্যন্তে মাম বুদ্ধয় ঃ
পরং ভাবমজানান্তো মমাব্যয়মনুত্ত মম।।

অর্থাৎ—বুদ্ধিহীনেরা আমার নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ অবগত নহে; তাহারা আমাকে ব্যক্তি ভাব বলিয়া মনে করে।

—শ্রী মদ্ভাগবদগীতা ৭ম অঃ ২৪ শ্লোক

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভব অল্প মেধ সাম্
দেবান্ দেব যজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।

অর্থাৎ—অতি অল্প মেধার অধিকারী ব্যক্তিগণই দেবতার আরাধণা করে। তাহারা ধ্বংসশীল দেবতাকেই প্রাপ্ত হইবে। আর, আমার ভক্তগণ অবিনশ্বর আমাকেই জানে এবং আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

—ঐ ২৫ ২৫তম শ্লোক।

বলা বাহুল্য, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যেখানে নিজেকে ব্যক্তি ভাবহীন, অবিনশ্বর প্রভৃতি এবং দেবতাদিগকে নশ্বর ও তাদের ভক্তদিগকে বুদ্ধিহীন, অত্যল্প বুদ্ধির অধীকারী প্রভৃতি বলেছেন সেখানে ঈশ্বর বা দেবদেবীদিগের মূর্তি নির্মাণ কারীরা যে কত বেশী বুদ্ধিহীন সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

বেদব্যাস মুনি যে পুরাণ প্রণেতা হ'তে পারেন না এবং তাঁর জীবদ্দশায় এমন কি তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরেও যে পুরাণ প্রণীত হয়নি সে সম্পর্কে এমনি ধরণের আরো অনেক যুক্তি প্রমাণ তুলে ধরা যেতে পারে। বাহুল্য বোধে সেগুলো পরিত্যক্ত হ'ল। পরিশেষে পুরাণের প্রণয়ন কাল সম্পর্কে আর একটি মাত্র দিকের প্রতি সংক্ষেপে আলোকপাত করতঃ এ নিবন্ধের ইতি টানছি।

বেদই যে সর্ব প্রথম ও সর্বপ্রধান ঐশী বিধান প্রতিটি হিন্দুই অত্যন্ত গভীর ভাবে সে বিশ্বাস পোষণ করেন এবং এ বিধানানুযায়ী গড়ে' তোলা সমাজ-ব্যবস্থা যে আদর্শ এবং অনুপম এমন একটা বিশ্বাসও তাঁদের মনে অত্যন্ত গভীর ভাবে বিরাজমান রয়েছে। এ বিধানুযায়ী গড়ে' তোলা সমাজ ব্যবস্থা চালু থাকা সময়টাকে ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর করে রাখার জন্য তাঁরা যে তার 'সত্যযুগ' নাম দিয়েছেন আশা করি শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

সত্য যুগের পরবর্তী যুগ গুলোর নাম যথাক্রমে ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলি যুগ। এই যুগটি যে অতীব জঘন্য এবং ভীতি-জনক হিন্দু ধর্মের প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই সে কথা বলা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ জঘন্য ও ভীতি-জনক হওয়ার কারণও সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনার সার-সংক্ষেপ হ'ল ঃ

এ যুগের মানুষ বেদের শিক্ষা ভুলে যাবে এবং বেদ বিরোধী কার্যকলাপের দ্বারা পৃথিবীকে এমন ভাবেই পাপে পরিপূর্ণ করে তুলবে যে, পৃথিবীর

কুত্রাপি ন্যায় ও সত্যের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থেও এই যুগটি সম্পর্কে প্রায় একই ধরণের উক্তি লিপিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। অতএব এ যুগটি যে অতীব জঘন্য এবং ভয়াবহ সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকছেনা।

অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের কথা ছেড়ে দিয়ে পরবর্তী নিবন্ধে "বেদের শিক্ষা ভুলে যাওয়া" এবং "বেদ বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার" কারণ ও তাৎপর্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হবে। তবে এই যুগটি যে অতীব জঘন্য এবং ভয়াবহ সে কথা অবশ্যই আমাদিগকে মনে রাখতে হবে।

বক্ষ্যমান নিবন্ধের উপসংহার এবং পরবর্তী নিবন্ধের পটভূমিকা স্বরূপ এখানে দ্বাপর যুগ সম্পর্কে দু'কথা বলা প্রয়োজন। কেননা, বেদব্যাস মুনি ছিলেন এই দ্বাপর যুগেরই মানুষ। সুতরাং বেদবিভাগ যে এই যুগেরই এক অমর অবদান সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে পারে না।

এই যুগেও যে বেদ মন্ত্র রচনার কাজ এবং যজ্ঞানুষ্ঠান চালু ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং সেই যজ্ঞের অশ্বগুলিকে লক্ষ্য করতঃ বেদব্যাস মুনির বিধবা ভ্রাতৃবধূ অর্থাৎ যাদের গর্ভে তিনি যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র ও পান্ডুর জন্ম-দিয়েছিলেন সেই অম্বিকা ও অম্বালিকা কর্তৃক কতিপয় বেদ মন্ত্রের রচনা থেকে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিপূর্বে আমরা পেয়েছি।

বেদ মন্ত্রের রচনা ও যজ্ঞানুষ্ঠানের কাজ চালু থাকা থেকে সুস্পষ্ট রূপেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে তখনো মূর্তি পূজার উদ্ভব ঘটে নি এবং তখনো যজ্ঞা-নুষ্ঠানের কাজ পরিচালনার জন্য ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, হোতা, উদগাতা প্রভৃতি উপাধিধারী বহু সংখ্যক বেদজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান পন্ডিত বিদ্যমান ছিলেন। বহু সংখ্যক মুনি মহাপুরুষও যে এযুগে বিদ্যমান ছিলেন তেমন প্রমাণেরও অভাব নেই।

বেদ মন্ত্রের রচনা এবং যজ্ঞানুষ্ঠান চালু থাকা থেকে এ কথাও সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে তখনো বেদের পঠন, পাঠন, কন্ঠস্থকরণ, চর্চা গবেষণা প্রভৃতির জন্য ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহু সংখ্যক বিদ্যাপীঠ সারা দেশে ছড়িয়ে ছিল এবং বহু সংখ্যক প্রখ্যাত পন্ডিত ওসবের পরিচালনায় নিযুক্ত ছিলেন।

সত্য ও ত্রেতা যুগ ব্যাপী যে বেদ অক্ষত ও অখন্ড অবস্থায় বিদ্যমান থেকে

সমাজের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হল, দ্বাপর যুগের বেদব্যাস মুনি যদি শুধু মাত্র নিজের ইচ্ছা ও উদ্যোগে সেই অক্ষত ও অখন্ড বেদকে ভিন্ন ভিন্ন চার খন্ডে বিভক্ত ও প্রতি খন্ডের ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদানের কাজটি সমাধা করতেন তবে তদানিন্তন কালে বিদ্যমান এই সব পন্ডিত ব্যক্তি ও মুনি মহা-পুরুষেরা যে একাজকে ভীষণ ভাবে ধর্মবিরোধী বলে অভিমত দিয়ে প্রচন্ড বিক্ষোভে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলতেন এবং কোন ক্রমেই তাকে সমাজে চালু হতে দিতেন না ইতিপূর্বে সে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

অতএব বেদ বিভাগের এই সিদ্ধান্তটি যে সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়েছিল এবং এ কাজের দায়ীত্বও যে সর্বসম্মতি ক্রমেই বেদব্যাস মুনির উপরে অর্পিত হয়েছিল অনায়াসে সে কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

আর বেদ বিভাগের এই সর্বসম্মত কাজটি যে সফল হয়েছিল এবং তার সুফল যে অন্তত গোটা দ্বাপর যুগ ব্যাপী স্থায়ী ও কার্যকর ছিল সেকথা বুঝতে পারাও মোটেই কঠিন নয়।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ বেদের শিক্ষা এবং বেদ-বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি স্থায়ী ও কার্যকর থাকা পর্যন্ত অন্য কথায় গোটা দ্বাপর যুগের মধ্যে পুরাণ প্রণয়ণের কোন প্রশ্নই যে দেখা দিতে পারেনা সে কথা খুলে বলার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। বেদব্যাস মুনি কর্তৃক যে পুরাণ প্রণীত হয়নি সে কথা তো বক্ষ্যমান নিবন্ধের তথ্য প্রমাণাদি থেকেও সুস্পষ্ট রূপই জানতে পারা গিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল—দ্বাপর যুগে এবং বেদব্যাস মুনি কর্তৃক যদি পুরাণ সমূহ প্রণীত না হয়ে থাকে তবে কবে এবং কার দ্বারা এ কাজটি সমাধা হয়েছে?

বলা বাহুল্য, এই প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তরই হতে পারে আর তা হল: কলিযুগে এবং সেই যুগেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ প্রণীত হয়েছে এবং পুরাণ নামক এই সব গ্রন্থের মর্যাদা ও বিশ্বস্ততাকে সাধারণ মানুষদিগের কাছে সমুন্নত করে রাখার জন্য সুকৌশলে এ সবের প্রণেতা হিসেবে বেদব্যাস মুনির নামটি ব্যবহার করা হয়েছে।

পুরাণ সমূহ যে কোন একজন মানুষের দ্বারা প্রণীত হয়নি বরং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের দ্বারা প্রণীত হয়েছে পুরাণের বর্ণনা থেকেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাণের পাঠকগণ যদি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেন তবে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, পুরাণ সমূহের প্রত্যেকটিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী অগ্নি, লিঙ্গ প্রভৃতির কোন একজন দেব বা দেবীকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার সাথে সাথে অন্য সব দেব-দেবীদিগকে তাঁর অধিন, আজ্ঞাবহ এবং নিকৃষ্ট প্রমাণ করার কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পুরাণ সমূহের প্রণেতা যে একজন হতে পারে না এবং প্রণেতাদিগের যিনি যে দেব বা যে দেবীর ভক্ত তিনি যে সেই দেব বা সেই দেবীকে প্রাধান্য দিয়ে পুরাণ রচনা করেছেন এ থেকে সে কথাই দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পুরাণের শিক্ষা ঃ

কলিযুগে বেদের শিক্ষা ভুলে যাওয়া এবং বেদবিরোধী কুকর্মকলাপের দ্বারা পৃথিবীকে পাপে পরিপূর্ণ করে তোলা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে হলে বিরাট আকারের একখানা পুস্তক লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বলাবাহুল্য, এখানে তার কোন সুযোগ নেই।

অতএব সেদিকে না গিয়ে-আমরা শুধু ধর্মের মূল উৎস অর্থাৎ বিশ্বপ্রভুর পরিচয় সম্পর্কেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখবো এবং সেজন্য এই পুস্তকের "বেদের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধের আলোকে আমরা বৈদিক যুগের এ সম্পর্কীয় চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তা যাঁচাই করবো। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব পরিবর্তন ঘটানো হয়ছে তার কতিপয়ের উল্লেখ আমাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে করতে হবে।

o বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা ছিলনা, ফলে বেদমন্ত্রের রচনা, বেদপাঠ, বেদের শিক্ষা গ্রহণ, অনুশীলন, চিন্তাগবেষণা প্রভৃতিতে সকলে সমভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারতো।

কলিযুগে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সকলের জন্য ওসব কাজ এমনকি বেদ স্পর্শ করণও সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ ও ভীষণ শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়।

o বৈদিক যুগ থেকে দ্বাপর যুগ পর্যন্ত নারীদিগেরও যে বেদ মন্ত্র রচনা ও যজ্ঞকার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল দ্বাপর যুগের অম্বিকা কর্তৃক

অশ্বমেধ যজ্ঞে গমন এবং যজ্ঞের অশ্বদিগকে লক্ষ্য করত ঃ দেবমন্ত্র রচনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

কলিযুগে নারী মাত্রকেই "দাসী" সাব্যস্ত করতঃ শুধু ওসব অধিকারই ছিনিয়ে নেয়া হয় নি, কোন ধর্মানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ, ঈশঃ চিন্তা এমন কি স্বামী ছাড়া কোন দেবদেবী বা অন্য করো উপাসনাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

o বৈদিক যুগে অক্ষতযোনি বিধবা দিগের পুনর্বিবাহ দেয়া হত; অন্যান্যদিগের জন্য পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকলেও "দেবরের" দ্বারা সন্তানোৎপাদনের সুযোগ দেয়া হত। "দেবর" বলতে শুধু মৃত স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদরকেই বুঝাতো না দ্বিতীয় বরকেও বুঝাতো। শাস্ত্রানুযায়ী (দে+বর) দেবর অর্থ—দ্বিতীয় বর। এই প্রথাকে "নিয়োগ প্রথা" বলা হত। আর উর্ধ পক্ষে একাদশ ব্যক্তিকে দেবর হিসেবে সন্তানোৎপাদনের জন্য নিয়োগ করা যেতো।

কলিযুগে ক্ষতযোনি অক্ষতযোনি নির্বিশেষে সকল বিধবার জন্যই পুনর্বিবাহ এবং নিয়োগ প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। শুধু তা-ই নয়— মহাপুণ্যজনক কাজ হিসেবে—"সতীদাহ" বা মরা স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত বিধবাদিগকে পুড়িয়ে মারার নৃসংশ ব্যবস্থা চালু করা হয়।

o বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠান, সন্যাসব্রত, শ্রাদ্ধে গোমাংসের ব্যবহার, অতিথি আপ্যায়ণে গো-হত্যা এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন প্রভৃতি অতি পুণ্যজনক কাজ হিসেবে প্রচলিত ছিল।

কলিযুগে এই কাজ সমূহকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।[১]

o বৈদিক যুগে বর্ণ ব্যবস্থা বা জাতিভেদ প্রথা ছিল না; পক্ষান্তরে কলিযুগে এই প্রথা প্রবর্তন করতঃ কোটি কোটি মানুষকে অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ, দাস, হরিজন প্রভৃতি আখ্যা প্রদান ও তাদের সকল প্রকারের অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়।

o বৈদিক যুগে নর নারী নির্বিশেষে সকলেরই বিদ্যার্জন, বেদপাঠ, চিন্তাগবেষণা প্রভৃতির অধিকার ছিল এবং এসবকে অতীব পুণ্যজনক কর্ম হিসেবে

---

১. অশ্বালম্ভং গবালম্ভং সন্যাসং পল পৈত্রিকম
দেবরেন সুতোৎপত্তি কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ।

—পরাশর সংহিতা।

প্রতিপালন করা হত। অথচ কলিযুগে তথাকথিত কতিপয় উচ্চ শ্রেণী ছাড়া নর-নারী নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য এসব কাজ নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়।

o বেদ এবং উপনিষদের যুগে অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে কোন দেব বা দেবীর মূর্তি নির্মাণ এবং ভোগ নৈবেদ্য দিয়ে পূজার্চনার ব্যবস্থা ছিলনা। এমনকি ওসব যুগের মানুষ মূর্তি পূজার সাথে পরিচিতই ছিলনা। অথচ কলিযুগে অসংখ্য মূর্তি নির্মাণ ও উপাস্য জ্ঞানে পূজার্চনার কাজ চালু করা হয়।

কলিযুগে বেদ ও উপনিষদের শিক্ষাকে কিভাবে নস্যাৎ অথবা পরিবর্তন করা হয়েছে আশা করি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই সে সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

অতঃপর ধর্মের মূল অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কীয় ধারণা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্পর্কে ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাচ্ছে।

ভক্তির উচ্ছাস ঃ

"বেদের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধ আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসা এবং ভক্ত এই চার ধরণের মানসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিষয়টি খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া কলিযুগে পাপ ষোল কলায় পরিপূর্ণ হওয়ার কারণ কি তার সুস্পষ্ট প্রমাণও এই মানসিকতার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এই ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার কারণ এবং তার ফলশ্রুতি সম্পর্কে এখানে আবার সংক্ষেপে আলোকপাত করতে হচ্ছে।

o সুদূর অতীতে জড়া-মৃত্যু, রোগব্যাধি, মড়ক-মহামারী, প্লাবন, ভূমিকম্প, সাধারণ শত্রু, হিংস্র শ্বাপদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির আক্রমণে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষদিগের মন ভীত-সন্ত্রস্ত ও দিশাহারা হয়ে পড়তো, বাঁচার তাকীদে তাদের মন আর্তনাদ করে উঠতো; পন্ডিত মন্ডলী তাদের এই মানসিকতাকে "আর্ত মানসিকতা" বলে অভিহিত করেছেন।

এই আর্ত মানসিকতা নিয়ে বৈদিক ঋষিগণ ইন্দ্র, অগ্নি, রাত্রি, বরুণ প্রভৃতিকে উপাস্য কল্পনা করতঃ ত্রাণ লাভের কাতরতা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বেদ মন্ত্র

রচনা করেছেন। তাই বেদের প্রাথমিক মন্ত্র সমূহে এই আর্তমানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

পরবর্তী সময়ে কৃষির উদ্ভাবন যাযাবর বৃত্তির অবসান ঘটায়, স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গৃহ নির্মাণ ও সমাজগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই ভাবে খাদ্য, আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিকে অগ্রগতি সাধিত হয়। তখন প্রচুর শস্য, দুগ্ধ, মধু, সোমরস, পশুসম্পদ প্রভৃতি লাভের জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। পন্ডিত মন্ডলী তাদের এই মানসিকতাকে "অর্থার্থীর মানসিকতা" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ সময়ে রচিত বেদ মন্ত্র সমূহে ঊষা, পর্জন্য, বনস্পতি, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে ওসব সম্পদাদি প্রদানের জন্য প্রার্থনা নিবেদনের পরিচয়ই আমরা পেয়ে থাকি।

o এই ভাবে "অন্ন চিন্তার" একটা সুরাহা হওয়ার ফলে সমাজের কিছু সংখ্যক মানুষ "অন্য চিন্তার" সুযোগ লাভ করে। ফলে জীবন ও জগত সম্পর্কীয় নানা জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন তাদের মনে ভীড় জমাতে থাকে। সেই কারণে পন্ডিতবর্গ তাদের এই মানসিকতার নাম দিয়েছেন "জিজ্ঞাসার মানসিকতা"।

এই মানসিকতা নিয়ে রচিত বেদ মন্ত্র সমূহে বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। সেই বৈশিষ্ট্য হল ঃ

এতকাল ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতিকে মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, জন্ম-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতির কর্তা বলে কল্পনা করা হত। আলোচ্য সময়ে কোন কোন ঋষি এসব কিছুর মূলে একটি অসীম, অনন্ত এবং সর্বশক্তিমান সত্তার অস্তিত্ব বিরাজমান থাকার কল্পনা করতে থাকেন। এই সত্তার একটি নামও তাঁরা প্রদান করেন। আর সেই নামটি হল—ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্ম।

যেহেতু ব্রহ্ম অসীম, অনন্ত এবং সর্বশক্তিমান, সুতরাং তিনি চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান হতে পারেন না; মানবীয় ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-গবেষণা দ্বারা তাঁর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ও সম্ভব হতে পারে না। অথচ উৎসাহী বৈদিক মুণি ঋষিগণ তাঁর স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে থাকেন। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁদিগকে যে ব্যর্থ হতে হয় এবং তাঁরা যে নানা মতে বিভক্ত হয়ে পড়েন "বেদের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধে বিভিন্ন তথ্য প্রমাণাদি থেকে সেকথা আমরা জানতে পেরেছি।

তবে তাঁদের এই অনুসন্ধিৎসা বা জিজ্ঞাসার মানসিকতা এবং চিন্তা-গবেষণার

ধারা অব্যাহত থাকলে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব না হলেও একদিন হয়তো এসম্পর্কে একটা ঐক্যমতে উপনীত হতে তাঁরা সক্ষম হতেন। কিন্তু বিশেষ কারণে তা আর সম্ভব হয়ে উঠেনি। ফলে ভিন্ন ভিন্ন মুনির সমর্থক ও অনুসারীরা নিজ নিজ মুনির মতকেই সত্য, অভ্রান্ত ও একমাত্র বিশ্বাস যোগ্য বলে ধারণা পোষণ এবং প্রচারনার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

এই ভাবে একই ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন দল কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন রূপে কল্পিত ও উপাসিত হতে থাকেন। পরবর্তীরা এই কাল্পনিক রূপকে এক একটা দেবতা (দেব বা দেবী) হিসেবে কল্পনা করতে থাকেন। কালক্রমে এই কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য পাথর, মাটি, ধাতব পদার্থ প্রভৃতির দ্বারা মূর্তিগড়া ও ফুল চন্দন, ভোগ নৈবেদ্য প্রভৃতি নানা উপকরণে তাদের পূজা উপাসনার কাজ চালু হয়ে যায়। পরিশেষে দেবদেবীরাই প্রাধান্য লাভ করে এবং মূর্তিপূজার হট্টগোলে ব্রহ্মের নামটিও তলিয়ে যায়।

প্রসঙ্গ ক্রমে উপরের এই কথাগুলো বলতে হল। মুনিরা "নানামতে" বিভক্ত হওয়ার পরে কেন তাঁরা ঐক্যমতে উপনীত হতে পেরে ছিলেন না এবং কোন্ বিশেষ কারণে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা বা জিজ্ঞাসার মানসিকতা ও চিন্তাগবেষণার কাজ ব্যর্থ ও ব্যাহত হয়েছিল প্রথমে আমাদিগকে সেই বিশেষ কারণটি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অতএব অতঃপর পৃথক একটি উপ-শিরোনাম দিয়ে সেই বিশেষ কারণটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

ভক্তির সীমাহীন উচ্ছাস :

ভক্তি-ভাজনকে ভক্তি করা যে একটি বিশেষ মানবীয়গুণ সে সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কিন্তু তাই বলে ভক্তির সীমাহীন উচ্ছাস, অন্ধভক্তি, অতিভক্তি, ভক্তির প্রদর্শনী বা কপটতা এবং অপাত্রে ভক্তি প্রদর্শন প্রভৃতিও কোন ক্রমেই সমর্থন যোগ্য হতে পারে না।

অথচ কলিযুগে এসব কিছুই হয়েছে এবং প্রায় সকল মহল থেকেই বিপুল সমর্থনও লাভ করেছে। শুধু তা-ই নয়; খোঁজ-খবর নিলে দেখা যাবে যে, এই সব কার্যকলাপে যিনি বা যাঁরা যত বেশী মত্ততা ও দিক-বেদিক জ্ঞান শূন্যতার পরিচয় দিয়েছেন বা দিতে পেরেছেন তিনি বা তাঁরা তত বেশী ধার্মিক এবং তত বড় মহাপুরুষ বলে পরিচিত ও সম্পূজিত হয়েছেন।

পরবর্তী "দেব দেবীদিগের শ্রেণী বিভাগ" শীর্ষক নিবন্ধে এ সম্পর্কীয় তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরা হবে। ভক্তির সীমাহীন উচ্ছাস কিভাবে বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করতঃ কলিযুগে পাপকে ষোলকলায় পরিপূর্ণ করে তুলেছে অতঃপর সে সম্পর্কেই কিছুটা আলোকপাত করা যাচ্ছে :

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে আর্ত, অর্থার্থী এবং জিজ্ঞাসার মানসিকতা নিয়ে বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে যে সব বেদমন্ত্র রচনা করা হয়েছে সেগুলোর মাঝেও "ভক্ত মানসিকতার" প্রচ্ছন্ন ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এটা যে খুবই স্বাভাবিক সেকথা বলাই বাহুল্য। বেদ রচনার শেষ পর্যায়ের মন্ত্রগুলোতে এই ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতএব সে সময়ে ভক্ত মানসিকতা যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল সেকথা বুঝতে কষ্ট হয়না।

কিন্তু কলি যুগে এই ভক্ত মানসিকতাকে এক অতি নিদারুণ বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হতে হয়। যার ফলে জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিবেক-বুদ্ধি প্রভৃতি ভীষণ-ভাবে আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

আমরা জানি : কারো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অবহিত হওয়ার পরেই তার প্রতি ভক্তি বা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে। অর্থাৎ ব্যক্তির চরিত্র, কার্যকলাপ, যোগ্যতা, মান-মর্যাদা প্রভৃতি নিয়ে পর্যালোচনা করার পরে বিবেকের রায় অনুযায়ী স্বতস্ফূর্ত ভাবে মন তার প্রতি ভক্তি অথবা ঘৃণা পরায়ণ হয়ে উঠে।

এমতাবস্থায় অর্থাৎ—জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বিবেক-বুদ্ধিই যেখানে আড়ষ্ট এবং আচ্ছন্ন সেখানে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচনা বা ভাল-মন্দ ও সত্য-মিথ্যার যাচাই বাছাই প্রভৃতির কোন প্রশ্ন যে উঠতে পারে না সেকথা সহজেই অনুমেয়।

দুর্ভাগ্য বশতঃ কলিযুগে এই অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল বা সুপরিকল্পিত ভাবে এই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছিল। কথাটিকে আরও একটু বিশদ ভাবে বললে বলতে হয় যে, আর্ত, অর্থার্থী এবং জিজ্ঞাসু মানসিকতা নিয়ে যে সব বেদ মন্ত্র রচনা করা হয়েছিল সে সবের মধ্যেও যে স্বাভাবিক কারণেই ভক্ত মানসিকতার প্রচ্ছন্ন ছাপ দেখতে পাওয়া যায় ইতি পূর্বে সেকথা বলা হয়েছে। দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে এই ভক্ত মানসিকতা প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। কলিযুগে তা প্রবলতর হতে হতে শেষ পর্যায়ে এক সীমাহীন উচ্ছাসে

পরিণত হয়। অবশ্য এর পশ্চাতে বিভিন্ন কারণও রয়েছে। পরবর্তী "দেবদেবী-দিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও শ্রেণী বিভাগ" শীর্ষক নিবন্ধে এই কারণ সমূহ তুলে ধরা হবে।

সুতরাং আপাততঃ সেদিকে না গিয়ে কলি যুগে ভক্তির এই সীমাহীন উচ্ছাস শুধু মাত্র ব্রহ্ম সম্পর্কীয় ধারণা বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে পালটিয়ে দিয়ে কতখানি জঘন্য ও লজ্জাজনক পর্যায়ে টেনে নামিয়েছে সে সম্পর্কেই কিছুটা আভাস দেয়া যাচ্ছে। তবে বলে রাখা ভাল যে, এ সব কিছুই করা হয়েছে —কলিযুগে এবং সেই যুগে রচিত পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থের সাহায্যে। অতএব এ সম্পর্কীয় তথ্য প্রমাণাদি ঐ সব গ্রন্থ থেকেই আমাদিগকে তুলে ধরতে হবে।

ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বৈদিক পন্ডিতদিগের মধ্যে নানা ধরনের মতভেদ থাকার প্রমাণ আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি। তবে তাঁর স্বরূপ যা-ই হোক তিনি যে, এক এবং অদ্বিতীয় এমন একটা বিশ্বাস প্রায় সকল পন্ডিতের মধ্যেই বিরাজমান ছিল। তাঁরা সেই একক ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে "ওঁ" এই অক্ষরটিকে বেছে নিয়েছিলেন। বেদ ও উপনিষদের কোন কোন মন্ত্রে এই একাক্ষরকেই ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্ম বলা হয়েছে।

দুঃখের বিষয় কলি যুগের পুরাণ ও ভাগবত-বেত্তা পন্ডিতেরা এই একাক্ষরের মধ্যে (ওঁ-ওং বা ওম্) অ, উ এবং ম এই তিনটি অক্ষর আবিষ্কার করেন এবং সাব্যস্থ করেন যে এই তিন অক্ষরের মূলে যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর বা মহাদেব এই তিন জন দেবতার অস্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। অন্য কথায় তাদের বিবেচনায় এই তিনটি অক্ষর হল—উল্লিখিত তিনটি দেবতার প্রতীক বা মূল-মন্ত্র। বলা বাহুল্য, এই ভাবে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। পরবর্তী সময় থেকে এই তিন দেবতাকে যথাক্রমে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা রূপে এক একজন স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সার্বভৌম ঈশ্বর রূপে কল্পনা করা হতে থাকে।

এর পরে এই কল্পিত তিনজন স্বতন্ত্র, স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সার্বভৌম ঈশ্বরের জন্ম, জীবন যাপন, যোগ্যতা, ক্ষমতা, অধিকার, প্রভাব প্রতিপত্তি এবং শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এক বা একাধিক পুরাণ রচিত হতে থাকে।

এই রচনাকারীদিগের যিনি যে দেবতার ভক্ত তিনি সেই দেবতাকে সর্ব-শ্রেষ্ঠ এবং অন্য দু'জনকে তুলনামূলক ভাবে নিকৃষ্ট এমন কি তাঁর অধীন ও আজ্ঞাবহ প্রতিপন্ন করার জন্য নানা ধরনের অদ্ভুত, অযৌক্তিক, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কল্প-কাহিনী রচনা করতঃ নিজ নিজ পুরাণের অঙ্গীভূত করতে থাকেন। এমন কি কোন কোন পুরাণের রচয়িতা এই তিন দেবতাকে একে অন্য জনের শত্রু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে প্রতিপন্ন করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি।

এ সম্পর্কে বহু উদাহরণই তুলে ধরা যেতে পারে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তার অবকাশ না থাকায় মাত্র কয়েকটি উদাহরণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে। এই দেবতাত্রয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতা সম্পর্কীয় একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক হলঃ

বিষ্ণু দর্শন মাত্রেণ শিব দ্রোহং প্রজায়তে
শিব দ্রোহ নঃ সন্দেহ রৌরবং যাস্তি দারুণম্।

—ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

অর্থাৎ—বিষ্ণুকে দেখামাত্রই শিব ক্রোধান্বিত বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। শিবের ক্রোধ উৎপাদনকারী (বিষ্ণু ও শিবের মূর্তিকে একই স্থান বা মন্দিরে স্থাপনকারী) যে দারুন রৌরব নামক নরকে গমন করবে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই।

এই তিন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কীয় কতিপয় উপাখ্যানের সার-সংক্ষেপ হলঃ

o পৃথিবী জল-মগ্ন ছিল। অকস্মাৎ ভীষণ গর্জনে এক লিঙ্গ মূর্তি উর্ধে উত্থিত হয় এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে লক্ষ্য করতঃ উচ্চারিত হয়—"সৃষ্টিকর"।

গর্জন শ্রবনে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু হত-চকিত হন। উভয়ের মধ্যে কে সৃষ্টি কার্য সমাধা করবেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। সাব্যস্থ হয় যে, যিনি এই লিঙ্গ মূর্তির শেষ প্রান্তে উপনীত হতে পারবেন তিনিই সৃষ্টিকার্য সমাধা করবেন।

ব্রহ্মা হংস রূপে উর্ধদিকে এবং বিষ্ণু কূর্ম (কচ্ছপ) রূপে নিম্ন দিকে (জলের নীচে লিঙ্গের যে অংশ রয়েছে সেদিকে) চলতে শুরু করেন।

হংস রূপী ব্রহ্মা বহুকাল চলার পরেও লিঙ্গের প্রান্ত খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়েন। এমন সময়ে একটি গাভী এবং একটি কেতকী বৃক্ষকে তিনি নীচে নেমে আসতে দেখেন এবং প্রশ্ন করে জানতে পারবেন যে উভয়েই লিঙ্গের

প্রান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করতঃ ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। কেননা এ লিঙ্গ অনন্ত সুতরাং তার কোন প্রান্তেই উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।

ভগবান ব্রহ্মা এটাকে বিষ্ণুর উপরে জয়লাভের একটা বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং গাভী ও কেতকী বৃক্ষের কাছে বিষ্ণু সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করতঃ উভয়কে এই সাক্ষ্য প্রদানের জন্য চাপ দিতে থাকেন যে, "গাভী লিঙ্গের অগ্রভাগে দুগ্ধ এবং কেতকী বৃক্ষ ফুল বর্ষণ করছিলো; তারা উভয়ে ব্রহ্মাকে লিঙ্গের মস্তক সমীপে উপনীত হতে দেখেছে।"

উভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হয়ে উভয়কে অভিশাপে ভস্মীভূত করতে উদ্যত হন। অগত্যা তাদিগকে ব্রহ্মার প্রস্তাবে রাজী হতে হয়।

জল সমীপে নেমে গিয়ে কূর্মরূপী বিষ্ণুর সাথে সাক্ষাৎকার ঘটে; তিনি অকপটে নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেন। পক্ষান্তরে ব্রহ্মা নিজের সাফল্যের দাবী করেন এবং গাভী ও কেতকী বৃক্ষকে সাক্ষ্য প্রদানের নির্দেশ দেন।

উভয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার সাথে সাথে ভীষণ গর্জন সহকারে লিঙ্গের উক্তি শুনতে পাওয়া যায়ঃ "তোমরা উভয়েই মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য পাতকী এবং অভিশপ্ত হয়েছ। আজ থেকে আর কোন দিন কেতকী বৃক্ষের ফুল কোন দেব-দেবীর পূজায় ব্যবহৃত হবে না এবং গভীর পূজা করতে গিয়ে তার মুখের পরিবর্তে পশ্চাৎ ভাগের পূজা করতে হবে।"

—কালিকা পুরাণ দ্রষ্টব্য

ঘটনার বিবরণে প্রকাশঃ অতঃপর ভগবান ব্রহ্মাই সৃষ্টিকার্য সমাধা করার জন্য লিঙ্গ কর্তৃক আদিষ্ট হন। কিন্তু মিথ্যা কথা বলা এবং গাভী ও কেতকী বৃক্ষকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানে বাধ্য করার জন্য ব্রহ্মার কোন শাস্তি হয়েছিল কিনা ঘটনার বিবরণে বা অন্যত্র তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে বেচারা গাভী এবং কেতকী বৃক্ষ সেই থেকে অদ্যাপি শাস্তি ভোগ করে চলেছে। এবং হয়তো চিরকালই শাস্তি তারা ভোগ করতে থাকবে। উল্লেখ্যঃ লিঙ্গের সেই নির্দেশানুযায়ী হিন্দু সমাজ অদ্যাপি কোন পূজায় কেতকী ফুল ব্যবহার করেন না এবং গাভীর সম্মুখ ভাগের পরিবর্তে পশ্চাৎ ভাগের পূজাই করে চলেছেন।

বলা বাহুল্য, এতদ্বারা লিঙ্গ (শিব বা সংহার কর্তা মহাদেবের লিঙ্গ) অর্থাৎ

শিব বা মহাদেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে নিকৃষ্ট ও মহাদেব বা লিঙ্গের আজ্ঞাবহ প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

০ ভগবান নারায়ণ বা বিষ্ণু অনন্ত জলরাশীতে শায়িত ছিলেন। তিনি সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন। ফলে তাঁর নাভীমূল থেকে এক পদ্ম উত্থিত হয় এবং সেই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হয়। নারায়ণের কর্ণমূল থেকে মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যের উদ্ভব ঘটে, তারা ভগবান ব্রহ্মাকে আহার্য মনে করতঃ ভক্ষণ করার জন্য আক্রমণ করে। অনন্যোপায় হয়ে ব্রহ্মা আত্মরক্ষার জন্য বিষ্ণুর সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়না। ব্রহ্মা ধ্যানস্থ হয়ে জানতে পারেন যে বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন। অগত্যা তিনি নিদ্রা দেবীর স্তব করতে থাকেন। এক হাজার বৎসর স্তব করার পরে নিদ্রাদেবী তুষ্ট হয়ে বিষ্ণুর চক্ষু হতে সরে যান, বিষ্ণু জাগ্রত হন এবং ব্রহ্মাকে রক্ষা করেন। পরে বিষ্ণুর আদেশে ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য সমাধা করেন।

—শ্রীশ্রী চন্ডী ৮৬ পৃঃ এবং বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য।

বলাবাহুল্য, এখানে বিষ্ণুকে প্রাধান্য দিয়ে ব্রহ্মাকে তার সৃষ্ট ও আজ্ঞাবহ বানানো হয়েছে।

০ ক) ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টিকর্তা, তিনি নিজ দেহকে নর ও নারী এই দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং উক্ত নারীর নাম রাখেন সাবিত্রী বা গায়ত্রী। ব্রহ্মার দেহ থেকে উৎপন্ন বিধায় সাবিত্রী ব্রহ্মার কন্যা, (ততঃ স্বদেহ সম্ভূতা মাত্মজা মিত্যকল্পয়ৎ-বায়ুপুরাণ) অন্য রমণীর অভাব হেতু ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সাবিত্রীর সাথে মিলিত হন। ফলে সাবিত্রী গর্ভবতী হন। একশত বৎসর গর্ভের যাতনা ভোগ করার পরে সাবিত্রী চারিবেদ, নিখিল শাস্ত্র, যক্ষ, দৈত্য, দানব, জীব, জড় প্রভৃতি সব কিছু প্রসব করেন।

—বায়ু পুরাণ

খ) প্রলয়ের শেষে ভগবানের ইচ্ছা হইলে প্রলয়ের অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং কারণবারিতে সৃষ্টিবীজ নিক্ষিপ্ত হইয়া সুবর্ণময় অন্ডের উৎপত্তি হয়। ঐ অন্ড বিভক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং তাহার ভিতর হইতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হন। সাবিত্রী তাঁহার পত্নী এবং দেবসেনা ও দৈত্য সেনা তাঁহার কন্যা।

মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ট, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ

এই দশজন তাঁহার মানস পুত্র। ইঁহারা সৃষ্টি কার্যের জন্য আদিষ্ট হন। নারদ এ কাজে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন; ফলে অভিশাপ প্রাপ্ত হন।[১]

বলা বাহুল্য, এতদ্বারা ব্রহ্মাকেই সর্বমূলাধার হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ নিয়ে অধিক আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে তিন ভাগে ভাগ করা, সেই তিন ভাগকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে তিনজন স্বতন্ত্র ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ঈশ্বর এবং যথাক্রমে সৃষ্টি, প্রতিপালন ও সংহারের সর্বময় কর্তা সাব্যস্ত করণ, এই তিন-জনের মধ্যে কর্তৃত্ব ও অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব কলহের বহু সংখ্যক অবিশ্বাস্য কল্প-কাহিনীতে পুরাণ নামক গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে।

শুধু তা-ই নয়—এই তথাকথিত দেবতা ত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন ভক্ত ও উপাসকেরা ভক্তির সীমাহীন উচ্ছাস বুকে নিয়ে লীলা কাহিনীর নামে এদের সম্পর্কে যে সব মহাপুণ্যজনক কল্প কাহিনী রচনা করেছেন তদ্দ্বারা প্রকৃত পক্ষে এদেরকে লম্পট, চোর, প্রতারক, মদ্যপ, লজ্জাহীন প্রভৃতি বানানো হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ অতীব দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে ব্রহ্মা কর্তৃক দুর্গার সর্বাঙ্গ দর্শন, বীর্যস্খলন এবং বালখিল্য মুনিদিগের উদ্ভব; বিষ্ণু কর্তৃক শঙ্খ-চুরের স্ত্রী তুলসীর সতীত্ব হরণ ও অভিশাপে শিলায় পরিণত হওয়া; মহা-দেব কর্তৃক গাঁজা ভাং সেবন, উলঙ্গ নৃত্য, প্রস্রাব করতঃ শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দেয়া, ঋষি পত্নীদিগের সাথে ব্যাভিচার করার জন্য লিঙ্গস্খলিত হওয়া প্রভৃতির কথা তুলে ধরতে হয়। পুরাণের পাঠক মাত্রেরই এসব কাহিনী জানা রয়েছে, সুতরাং অধিক উদাহরণ তুলে ধরার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনা।

পরিশেষে অতীব দুঃখ, অপরিসীম লজ্জা এবং নিদারুণ ক্ষোভের সাথে এটুকু বলেই ইতি টানছি যে উপরোক্ত ভক্তবৃন্দ এখানে এসেই থেমে যাননি বরং ভক্তির সীমাহীন উচ্ছাসে দিক-বেদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে শিবের লিঙ্গ, শিব পত্নী দুর্গার স্ত্রীঅঙ্গ, বিষ্ণুর অভিশপ্ত শিলা মূর্তি (শালগ্রাম শিলা), পুরাণের বর্ণনায় মিথ্যাবাদী ব্রহ্মার চারিটি মুখ প্রভৃতির মূর্তি নির্মাণ এবং উপাস্য জ্ঞানে পূজার্চনার প্রথাও চালু করে দিয়েছেন।

---

১. ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ ও আশুতোষ দেব-এর নূতন বাঙ্গালা অভিধান ১২৪২ পৃঃ ব্রহ্মা শব্দ দ্রষ্টব্য।

এখানে আর একটি কথা না বলা হলে প্রসঙ্গের অঙ্গহানি হবে বিধায় অগত্যা বলতে হচ্ছে যে, পরম ব্রহ্মের প্রণব একাক্ষর বা ওঁ-এর মধ্যে "অ" "উ" এবং "ম" এই তিনটি অক্ষর থাকা এবং তিন অক্ষরে তিন দেবতার কল্পনা যাঁরা করেন তাঁরা প্রয়োজন বোধে এই তিন দেবতাকে একত্রিভুত করতঃ এক অখণ্ড ব্রহ্মের অস্তিত্বের কথাও বলেন। অর্থাৎ তিন-এ এক এবং এক-এ তিন এই ত্রিত্ববাদের থিওরীতেও তাঁরা বিশ্বাস থাকার দাবী করেন।

কথাটিকে এভাবেও বলা যায়ঃ 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনে মিলে একেশ্বর"। এই থিওরী বাস্তব সম্মত কি না প্রিয় পাঠক বর্গের উপরেই তা নির্ধারণের দায়ীত্ব ছেড়ে দিচ্ছি।

তবে মজার ব্যাপার হল—তাঁদের কথিত এই তিন ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির মূর্তি নির্মাণ এবং ভোগ নৈবেদ্য দিয়ে পূজার্চনার বিধান চালু থাকলেও অদ্যাপি আসল ব্রহ্মের কোন মূর্তি নির্মিত হয়নি—ভোগ নৈবেদ্য দিয়ে তাঁর পূজাও করা হয়নি। তাঁর মূর্তি বা অবয়ব কিরূপ অথবা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও কোন অভিমত দেখতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্ম-ভক্তদিগের মধ্যে এমন একটি শ্রেণীও রয়েছেন—যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ব্রহ্ম অসীম এবং অনন্ত বিধায় তাঁর কোন মূর্তি বা প্রতিমা নির্মাণ সম্ভব হতে পারেনা এবং কোন অবস্থায়ই তিনি ভোগ-নৈবেদ্যের প্রত্যাশীও হতে পারেন না। এই ধারণা বিশ্বাস থাকার কারণে তাঁরা ব্রহ্ম-পূজার পরি-বর্তে ব্রহ্মের ধ্যান করে থাকেন। প্রত্যহ ত্রি-সন্ধ্যার সময়ে গায়ত্রী জপ করতঃ এই ধ্যান করতে হয়।

উল্লেখ্যঃ গায়ত্রী-মন্ত্রে বলা হয়েছে — ব্রহ্ম সূর্যমন্ডলের মধ্যবর্তী স্থানে বিদ্যমান রয়েছেন তাঁর ভর্গ বা তেজকে ধ্যান করতে হবে।

অথচ দুর্ভাগ্য বশতঃ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-ভাষ্যকারী পণ্ডিতগণ এখানেও সেই ত্রিত্ববাদের ধারণাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ধ্যানের নিয়ম বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁরা শাস্ত্রের ভাষায় বলেছেনঃ

ক) প্রাতঃ কালে ব্রহ্মের ধ্যান করতে গিয়ে লাভিদেশ রক্তবর্ণ, চতুর্মুখ, দ্বিভুজ-একহস্তে অক্ষসূত্র (রুদ্রাক্ষের মালা) এবং অপর হস্তে কমণ্ডলু ধারী হংসারূঢ় ভগবান ব্রহ্মা (সূর্যমন্ডলের মধ্যবর্তীস্থানে বিদ্যমান রয়েছেন)-র ধ্যান করতে হবে।

খ) অনুরূপ ভাবে দু-প্রহরে : হৃদয় নীলোৎপল কান্তি সদৃশ্য চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী গরুড়ারূঢ় ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করতে হবে।

গ) সায়াহ্নে : ললাটে-শ্বেতবর্ণ, দ্বিভুজ, ত্রিশূল ডমরু ধারী; অর্ধচন্দ্র-বিভূষিত, ত্রিনয়ন, বৃষভারূঢ় ভগবান মহাদেবের ধ্যান করতে হবে।

কোথায় এক, অদ্বিতীয় ও সর্বময় ব্রহ্ম তেজ-এর ধ্যান আর কোথায় ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির, ভিন্ন ভিন্ন-অস্ত্র শস্ত্র ধারী এবং ভিন্ন ভিন্ন-বাহনে উপবিষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের ধ্যান !

মোট কথা, ভক্তির সীমাহীন উচ্ছ্বাস ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-গবেষণা, স্তব-স্তুতি, পূজা-উপাসনা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্রিত্ববাদের এমনই এক-হট্টগোল সৃষ্টি করেছে যে, আসল ব্রহ্ম তো বটেই এমন কি তাঁর নামটি পর্যন্ত সেই হট্টগোলের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে।

সত্য, ত্রেতা-ও দ্বাপর যুগের ব্রহ্ম-চিন্তাকে কলিযুগে কোন্ পর্যায়ে টেনে নামানো হয়েছে এবং কলিযুগে পাপ ষোলকলায়-পরিপূর্ণ হওয়ার এটাই অন্যতম প্রধান কারণ কিনা শুধু সে কথাটি তলিয়ে দেখার জন্য প্রিয় পাঠক-বর্গকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে প্রসঙ্গান্তরে গমন করছি।

দেবদেবীদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি নিয়ে বেদের মোট- তেত্রিশ দেবতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কলিযুগে তেত্রিশ-কোটিতে-উন্নীত-হয়েছে। অথচ সব-গুলি পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতির কুত্রাপি এই তেত্রিশ কোটির নাম এবং পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায় না। সূর্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতা সহ ওসব গ্রন্থে যে সব দেবতা বা দেব-দেবীর নাম পরিচয় পাওয়া যায় তাদের সংখ্যা চার শতের অধিক নয়। এই চার শতের মধ্যে ইঁদুর, পেঁচা, গাধা, গরু, কুকুর, শৃগাল প্রভৃতিও রয়েছে।

দেবতা মাত্রই হিন্দু সমাজের দৃষ্টিতে নমস্য এবং শ্রদ্ধার পাত্র। নমস্কার, শ্রদ্ধা প্রবং যথা বিহিত-ভোগ ও পূজা না পেলে এরা ক্রোধান্বিত হন এবং অভিশাপ প্রদান করেন বলে প্রকাশ। সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তাঁদের অভিশাপে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, রাজ্যহারা, সর্বহারা, জন্তু-জানোয়ার, পোকা-মাকড়, ক্লীব, চন্ডাল প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছেন এমন বহু মানুষের উপাখ্যান পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে।

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন দেখা দেয় : এই তেত্রিশ কোটি দেবতার চার শত বাদে বাকী বত্রিশ কোটি নিরানব্বই লক্ষ, নিরানব্বই হাজার ছয় শত দেবতা

যাদের নাম পরিচয় জানা যায় না এবং পূজার্চনা করা হয় না তাদের ক্রোধ উপশমের উপায় কি ? তা ছাড়া এটা কি তাদের প্রতি চরম উপেক্ষা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন নয় ?

এসব নাম পরিচয় হীন দেবদেবীদিগের কথা ছেড়ে যাদের নাম পরিচয় পাওয়া যায় তাদের কথায় আসা যাক। এই চার শত দেবদেবীর মধ্যে যাদের পূজার্চনা করা হয় তাদের সংখ্যা দু'শতের উর্ধে নয়। আবার এই দু'শত জনেরও মাত্র কয়েক জনেরই দৈনন্দিন পূজার বিধান রয়েছে। বাদ-বাকীদিগের বৎসরে মাত্র একবারই পূজা হয়ে থাকে। বৎসরে গড়ে দশ হাজার পরিবারের মধ্যে একটি পূজাও অনুষ্ঠিত হয় কি না সে কথা বলা কঠিন। তার পরেও সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুগণ সকল দেবতার পূজা করেন না। অনেক ক্ষেত্রেই সম্প্রদায় ভিন্ন হলে দেবতাও ভিন্ন হয়ে থাকে। এক সম্প্রদায়ের দেবতাকে পূজা তো দূরের কথা দর্শন করাও যে অন্য সম্প্রদায়ের জন্য নিষিদ্ধ এবং মহা পাপ-জনক এমন প্রমাণও যথেষ্টই রয়েছে।

এমতাবস্থায় পুরাণের উপাখ্যান সত্য হলে যে সব দেবতার নাম পরিচয় জানা বা পূজার্চনা করা হয় না তাদের ক্রোধ এবং অভিশাপে গোটা হিন্দু সমাজই এতদিনে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। অন্ততঃ যারা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতা অর্থাৎ দেব মূর্তিকে দর্শন করাও পাপজনক মনে করেন তাদের তো ক্লীব, চন্ডাল, অন্ধ, খঞ্জ, রাজ্যহারা পোকা-মাকড় প্রভৃতিতে পরিণত হতে হতে এতদিনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াই ছিল সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

এই পটভূমিকার পরে এবারে আসুন দেব-দেবীদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, এই সব দেবদেবী সৃষ্টির পশ্চাতে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেচনা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব বিদ্যমান নেই—শুধু ভক্তির সীমাহীন উচ্ছ্বাসেই গোটা সমাজ দিশাহারা হয়ে ছুটে চলেছে।

বেদ এবং উপনিষদের দেবতাদিগের নাম পরিচয় যথা স্থানে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এখানে শুধু পুরাণের দেবতা (দেব-দেবী) দিগের প্রসিদ্ধ কতিপয়ের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে তুলে ধরা হবে।

উগ্রচন্ডা : তাঁহার অষ্টাদশ ভুজ বা বাহু। সতী এই মূর্তি ধারণ করতঃ দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করেন। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে তিনি হিন্দুর গৃহে আবির্ভূতা ও পূজিতা হন।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান।

উগ্রতারা ঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুর দ্বয় দেবতাদিগের উপরে অত্যাচার শুরু করিলে দেবতাগণ মতঙ্গ মুণির আশ্রমে সমবেত হয়ে ভগবতীর আরাধনা করিলে তিনি মতঙ্গ মুণির স্ত্রী মাতঙ্গীর রূপ ধারণ করতঃ উত্থিত হন এবং অসুর দ্বয়কে ধ্বংস করেন। ঋষিগণ এই মূর্তিকে উগ্রতারা নাম দিয়েছেন। মাতঙ্গী (মতঙ্গ মুণির স্ত্রী)-র শরীর হইতে উৎপন্ন বিধায় ভগবতীর এই মাতঙ্গী নাম হইয়াছে।

—ঐ

উমা ঃ অপর নাম পার্বতী। হিমালয় পর্বতের কন্যা, মাতার নাম মেনকা। পূর্বজন্মে তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা ছিলেন। দক্ষের মুখে পতি নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন এবং পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

—ঐ

কাত্যায়নী ঃ মহিষা সুরের আক্রমনে বিপন্ন দেবগণ হরিহরের শরনাপন্ন হইলে তাহাদের মুখ মন্ডল হইতে উগ্র তেজ বাহির হইয়া আসে। সেই তেজ এক কন্যার আকার ধারণ করিয়া কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে পালিতা হন। সেই কারণে তাঁর নাম হয়—"কাত্যায়নী"

—রামায়ণ।

কালী ঃ শুম্ভ-নিশুম্ভ যুদ্ধে দুর্গাদেবীর ললাট হইতে উৎপন্ন হন। তিনি রক্তবীজ দৈত্যের রক্ত পান করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। কালী দুর্গার অর্ধাংশ স্বরূপা। সর্বদা কৃষ্ণের ভাবনায় জন্য তিনি কৃষ্ণ বর্ণা হইয়াছেন।

—দেবী ভাগবত।

দক্ষ-যজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে শিবের নিঃশ্বাস বায়ু হইতে কালীর উদ্ভব হয়।

—স্কন্দ পুরাণ

চন্ডী ঃ দুর্গার অপর নাম, রূপও ভিন্ন। শুম্ভাসুরের সেনানী চন্ড ও মুন্ডকে বধ করতঃ তিনি এই নাম প্রাপ্ত হন।

—মার্কন্ডেয় পুরাণ।

চন্দ্র ঃ ১। ব্রহ্মার পৌত্র, অত্রির পুত্র। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে চন্দ্র হরণ করেছিলেন। তার গর্ভে চন্দ্রের ঔরসে বুধের জন্ম হয়।

—বিষ্ণু পুরাণ।

দক্ষ প্রজাপতির সাতাশ জন কন্যাকে চন্দ্র বিবাহ করেন। তার মধ্যে তিনি রোহিনীর প্রতি বেশী আসক্ত ছিলেন বিধায় অপর কন্যাগণ পিতার নিকট অভিযোগ করে। দক্ষ চন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, তিনি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হবেন।

—ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

পরে সকল পত্নীর সাথে সমান যত্ন দেখানোর ফলে ঐ ক্ষয়-প্রাপ্তি পক্ষকাল ব্যাপী হয় (পদ্ম পুরাণ)। সেই দিন থেকে চন্দ্রের এক পক্ষে ক্ষয় এবং অপর পক্ষে বৃদ্ধি হতে থাকে।

২। সমুদ্র-মন্থন কালে চন্দ্রের উদ্ভব হয়।

—আশুতোষ দেবের "নূতন বাঙ্গালা অভিধান" ১১৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য

চামুন্ডা ঃ ১। শক্তির মূর্তি বিশেষ। মহিষাসুরের মন্ত্রী চন্ড ও মুন্ডকে বধ করতঃ তাদের মস্তকের মালা পরিধান করেন। এই জন্য তাঁর চামুন্ডা নাম হয়।

—রামায়ণ

২। মহিষাসুর দৈত্যকে বধ করার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মিলিত দৃষ্টি থেকে এক বৈষ্ণবী মূর্তির সৃষ্টি হয়। এই মূর্তি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। রৌদ্রী মূর্তি রুরু নামক দৈত্যকে বিনাশ করতঃ চামুন্ডা নামে খ্যাত হন।

— বরাহ পুরাণ

ছায়া ঃ সূর্যের পত্নী। সূর্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে নিজ দেহ থেকে ছায়াকে সৃষ্টি করেন এবং নিজে পিত্রালয়ে চলে যান।

ছায়া সূর্যের পত্নীরূপে অবস্থান করেন এবং সংজ্ঞার পুত্র যম প্রভৃতিকে লালন পালন করেন। নিজের গর্ভে শনি নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করলে তিনি সপত্নী পুত্রদিগকে অবহেলা করতে থাকেন। এতে যম ক্রুদ্ধ হয়ে ছায়াকে পদাঘাত করতে উদ্যত হয়। ছায়া "পদহীন হও" বলে অভিশাপ দিলে যম সূর্যের শরণাপন্ন হয়। তখন সকল কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সূর্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে যান।

—হরিবংশ

ছিন্নমস্তা : দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। নিজের মস্তক ছিন্ন করতঃ সেই মস্তককে তিনি বাম হাতে ধরে রাখেন এবং স্কন্ধ থেকে নির্গত রক্ত ধারা পান করেন।

—দেবী ভাগবত

জগদ্ধাত্রী : কোন এক সময়ে কতিপয় দেবতা নিজদিগকে ঈশ্বর বলে ধারণা করতে থাকেন। তখন ভগবতী দুর্গা জগদ্ধাত্রীর মূর্তি পরিগ্রহ করতঃ তাঁদের সম্মুখে আবির্ভূত হন। তিনি একখন্ড তৃণ স্থাপন করেন এবং প্রথমে বায়ুকে সেই তৃণ খন্ড উত্তোলিত করতে বলেন। বায়ু অর্থাৎ পবন দেব তা উত্তোলনে ব্যর্থ হন।

তখন অগ্নিদেবকে সেই তৃণ দগ্ধীভূত করতে বলা হয়। তিনিও ব্যর্থ হন। তখন উক্ত দেবগণ বুঝতে পারেন যে এই মূর্তিই পরমেশ্বরী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পরমেশ্বরী জ্ঞানে উক্ত মূর্তির পূজায় রত হন। জগদ্ধাত্রী দেবীর চারখানা হাত, তিনটি চক্ষু এবং তিনি সিংহবাহিনী।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান : ১৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জগন্নাথ : রাজা ইন্দ্র-দ্যুম্নের ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণ বেশী বিশ্বকর্মা শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মূর্তি নির্মাণ করতে থাকেন। বিশ্বকর্মা রাজাকে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করে ছিলেন যে যতদিন মূর্তিত্রয়ের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হয় ততদিন তিনি তা দর্শন করবেন না।

পঞ্চদশ দিবস অতীত হলে কৌতূহল বশতঃ রাজা বিশ্বকর্মার অজ্ঞাতে মূর্তি দর্শন করেন। রাজা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় বিশ্বকর্মা কাজ ছেড়ে চলে যান। তখনো মূর্তির হাত এবং পা নির্মিত হয়েছিল না। ব্রহ্মার আদেশে মূর্তিত্রয়কে ঐ অবস্থায়ই রাখা হয়।

ঐতিহাসিকদিগের অনেকের মতে জগন্নাথ বৌদ্ধ বিগ্রহ। মন্দির স্থিত শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মূর্তি বলে কথিত মূর্তিত্রয় যথাক্রমে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতীক। উল্লেখ্যঃ পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির অবস্থিত। প্রতি বৎসর তথায় এবং দেশের বহু স্থানেই রথ যাত্রার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

জনার্দন : ভগবান বিষ্ণুর অপর নাম। "জন" নামক দৈত্যকে সংহার করতঃ তিনি এই নাম গ্রহণ করেন।

জাহ্নবী : গঙ্গার অপর নাম। গঙ্গা জহ্নু মুনিকে পতিরূপে পেতে ইচ্ছা করেন। জহ্নুমুনি অসম্মত হলে গঙ্গা ক্রোধ বশতঃ মুনির তপোবন প্লাবিত করেন। গঙ্গার এই ব্যবহারে জহ্নুমুনি ক্রুদ্ধ হয়ে গঙ্গার সমস্ত জল পান করে ফেলেন। পরে দেবতাদের অনুরোধে তিনি গঙ্গাকে কর্ণ দ্বারা বের করে ফেলেন। মহর্ষিরা গঙ্গাকে জহ্নুর কন্যারূপে স্থির করেন। সেই থেকে গঙ্গার নাম হয় জাহ্নবী।

জ্বর : দৈত্যরাজ বাণের সেনাপতি, তার তিনটি মস্তক, নয়টি চক্ষু, ছয়খানি হস্ত ও তিনখানি পদ। শ্রীকৃষ্ণ বাণের হাত হতে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে গেলে তিনি তাঁকে আক্রমণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রবেশ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের দেহ মধ্যস্থ বৈষ্ণব জ্বর এই জ্বরকে পরাভূত করে; শ্রীকৃষ্ণ এই জ্বরকে হত্যা করতে উদ্যত হন; কিন্তু ব্রহ্মার অনুরোধে তাকে ছেড়ে দেন এবং ক্ষমা করেন।

—বিষ্ণু পুরাণ

তুলসী : রাধিকার সখী। রাধিকার শাপে তুলসী ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। শংখচূড় দৈত্যের সাথে তার বিবাহ হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তুলসীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং শংখচূড়ের রূপ ধারণ করতঃ তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করেন।

—ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

ত্রিপুরারি : মহাদেব। তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামক তিন জন অসুর দেবগণের উপরে অত্যাচার করায় মহাদেব তাদিগকে ধ্বংস করতঃ এই নাম গ্রহণ করেন।

ভাগবত

ত্রিশংকু : অযোধ্যার অধিপতি, সূর্যবংশীয় রাজা। বিশ্বামিত্রের সহায়তায় তিনি সশরীরে স্বর্গে গমন করলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে স্বর্গচ্যুত করেন। ত্রিশংকু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হলে বিশ্বামিত্র

দ্বিতীয় স্বর্গ সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হন। দেবগণ তখন স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যপথে ত্রিশঙ্কুর জন্য স্থান করে দেন।

ত্রিশিরা : ত্বষ্টানামীয় প্রজাপতির পুত্র। তিনি এক মুখে বেদ অধ্যয়ন, অন্য মুখে সুরা পান ও তৃতীয় মুখ দ্বারা সমুদয় পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত হন।

ইন্দ্রপদ লাভের জন্যও তিনি কঠোরভাবে তপস্যা করেন। তাঁর এই তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য ইন্দ্র কয়েকজন স্বর্গ বেশ্যাকে ত্রিশিরার নিকটে পাঠান। কিন্তু বেশ্যাগণ ব্যর্থ হয়। তখন ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ত্রিশিরাকে নিহত করেন এবং কুঠারাঘাতে তার তিনটি মস্তককে দেহচ্যুত করেন। তখন এই বিচ্ছিন্ন তিন মস্তক থেকে কপিঞ্জল, কলবিংক ও তিত্তির পক্ষীর উদ্ভব হয়।

—মহাভারত

দুর্গা : মহামায়া ভগবতী। তিনি দশভুজা বলে পুরাণে বর্ণিত রয়েছে। দশভুজে দশ প্রহরণ ধারণ করতঃ তিনি দুর্গাসুরকে বধ করেন বলে এই নাম প্রাপ্ত হন।

সুরথ রাজা সর্বপ্রথম এই দেবীর পূজা করেন বলে জানতে পারা যায়। স্কন্দ পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায়—ভগবান রামচন্দ্র রাবণ বধের নিমিত্ত শরৎকালে এই দেবীর অর্চনা করে ছিলেন। সেই থেকে শরৎকালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

দেবী ভাগবতের বর্ণনায় প্রকাশঃ রম্ভ নামক অসুরের পুত্র মহিষাসুর সুমেরু পর্বতে অযুত বর্ষকাল কঠোর তপস্যায় রত হয় এবং "পুরুষ জাতীয় কোন জীব মহিষাসুরকে বধ করতে পারবে না"—ব্রহ্মার নিকট থেকে এই বর লাভ করে। এই বর লাভের পরে সে ভীষণভাবে দুর্মদ হয়ে ওঠে এবং দেবতাদের স্বর্গ রাজ্য দখল করে নেয়।

অনন্যোপায় হয়ে দেবগণ সাহায্যের জন্য বিষ্ণু ও শিবের নিকটে সমবেত হন। তখন দেবতাদিগের তেজ থেকে দেবী ভগবতী (দুর্গা) উৎপন্ন হন এবং মহিষাসুরকে বধ করেন।

প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিকদিগের অনেকের অভিমত হলঃ অতীতের

কোন এক সময়ে এ দেশের বিশেষ একটি শ্রেণীর মানুষ বর্ষার পরে শরতের আগমনকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে উৎসবে মেতে উঠতো।

তাদের এই উৎসবের উপাদান ছিল কদলী, দাড়িমী, ধান্য, হরিদ্রা, কচু, মানকচু, বিল্ব, অশোক ও জয়ন্তী এই নয়টি গাছের পাতা। একে নব পত্রিকা বলা হত।

পরবর্তী সময়ে এই নব পত্রিকাকে দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গনেশ, সিংহ, মহিষ, অসুর ও কলাবউ-এর প্রতীক বলে কল্পনা করা হতে থাকে। কেউ কেউ "কলা বউ"কেও নব পত্রিকার প্রতীক বলে থাকেন।

রাজশাহীর তাহের পুরের রাজা কংশ নারায়ণের নির্দেশে উপরোক্ত নয়টি মূর্তি নির্মিত হয় এবং তিনিই সর্বপ্রথম মহাধুমধামের সাথে নব পত্রিকা সহ এই নয়টি মূর্তির পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন।

আজও বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুদিগের মধ্যে নব পত্রিকা সহ এই নয়টি মূর্তির পূজা প্রচলিত রয়েছে এবং আজও এই পূজা "শারদীয় উৎসব" বলে অভিহিত হয়ে চলেছে।

ধূমাবতী : দুর্গার অপর নাম। একবার পার্বতী (দুর্গার অপর নাম) শিবের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু খাদ্য দিতে শিবের বিলম্ব হয়। তখন পার্বতী শিবকেই ভক্ষণ করেন। ফলে তাঁর শরীর থেকে ধূম নির্গত হতে থাকে। সেই থেকে পার্বতীর নাম হয়–ধূমাবতী।

—বৃহদ্ধর্ম

নর-নারায়ণ : ১। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। ধর্মের-স্ত্রী মূর্তি থেকে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দুস্কর তপস্যা করেছিলেন।

—ভাগবত

শরভ (অষ্টপদ মৃগ অথবা হস্তি শাবক —লেখক) রূপধারী মহাদেবের দন্তাঘাতে বিষ্ণুর নরসিংহ মূর্তি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নর ও নারায়ন নামক ঋষিদ্বয়ের উদ্ভব হয়।

—কালিকা পুরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকেও নারায়ণ বলা হয়।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান ১২০২ পৃঃ দ্রঃ।

নর সিংহ ঃ বিষ্ণুর (চতুর্দশ) অবতার। হিরণ্য কশিপু নামক বিষ্ণুদ্বেষী দৈত্য ব্রহ্মার বর প্রভাবে নর এবং দেবগণের অবধ্য ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রহলাদ ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত।

বিষ্ণু-ভক্ত পুত্রকে বিনাশ করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পরে তিনি নিকটস্থ স্ফটিক স্তম্ভে বিষ্ণু আছেন কি না সে কথা জানতে চান। প্রহলাদ দৃঢ়তার সাথে উক্ত স্তম্ভে বিষ্ণুর অস্তিত্ব ঘোষণা করার সাথে সাথে হিরণ্য কশিপু দম্ভ সহকারে উক্ত স্তম্ভে পদাঘাত করেন। মুহূর্তে মধ্যে অর্ধনর ও অর্ধসিংহ রূপী বিষ্ণু স্তম্ভ থেকে বহির্গত হন এবং হিরণ্য কশিপুকে হত্যা করেন।

—দেবী ভাগবত।

পবন দেব ঃ বাতাসের অধিষ্ঠাতা দেবতা। দেবতাগণের মধ্যে তিনি প্রভূত শক্তিশালী। অঞ্জনার গর্ভে তাঁর পুত্র হনুমান। কুন্তীর গর্ভে তিনি ভীম নামক পুত্রের জন্মদান করেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম দিকের রাজা এবং উনপঞ্চাশ বায়ু তাঁর অধীন।

— রামায়ণ

পার্বতী ঃ দুর্গার অপর নাম। হিমালয় পর্বতের কন্যা হিসাবে তাঁর এই পার্বতী নাম হয়েছে।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান

মরুৎগণ ঃ কশ্যপ থেকে উৎপন্ন দেবগণ। কশ্যপ দক্ষ কন্যাদিগকে বিবাহ করেন। ভগিনী অদিতির পুত্র ইন্দ্রকে দর্শন করতঃ সেই রূপ বীর্যবান একটি পুত্র লাভের কামনা তাঁর মনে জাগে। স্বামী কশ্যপ এই কামনার কথা জানতে পেরে দিতির গর্ভাধান করেন এবং শুচি ভাবে থাকতে বলেন।

অদিতি দিতির এই গর্ভের কথা জানতে পেরে ঈর্ষান্বিতা হন এবং পুত্র ইন্দ্রকে উক্ত গর্ভ নষ্ট করার নির্দেশ দেন। ইন্দ্র দিতির অশুচি অবস্থার সুযোগ নিয়ে তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেন এবং বজ্র দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে সপ্ত খন্ডে বিভক্ত করেন।

বজ্র হত সন্তান রোদন করতে থাকে। ইন্দ্র তাকে বলেনঃ

মা রোদীঃ, মা রোদীঃ (রোদন করিও না)। এই কথা বলতে বলতে প্রতিটি খন্ডকে আবার সপ্ত খন্ডে বিভক্তি করেন। এই উনপঞ্চাশ খন্ডে বিভক্ত দিতির সন্তানগণই মরুৎগণ নামে পরিচিত ও সম্পূজিত হয়ে চলেছে।

— দেবী ভাগবত

মহাদেব ঃ সংহারকর্তা ভগবান। ব্যাঘ্র চর্ম পরিধান করেন। সর্প তাঁর উত্তরীয়, ভস্ম তাঁর বিভূতি, নন্দী তাঁর অনুচর। তাঁর অস্ত্র ত্রিশূল, ধনু, পিনাক। তাঁর পাশুপত নামক অস্ত্রও বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ।

ত্রিপুরাসুরকে বধ করার ফলে তাঁর অন্যতম নাম "ত্রিপুরারি"। সমুদ্র মন্থন কালে হলাহল উথিত হলে তিনি সেই হলাহল পান করেন। সেই হলাহল তাঁর কন্ঠে থেকে যায় বলে তাঁর একটি নাম নীলকন্ঠ।

অর্জুনের সাথে ব্যাধ বেশে তিনি যুদ্ধ করেন। দক্ষ রাজকন্যা সতী তাঁর পত্নীদিগের অন্যতমা। সতী দক্ষযজ্ঞে পতির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে প্রাণ ত্যাগ করলে মহাদেব বীর ভদ্র নামক অসুরের উৎপত্তি করতঃ তার দ্বারা শ্বশুর দক্ষকে নিহত করান এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে উন্মাদের মতো ভ্রমণ করতে থাকেন।

সৃষ্টি ধ্বংসের আশংকা দেখা দেয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে সম্মোহিত করেন। মহাদেব সতীর দেহ পরিত্যাগ করতঃ হিমালয়ে গমন করেন এবং তপস্যায় রত হন। এই সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্রের দ্বারা সতীর দেহকে একান্নটি খন্ডে বিভক্ত করেন। চক্রের ঘূর্ণনে খন্ডগুলি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয় ও সেই স্থানগুলি পীঠ বা তীর্থস্থানে পরিণত হয়। এই স্থানগুলি "একান্ন পীঠ" নামে প্রসিদ্ধ।

মহাদেব হিমালয়ে কঠোর তপস্যায় রত হওয়ার ফলে পুনরায় সৃষ্টি ধ্বংসের আশংকা দেখা দেয়। মদন তপস্যা ভঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে মহাদেবের ক্রোধে তাকে ভস্মীভূত হতে হয়। অতঃপর হিমালয় পর্বতের কন্যা পার্বতীর তপস্যায়

তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেন এবং পার্বতীকে বিবাহ করেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা গঙ্গাকেও তিনি বিবাহ করেন।

—দেবী ভগবত

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে মহাদেব শুধু একজন দেবতা-ই নয়—অন্যতম ভগবানও। তিনি সংহার কর্তা ভগবান। অতএব তাঁর পরিচয়ও বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সমূহকে তুলে ধরতে হলে বিরাট আকারের একখানা গ্রন্থ লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপাততঃ তা সম্ভব নয় বলে তাঁর এই বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে এখানে শুধু তাঁর পরিবার পরিজনদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়কে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে। অবশ্য প্রখ্যাত দেবতা এবং ভগবানদিগের প্রায় সকলেরই পরিবার পরিজন প্রভৃতি রয়েছেন। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্য এখানে শুধু মহাদেবের পরিবার পরিজনদিগেরই শাস্ত্র বর্ণিত পরিচয়কে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা যাচ্ছে।

মহাদেবের স্ত্রী, দুর্গা, কালী (শ্মসান কালী, ভদ্রকালী, রক্ষাকালী, শ্যামা ও চামুন্ডা) গঙ্গা, সতি, পার্বতী প্রভৃতি। তাঁর বাসস্থান—কৈলাশ পর্বত, শিবলোক, রজত গিরি, হিমালয়, বিল্ব ও বটবৃক্ষ প্রভৃতি।

তাঁর পুত্র কার্তিক এবং গণেশ; কন্যা লক্ষ্মী এবং সরস্বতী, দ্বার রক্ষক নন্দী, ভৃঙ্গী এবং মহাকাল; সহচর—ভূতপ্রেত প্রভৃতি; অস্ত্র—ত্রিশূল, বাহণ—ষাঁড়। প্রিয় খাদ্য—গাঁজা এবং ভাং। তাঁর পত্নীদিগের প্রায় সকলেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পৃথক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অতএব তাঁর পুত্র কন্যা প্রভৃতির পরিচয় নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে:

কার্তিক, কার্তিকেয়: শিব বা মহাদেবের পুত্র। মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে রমন কার্যে নিরত থাকার সময়ে হঠাৎ কতিপয় দেবতা তাঁহার নিকটে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠিয়া পড়েন। ফলে বীর্য মাটিতে পতীত হয়। পৃথিবী তাহা ধরিতে না পারিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি হইতে উহা শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। এই বীর্য হইতে কার্তিকের উৎপত্তি। এ সময়ে তাঁকে কৃত্তিকাগণ লালন পালন করেন। সেই কারণে তাঁর নাম হয়—কার্তিক বা কার্তিকেয়।

তারকাসুরকে বধ করার পরে তাঁর নাম হয়—তারকারি।

কার্তিক দেব-সেনাপতি। মহাভারত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, রামায়ণ, ভাগবত, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতিতে কার্তিকের জন্ম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান: ১১৩৯ পৃ:

গণেশ: ১। হর পার্বতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সর্বসিদ্ধি দাতা। মুষিক তাঁর বাহন। ব্যাসদেবের মহাভারত রচনায় তিনি লিপিকার ছিলেন। তাঁর মুখ গজাকৃতি হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন উপখ্যান প্রচলিত আছে। গণেশের জন্ম হলে সকল দেবতাই তাঁকে দেখতে আসেন। কিন্তু শনির দৃষ্টিপাত মাত্রই গণেশের মস্তক দেহ থেকে খসে পড়ে। তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে একটি গজমুন্ড কেটে এনে গণেশের স্কন্ধে যোজন করেন।

—ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

২। শিব ও পার্বতী গণেশকে দ্বারী (দরওয়াজার পাহাড়াদার) রেখে রমণ করতে ছিলেন। এমন সময়ে পরশুরাম এসে উপস্থিত হলে গণেশের সাথে তার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়।

—ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

৩। মহাদেবের হাসি থেকে এক কুমারের উদ্ভব হয়। ঐ কুমারের সৌন্দর্যে দেবগণ এবং উমাদেবীও মুগ্ধ হন। উমাদেবীকে মুগ্ধ হতে দেখে মহাদেব ভীষণ ভাবে ক্রুদ্ধ হন এবং কুমারকে অভিশাপ প্রদান করেন। ফলে তার মুখ মন্ডল হস্তি মুখে পরিণত হয়।

—বরাহ পুরাণ

লক্ষ্মী: ১। পিতা দক্ষ, মাতা প্রসূতি। প্রসূতির গর্ভে দক্ষের চব্বিশটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে ধর্ম বিবাহ করেন। খ্যাতি, সতি, সম্ভূতি প্রভৃতি একাদশ কন্যাকে যথাক্রমে ভৃগু, ভব, মরীচি, বহ্নি প্রভৃতি ও পিতৃগণ বিবাহ করেন। ধর্মের ঔরসে লক্ষ্মীর দর্প নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

—বিষ্ণু পুরাণ ১ / ৭ / ১৪-২৬;
পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খন্ড ৩ / ১৮৩;
গরুড় পুরাণ ৫/ ১৪-২৩

২। ভৃগু পত্নী খ্যাতির গর্ভে ধাতা-বিধাতা নামে দুই পুত্র এবং লক্ষ্মী নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। এই ভৃগু কন্যা লক্ষ্মী দেবদেব নারায়ণকে পতি রূপে গ্রহণ করেন।

—বিষ্ণু পুরাণ ১ / ৮ / ১৩ ;
বায়ু পুরাণ ২৯ / ১-৩ ;
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ২৯ / ১-৪ ;
কূর্ম পুরাণ, পূর্বভাগ ১৩ / ১

(লক্ষ্যণীয় যে, একই বিষ্ণু পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে লক্ষ্মীকে দক্ষের কন্যা এবং ধর্মের পত্নী বলা হয়েছে। আবার পরবর্তী ৮ম অধ্যায়ে তাঁকে ভৃগুর কন্যা এবং নারায়ণের পত্নী বলা হয়েছে। — লেখক)

৩। লক্ষ্মীর গর্ভে নারায়ণের বল ও উৎসাহ নামক দুই পুত্র জন্মে। যাঁরা স্বর্গচারী ও যাঁরা পুণ্য কর্মা ও দেবগণের বিমান বহণকারী তাঁরা সকলেই এই লক্ষ্মী বা শ্রী দেবীর মানস পুত্র।

—বায়ু পুরাণ

৪। লক্ষ্মী দত্তাত্রেয় ঋষির পত্নী। অসুরগণ কর্তৃক লাঞ্ছিত দেবগণ ঋষি দত্তাত্রেয়ের শরণাপন্ন হন এবং লক্ষ্মীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে মস্তকে ধারণ করেন। এই মস্তকে ধারণ করার ফলেই তারা অসুর দিগের উপরে বিজয় লাভ করেন।

— মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৮-১৯ অধ্যায়

৫। লক্ষ্মী সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তিনি বিষ্ণুর পত্নী। পিতা মহর্ষী ভৃগু, মাতা খ্যাতি। দুর্বাসার অভিশাপে ত্রিলোক শ্রীহীন হলে তিনি সমুদ্রে নিমজ্জিতা হন এবং পরে সমুদ্র মন্থনে উত্থিতা হন।

৬। নারদীয়, ধর্ম এবং কূর্ম পুরাণের মতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী শিব-দুর্গার কন্যা। বাংলাদেশে শরৎকালীন দুর্গা পূজার শিব-দুর্গার কন্যা হিসাবেই এঁদের পূজা করা হয়।

সমুদ্র মন্থন সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ রয়েছে; তন্মধ্যে অধিকাংশের সমর্থিত বিবরণটি হলো :

দুর্বাসা মুণি ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হন এবং অভিশাপ প্রদান করেন। ফলে ইন্দ্র সহ সকল দেবতা এবং গোটা ত্রিভুবন শ্রী বা লক্ষ্মীহীন হয়ে নিশ্চিত ধ্বংসকে অনিবার্য করে তোলে। সুযোগ বুঝে দৈত্যগণ দেবতাদিগকে আক্রমণ করে। দেবগণ পরাস্ত এবং স্বর্গচ্যুত হয়।

ব্রহ্মা বিপন্ন দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণের কাছে গেলে তিনি সাহায্যের আশ্বাস প্রদান করেন। এজন্যে সমুদ্র গর্ভ থেকে লক্ষ্মীর উদ্ধার এবং অমৃত আহরণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

কিন্তু শ্রীহীন দেবতাগণের একক প্রচেষ্টায় এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাই নারায়ণ সুকৌশলে দৈত্যগণকেও এ কাজে নিয়োজিত করেন।

সমুদ্র মন্থনের জন্য মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং সর্পরাজ বাসুকিকে রজ্জু হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নারায়ণের চাতুর্যপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে দেবগণ বাসুকির পুচ্ছ ভাগে এবং দৈত্যগণ সম্মুখ ভাগে স্থান লাভ করে। ফলে বাসুকির নিঃশ্বাস প্রভাবে দৈত্যগণ হতশ্রী ও দুর্বল হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে দেবগণ শক্তিশালী হতে থাকেন।

মন্থনকালে বাসুকির মুখ থেকে অমৃত নিসৃত হতে থাকলে ধন্বন্তরী তা স্বীয় কমণ্ডলুতে ধারণ করেন এবং উক্ত কমণ্ডলু সহ মন্থনদণ্ড সমীপে আগমণ করেন।

দৈত্যগণ বলপূর্বক কমণ্ডলুটি কেড়ে নেয়। অতঃপর অমৃত পানে দৈত্যগণ অমর এবং অজেয় হয়ে উঠবে একথা চিন্তা করে দেবগণ ভীষণভাবে হতাশা গ্রস্থ ও বেদনার্ত হয়ে পড়েন।

এই অবস্থায় নারায়ণ এক মোহিনী নারীর মূর্তি ধারণ করতঃ ছুটতে থাকেন; দৈত্যগণ মোহাবিষ্ট হয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। সুযোগ বুঝে নারীরূপী নারায়ণ অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলুটি হস্তগত করতঃ দেবতাদিগের মধ্যে পাচার করেন।

ইতিমধ্যে সমুদ্র (ক্ষীরোদ সাগর) গর্ভ থেকে লক্ষ্মীকে উদ্ধার করা হয়। তিনি নারয়ণের স্ত্রীরূপে তাঁর বক্ষ স্থলে স্থান লাভ করেন, ইত্যাদি।

— পদ্ম পুরাণ ৪র্থ অঃ ২৮-৩০ পৃঃ

নন্দী : শিবের প্রধান অনুচর ও দ্বারপাল। শালংকায়ন মুনির দক্ষিণ অঙ্গ থেকে তিনি উৎপন্ন হন। দধীচি মুণি তাঁর গুরু। দক্ষযজ্ঞ কালে শিবনিন্দা করে তাঁরই অভিশাপে দক্ষ ছাগবদন হন। গুরুর বরে তিনি শিবের পার্শ্বচর রূপে গৃহীত হন।

—স্কন্দ ও কূর্ম পুরাণ

ভৃঙ্গী ও মহাকাল : ভৃঙ্গী এবং মহাকালকে দ্বার রক্ষার দায়ীত্বে রেখে হর এবং পার্বতী (মহাদেব এবং দুর্গা—লেখক) রমণ কার্য শুরু করেন। রমণ শেষে রমণাসক্ত অবস্থাই স্খলিত বস্ত্র হস্তে ধারণ করতঃ পার্বতী হঠাৎ বাইরে আসেন, ফলে দ্বার রক্ষক ভৃঙ্গী ও মহাকালের নযরে পড়ে যান এবং অভিশাপ দেন যে, তারা উভয়ে বানরের মুখাকৃতি নিয়ে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে।

—কালিকা পুরাণ

মনসা : ১। কশ্যপ মুণির মানসী কন্যা। বাসুকীর ভগিনীও অস্তিকের মাতা। তিনি মনুষ্যগণের মনে ক্রীড়া করেন বলে তাঁর নাম মনসা দেবী।

—মহাভারত

জরৎকারু মুণির ন্যায় তাঁর দেহ ক্ষীণ ছিল বিধায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নাম রাখেন জরৎকারু। তিনি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগগণের জীবন রক্ষা করেছিলেন বলে তিনি নাগেশ্বরী নামেও পরিচিতা।

—দেবী ভাগবত

২। মনসার অপর নাম জরৎকারু। জরৎকারু নামে এক মুণিও ছিলেন। তিনি মনসাকে বিবাহ করেন।

—মহাভারত

যম : ধর্মরাজ। পিতা সূর্য, মাতা সংজ্ঞা। তিনি দক্ষিণ দিকের অধিপতি। তিনি জীবের পাপ পুণ্যের ফল দানকারী। তাঁর বাহণ মহিষ; অস্ত্র—দন্ড বা গদা।

তিনি বিদুর রূপে (অম্বালিকার দাসীর গর্ভে বেদব্যাস মুণির ঔরসে) জন্ম গ্রহণ করেন। দক্ষ প্রজাপতির শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, মূর্তি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন এবং তাদের গর্ভে তাঁর সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব, নর ও নারায়ণ এই কয়টি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। কুন্তীর গর্ভে তিনি যুধিষ্ঠিরের জন্মদান করেন।

—আশুতোষ দেবের নূতন বাঙ্গালা অভিধান : ১২৬৭ পৃঃ দ্রঃ

দেবদেবীদিগের পরিচিতির এই তালিকাকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। পূর্বেই বলা হায়েছে যে, দেবদেবীদিগের মোট সংখ্যা তেত্রিশ কোটি। তন্মধ্যে

প্রায় তিন শতের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এই তিন শতের মধ্যে যাদের পূজার্চনা প্রচলিত রয়েছে তাদের সংখ্যা প্রায় একশত। সুতরাং এই পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচিতদিগের তো নয়-ই এমন কি সম্পূজিত প্রায় একশত দেবদেবীর পরিচয় তুলে ধরাও কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। যারা তাঁদের পরিচয় জানতে আগ্রহী তাঁদিগকে বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, দেবী ভাগবত, চন্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপরের এই কতিপয়ের পরিচিতি থেকেই সুস্পষ্ট রূপে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, মানুষের মতো দেবদেবীদিগের মধ্যেও আকৃতি-প্রকৃতি, জন্ম-জীবনযাত্রা, স্বভাব-চরিত্র, খাদ্যাখাদ্য প্রভৃতির দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী রয়েছে আলোচনার সুবিধার জন্যে শ্রেণী হিসেবে তাঁদের পরিচয়কে তুলে ধরা প্রয়োজন বিধায় পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থের বিবরণ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে তাঁদের শ্রেণী বিভাগ করা যাচ্ছে :

দেব দেবীদিগের শ্রেণী বিভাগ :

০ কাশীতে—বিশ্বনাথ, গয়ায়—গয়াসুর, বৈকুন্ঠে—শ্রীকৃষ্ণ, স্বর্গে দেবগণ, পাতালে—বাসুকী, ব্রজে—ব্রজের গোপাল, মথুরায়—রাধা-কৃষ্ণ, নাগলোকে—সর্পগণ কামাখ্যায়—সতীর সীতা (স্ত্রী অঙ্গ), জলে—বরুণ, বাতাসে—পবন দেব, কালী ঘাটে—কালী মাতা, পুরীতে—জগন্নাথ, বিল্ব বৃক্ষে—শিব-পার্বতী, বটগাছে—মহাদেব, অশ্বথ গাছে—দুর্গাদেবী, কদম গাছে—কৃষ্ণ ঠাকুর ইত্যাদি ; এঁরা স্থানীয় দেবতা।

০ **শ্রীকৃষ্ণ** - রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ছাড়াও ষোড়শ শত গোপীনীর সাথে প্রেম করেন, **মহাদেব**—সতীর সাথে প্রেম করতে গিয়ে পাগল হন, গঙ্গার সাথে প্রেম করে দুর্গার অভিশাপ ভোগ করেন, হিমালয় কন্যা পার্বতীর প্রেমে দিশাহারা হন, নারায়ণ তুলসীর সাথে প্রেম করে শীলায় পরিণত হন, **দেবরাজ ইন্দ্র**—অহল্যার সাথে প্রেম করার পরিণামে তাঁর সারা দেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটে, **শিব**—ঋষিপত্নীদিগের সাথে প্রেম করতে গিয়ে লিঙ্গপাত হয়, জগাই-মাধাই—কৃষ্ণ-প্রেমে সংসার ত্যাগী হন, **নিমাই**—হরি-প্রেমে বৈরাগ্য

বরণ করেন, **তিলোত্তমা-উর্বশী-মেনকা-রতি-রম্ভা**—প্রভৃতি স্বর্গ বেশ্যাগণ যত্র-তত্র প্রেম বিতরণ করেন, **মদন**— প্রেমের রাজা, **রতি** — প্রেমের রাণী ইত্যাদি—এ'রা প্রেমের দেবতা।

o **মহাদেব**—ক্রোধ পরায়ণ হয়ে প্রস্রাব করত : শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দেন, **ভৃগু**—ক্রোধের বশে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করেন **পরশুরাম**—কুঠারাঘাতে এক বিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন, **গৌতম**—ক্রোধের বশে অহল্যাকে পাষাণে পরিণত করেন ও দেবরাজ ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটান, **দুর্বাশা**-অভিশাপ দিয়ে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে চন্ডালে পরিণত করেন, **চামুণ্ডা**—ক্রোধের বসে নিজের মন্ডপাত ঘটান, **জহ্নুমুণি**—ক্রোধান্ধ হয়ে গোটা গঙ্গানদীকে গ্রাস করেন, ইত্যাদি। —এ'রা হলেনক্রোধের দেবতা।

সাপের ভয়ে—মনসা পূজা, **জ্বরে**—জ্বরাসুরের পূজা, **চুলকানি-পাঁচড়ায়**—ইটে কুমারের পূজা, **যক্ষ্মায়**—রক্ষাকালীর পূজা, **কলেরা-বসন্তে**-শীতলার-পূজা, দুর্গতির ভয়ে—দুর্গা পূজা, **শত্রু ভয়ে**—কার্তিক পূজা, **ব্যবসায়ে লোকসানের ভয়ে**—গণেশের পূজা, ঝড়ে **নৌকা ডুবির ভয়ে**—গঙ্গা পূজা, ইত্যাদি,—এ'রা ভয়ের দেবতা।

o মহাদেব— গাঁজা-ভাং ভালো বলেন, **মদন গোপাল**— নাড়ুসন্দেশে খুশী হন, **সত্য নারায়ণ**—সিন্নি খাওয়ার অভিলাষী, **ডাকিনী-যোগিনী**—রক্তের পিয়াসী, **শনিঠাকুর**—বাতাসায় তুষ্ট, **গণেশ** — তুষ্ট চাল-কলায়, **মা দুর্গা**—পরমান্ন ভাল বাসেন, **ত্রিনাথ**—ভাং ঘোটায় প্রীত হন, **দেবরাজ ইন্দ্র**—সোমরস ভালবাসেন, **ননী গোপাল**—ননীমাখন চুরি করেন, ইত্যাদি। —এ'রা লোভের দেবতা।

মহাদেবের অস্ত্র—ত্রিশূল, পিনাক ও পাশুপত, **শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র**—সুদর্শন চক্র, **বলরামের অস্ত্র**—লাঙ্গল, **পরশুরামের অস্ত্র**—কুঠার, **শ্রীরামের অস্ত্র**—তীর ধনুক, **নারায়ণের অস্ত্র**—শংখ, চক্র, গদা ও পদ্ম, **কার্তিকের অস্ত্র**—ধনুর্বাণ, **ইন্দ্রের অস্ত্র**—বজ্র, **মা দুর্গার অস্ত্র**—খড়গ, কুঠার প্রভৃতি দশ প্রহরণ, **ভীমের অস্ত্র**-গদা, **মনসার অস্ত্র**—সর্প, ইত্যাদি—এ'রা সশস্ত্র দেবতা।

ইন্দ্রের বাহণ—ঐরাবত হস্তি, **শ্রীকৃষ্ণের**—গড়ুর পাখী, **কার্তিকের**—

ময়ূর, **লক্ষ্মীর**—পেঁচা, **গণেশের**—ইঁদুর, **সরস্বতীর**—হাঁস, **মহাদেবের**—বলদ, **দুর্গার**—সিংহ, **যমরাজের**—কুকুর, **মনসার**—সর্প, **শীতলার**—গাধা, **গঙ্গার**—মকর, **বিশ্বকর্মার**—ঢেকী ইত্যাদি।—এ'রা বাহণ দেবতা।

চন্দ্রের—যক্ষ্মাব্যাধ, **শুক্রাচার্যের**—এক চোখ কানা, **গণেশের**—হস্তিমুন্ড, **ইন্দ্রের**—সহস্রযোনি, **অহল্যার**—পাষাণ মূর্তি, **জটাসুরের**—মাথায় জট, **নারায়ণ**—গোল পাথর, **ব্রহ্মার**—চারটি মুখ, **মহাদেব** — পঞ্চমুখী, **শ্রীদুর্গার**—দশহাত, **জগন্নাথের**—হাত, পা ঠুঁটো, **গণপতির**—পেট মোটা, **চামুণ্ডার**—হাতে মুন্ড, **ব্রহ্মা**—রক্তবর্ণ, **মা কালীর**—বর্ণ কালো, **শ্রীকৃষ্ণ**—শ্যাম সুন্দর, **মহাদেবের** বর্ণ সাদা, **অষ্টাবক্র মুণির**—আট স্থানে বাঁকা, ইত্যাদি।—এ'রা রুগ্ন ও বিকলাঙ্গ দেবতা।

লক্ষ্মী—বীণা বাজাতে ভালবাসেন, **শ্রীকৃষ্ণ** বাজান মোহন বাঁশী **মহাদেব**—ডমরু, বাজান, **নারদ** বাজান—একতারা, **জগাই-মাধাই**-খোল-করতাল বাজান, **মহাদেব**—শঙ্খনাদে তুষ্ট হন, **মা দুর্গা**—ঢাকের বাদ্য ভাল বাসেন, ইত্যাদি।—এ'রা বাদ্যযন্ত্র প্রিয় দেবতা।

স্থানাভাব বশতঃ এই শ্রেণী বিভাগ পর্ব এখানেই শেষ করতে হলো। অন্যান্য দেবদেবীদিগের পরিচয়ও যে এ থেকে ভিন্ন নয় আশা করি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হবে না।

ভক্ত-ভাবুকদিগের কথা স্বতন্ত্র, অতিভক্ত-অন্ধভক্তদিগের কথা আরো স্বতন্ত্র; কেননা কোন কিছুকে যাচাই-বাছাই করার সাধ্যশক্তি তাদের থাকেনা এবং তেমন প্রয়োজনীয়তাও তাঁরা বোধ করেন না। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার মানুষ যাঁরা কোন কিছুকে না জানা পর্যন্ত তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন সম্ভব নয় বলে মনে করেন এবং "যাকে যত বেশী করে জানা যায় তার প্রতি বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের মাত্রাও তত বেশী এবং তত দৃঢ় হয়ে থাকে এই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যাঁদের রয়েছে তাঁরা পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থের এই সব বিবরণকে কোন ক্রমেই সত্য, স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মেনে নিতে পারেন না।

কেউ কেউ এসব বিবরণকে অতীব অশ্লীল, জঘন্য এবং মানবতা বিরোধী বলেও মন্তব্য করতে পারেন। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। কেননা, যাঁরা সৃষ্টির সেরা মানুষের উপাস্য এবং ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র হবেন তাঁদের চরিত্র এবং কার্যকলাপ অতি অবশ্যই আদর্শ এবং অনুকরণীয় হতে হবে।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে যে—তবে এমনটা হওয়ার কারণ কি? অতঃপর এই প্রশ্নেরই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হবে।

কেন এমন হলো ?

বলাবাহুল্য, একদিন বা আকস্মিকভাবে এই দুঃখজনক পরিবর্তন সাধিত হয়নি। অতএব এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদিগকে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করতঃ পৌরাণিক অর্থাৎ কলিযুগ—পর্যন্ত দিনে দিনে কেন এবং কিভাবে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে গভীর ভাবে তা তলিয়ে দেখতে হবে।

অথচ বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ—এখানে নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে এই পরিবর্তনের উল্লেখ যোগ্য কারণ সমূহের কয়েকটি মাত্রকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে ঃ

ক) এজন্যে প্রথমেই—আমাদিগকে বেদের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হচ্ছে। বিশ্বাস যোগ্য তথ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় ঃ এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে বেদ রচনার কাজ শুরু হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতির দিক দিয়ে বর্তমানের তুলনায় সে সময়টাকে গভীর অন্ধকারের যুগ বলা হলেও মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।

সেই গভীর অন্ধকারের যুগে বৈদিক ঋষিগণ যে বেদের মতো---এমন প্রাঞ্জল, সুললিত, সাবলীল ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনায় সক্ষম হয়েছিলেন সেজন্য গর্বে আমাদের বুক স্ফীত হয়ে ওঠে—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মন আপ্লুত এবং অভিভূত হয়।

বেদ রচনার মাধ্যমে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা যে জাতির জন্যে এক-উজ্জ্বল ও অনবদ্য আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সে সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

কিন্তু আমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা এ কাজটি করেছিলেন এখন থেকে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে; যখন গভীর গবেষণাও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোন কিছুর প্রকৃত পরিচয় জানার সামান্যতম সে সুযোগও ছিল না।

সেই কারণেই বেদমন্ত্র সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করলে আমরা অনায়াসেই বুঝতে পারি যে, তদানিন্তন কালেরবৈদিক ঋষিগণ সাদা-চোখে কোন কিছু

দেখার পরে তাঁদের মনে সে সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, তাকেই তাঁরা সহজ সরল ভাবে বেদমন্ত্রের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ সূর্যের কথা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে ঃ

সূর্যের তাপ, তেজ, আলোক-রশ্মী প্রভৃতি অতি অবশ্যই সেদিন তাঁদের মনকে বিস্মিত ও অভিভূত করেছিল। সাদা চোখে সূর্যকে একটি উজ্জ্বল ও রক্তবর্ণ থালার মতো দেখে তাঁরা তদনুযায়ী সূর্য প্রণামের মন্ত্র রচনা করে ছিলেন। হিন্দু সমাজ বিশেষ করে ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি সূর্য প্রণামের সময়ে অতীব শ্রদ্ধার সাথে সেই মন্ত্রটি-ই পাঠ করে থাকেন। উক্ত মন্ত্রটি হলো ঃ

ওঁ জবাকুসুম সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্যান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণোতহস্মী দিবাকরম্ ।।

অর্থাৎ—জবা ফুলের মতো বর্ণ বিশিষ্ট, কশ্যপ মুণির পুত্র, মহাদ্যুতিময়, সকল প্রকারের পাপ ধ্বংসকারী দিবাকর (সূর্য)-এর রূপের ধ্যান আমি করি এবং তাঁকে প্রণাম করি। "সচল বা চলমান বস্তু মাত্রই প্রাণী" এবং "জনক-জননী ছাড়া কোন প্রাণীর সৃষ্টি হয় না" এই বাস্তব ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে তদানিন্তন বৈদিক ঋষিগণ যদি চলমান বস্তু হিসেবে সূর্যকে একটি প্রাণী এবং জনক-জননীর সন্তান বলে ধরে নিয়ে থাকেন এবং কশ্যপ মুণি ও তদীয় পত্নী অদিতিকে সূর্যের পিতা ও মাতা রূপে কল্পনা করতঃ সূর্যকে যথাক্রমে "কাশ্যপ" ও "আদিত্য" নামে ভূষিত করে থাকেন সেজন্য আজ এত দূরে বসে এবং এতকাল পরে তাঁদের প্রতি আমরা দোষারোপ করতে পারি না।

অনুরূপ ভাবে "সূর্য সপ্ত অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করতঃ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন" প্রভৃতি ধরণের যে সব মন্ত্র "বেদের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধে উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হলো ঃ খুব সম্ভব সে সময়ে অশ্বচালিত শকটের উদ্ভাবন হয়েছিল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যে শকটে চড়ে পরিভ্রমন করেন আর্য ঋষিগণের তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতাও হয়ে ছিল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা যদি "সূর্যের মতো-এহেন দেবতা নিশ্চিত রূপেই সপ্ত অশ্ববাহিত রথ বা শকটে চড়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে" বলে ধরে নিয়ে তদনুযায়ী বেদমন্ত্র রচনা করে থাকেন তবে সেজন্যে তাঁদের প্রতি কটাক্ষ করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হতে পারে না।

সুদীর্ঘ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের সেই অন্ধকার যুগের কথা ছেড়ে আমরা যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সমুজ্জ্বল এই বিংশ শতাব্দীর দিকে তাকাই

এবং লক্ষ্য করি যে, আমাদের আশ-পাশে সুধী-স্বজন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী বলে সুপরিচিত ব্যক্তিদিগের অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সূর্যকে একটি প্রাণহীন প্রচন্ড অগ্নি গোলক, পৃথিবী থেকে তের লক্ষগুণ বড় প্রভৃতি তথ্যাদি সুনিশ্চিত রূপে জানার পরেও নিজ নিজ প্রিয়তমাকে-"সূর্যমুখী" "সূর্যাননা," "সূর্যবদনী" প্রভৃতি এবং একশ্রেণীর কিশোর তরুণকে- "সূর্য-সন্তান" "সূর্যসেনা" প্রভৃতি বলে সোহাগ সম্ভাষণ করে চলেছেন এবং যখন লক্ষ্য করি যে, এই জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদিগের ধার্মিক বলে বিশেষভাবে সুপরিচিত একটি শ্রেণী সূর্যকে "ছায়ার স্বামী" "অদিতির গর্ভজাত" "প্রাণকর্তা," "সর্বপাপ হরণকারী" "কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্মদাতা" প্রভৃতি বলে বিশ্বাস পোষণ এবং উপাস্য জ্ঞানে পূজা-প্রণিপাত করে চলেছেন তখন ছয় হাজার বৎসর পূর্বের বৈদিক ঋষিদিগের সমালোচনা করার কোন কারণই আমরা খুঁজে পাইনা।

বলাবাহুল্য, এমনি ভাবেই অগ্নি, উষা, রাত্রি, পর্জন্য প্রভৃতি অন্য কথায় তদানিন্তন আর্য ঋষিদিগের দৃষ্টি ও অনুভূতিতে যা কিছু বিস্ময়কর, ভীতিজনক, উপকারী এবং অপকারী বলে ধরা পড়েছে তাকেই তাঁরা উপাস্য জ্ঞান করেছেন এবং তদানিন্তন পরিবেশ, যোগ্যতা এবং মন-মানসিকতানুযায়ী ওসবের সম্পর্কে তাঁদের মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে বেদমন্ত্র রচনার মাধ্যমে তাকেই তাঁরা তুলে ধরেছেন।

বিশেষ ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ হেন অন্ধকার যুগের-শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে বসবাস করেও তাঁরা বেদমন্ত্র রচনার মাধ্যমে চিন্তার জগতে যে মহা-আলোড়ন সৃষ্টি করে গিয়েছেন তা শুধু বিস্ময়করই নয় জাতির জন্য এক মহামূল্যবান সম্পদও।

উপনিষদীয় যুগে অর্থাৎ জিজ্ঞাসার মানসিকতা বিশেষ ভাবে বিদ্যমান থাকা কালে ব্রহ্ম বা পরম ব্রহ্ম সম্পর্কে "নানা মুণির নানা মত" সৃষ্টি হওয়ার কথা ইতি পূর্বে যথাস্থানে বলা হয়েছে। এই নানা মতের মধ্যে দুটি মতই বিশেষ ভাবে প্রবল হয়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তার একটি হলো : "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—অর্থাৎ বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্মময়। বলাবাহুল্য, এই চিন্তাধারা থেকে "যত্র জীব তত্র শিব" বা "জীব মাত্রই শিব" "আত্মামাত্রই পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মের অংশ স্বরূপ" "পরম আত্মা বা পরম ব্রহ্মই আত্মারূপে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করছেন" প্রভৃতি

ধারণা সমূহের সৃষ্টি ও কুকুর চন্ডাল গো-গর্দভাদি নির্বিশেষে সব কিছুকে ব্রহ্মের অংশ বা অঙ্গ হিসেবে প্রণিপাত করার ব্যবস্থা চালু হয়।

উপনিষদীয় যুগে অন্য যে মতটি প্রবল হয়ে ওঠার প্রমাণ পাওয়া যায় তা হলো : "যা দেবী সর্ব ভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা" (চন্ডী)। অর্থাৎ চন্ডী দেবী শক্তিরূপে সর্বভূতে বিরাজমান রয়েছেন।

বলা বাহুল্য, এখানে সেই অনন্ত পরম ব্রহ্মকেই চন্ডীরূপে কল্পনা করা হয়েছে —এবং তিনিই "শক্তিরূপে" সর্বভূতে বিরাজমান থাকার কথা বলা হয়েছে।

এতদ্বারা সর্বভূত বা বিশ্বের সব কিছুকেই যে সেই অনন্ত মহাশক্তির অংশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

এই দুটি মতের কথা বিশেষ ভাবে স্মৃতিতে জাগরুক রেখে আসুন আমরা কলিযুগের অবস্থা জানার চেষ্টা করি।

গ) মূর্তিপূজার সাথে আর্যদিগের বর্ণ-বিভাগের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এখানে বর্ণ-বিভাগ সম্পর্কে দুকথা বলতে হচ্ছে। বিষয়টি খুবই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং গভীর মনোযোগের সাথে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য সহৃদয় পাঠক মন্ডলীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

ইতিপূর্বে এই বর্ণ-বিভাগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে বিধায় এখানে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে শুধু বলা প্রয়োজন যে, আসলে "কর্ম-বিভাগ"কেই আর্যগণ "বর্ণ-বিভাগ" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অবশ্য তার বিশেষ কারণও ছিল। সেই কারণটি হলো :

"বৃ" ধাতু থেকে "বর্ণ" শব্দের উৎপত্তি। "বৃ" অর্থ "বরণ করা"। অর্থাৎ গুণ এবং যোগ্যতানুযায়ী যিনি যে কাজকে বরণ করে নিতেন তিনি সেই বর্ণের মানুষ বলে পরিগণিত হতেন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, বেদপাঠ, যাগ-যজ্ঞ, পূজার্চনা, ধর্মচর্চা, শিক্ষাদান প্রভৃতি কাজসমূহ অর্থাৎ মুখের সাহায্যে সম্পাদিত হয় এমন ধরনের কাজগুলি যাঁরা বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁরা সমাজের মুখপাত্র" বা "ব্রাহ্মণ বর্ণ" বলে অভিহিত হয়েছিলেন।

অনুরূপ ভাবে বাহুবল বা ক্ষাত্র শক্তির অধিকারী ব্যক্তিরা যুদ্ধ, রাজ্য শাসন, শত্রু দমন প্রভৃতি কাজগুলি বরণ করে নিয়ে "ক্ষত্রিয় বর্ণ" বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

উরু দেশ সুদৃঢ়, পদব্রজে ভ্রমণে সক্ষম, হিসেবে পরিপক্ক প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা ব্যবসা-বাণিজ্য, পশুপালন, ঋণদান ও সুদ গ্রহণ প্রভৃতি কাজগুলি বরণ করে নিয়ে বৈশ্য বর্ণে পরিণত হয়েছিলেন।

আর এসব কাজে যাদের যোগ্যতা ছিলনা তারা সেবার কাজ বরণ করে নিয়ে "শূদ্রবর্ণ" বলে পরিচিত হয়েছিলেন।

যেহেতু গুণ এবং যোগ্যতাই ছিল এই বর্ণ বিভাগের মূল ভিত্তি অতএব কোন কারণে এই গুণ এবং যোগ্যতার পরিবর্তন ঘটলে বর্ণেরও পরিবর্তন সাধিত হতো।

অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণে উন্নীত হতে পারতেন; আবার ব্রাহ্মণাদিরাও অযোগ্যতার কারণে নিম্ন বর্ণে অবনমিত হয়ে যেতেন।

উদাহরণ স্বরূপ গৃৎসমদ, শুনক, বীতহব্য, বৎস, কন্ব, মুদগল, গর্গ, হারিত, দেবল, শালংকায়ণ, বাস্কল, শাক্য সিংহের পিতা গোতম, ত্রয্যারুণ, পুস্করিণ, বলি, সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে। এঁরা ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও গুণ এবং কর্মানুযায়ী শুধু ব্রাহ্মণই হয়েছিলেন না বহু সংখ্যক বেদমন্ত্র রচনার গৌরবও অর্জন করেছিলেন।

অনুরূপভাবে শূদ্রা-নারীর গর্ভজাত কক্ষীবৎ, তুর, ঐলুষ প্রভৃতিরাও ব্রাহ্মণ বর্ণে উন্নীত হয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ ব্যাস দেবের ঔরসজাত হয়েও বিদুর ছিলেন—শূদ্র; ক্ষত্রিয় রাজা দশরথের ঔরসে সুমিত্রার গর্ভজাত লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন এবং বৈশ্য ভব-ভূতির পুত্র অহিমল প্রভৃতিরাও শূদ্র ছিলেন।

—বিভিন্ন পুরাণ এবং বৈদ্যবর্ণ বিনির্ণয় ২০৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য

অথচ কলিযুগে এই বর্ণ বিভাগকে চিরতরে রহিত করতঃ "জাতি ভেদ" প্রথার প্রবর্তন করা হয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ণ শব্দের সাথে "বরণ" করার প্রশ্ন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রয়েছে, পক্ষান্তরে জাতি শব্দের সাথে ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে—"জনন" শব্দের।

অর্থাৎ—যিনি যার ঔরসে জন্মগ্রহণ করবেন গুণ এবং যোগ্যতা থাক আর না থাক তিনি সেই জাতি বলে অভিহিত হবেন। কথাটিকে আরো পরিস্কার করে বলা যেতে পারে যে, ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান মাত্রই গুণ এবং যোগ্যতা থাক আর না থাক তিনি "ব্রাহ্মণ জাতি" বলে অভিহিত হবেন। অনুরূপভাবে

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের ঔরসজাত সন্তানেরা যোগ্য-অযোগ্য নির্বিশেষে যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জাতি বলে অভিহিত হবেন।

এ কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না যে, গুণ ও কর্মানুযায়ী ব্যক্তির মর্যাদা নির্ধারণ তথা বর্ণ-ব্যবস্থা আর গুণ ও কর্মকে বাদ দিয়ে জন্ম সূত্রকে মর্যাদা নির্ধারক হিসেবে গণ্য করা এক কথা নয়। বরং এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। শুধু তা-ই নয়—একটি অন্যটির পরিপন্থীও। অথচ দাবী করা হয়ে থাকে যে, এ দুটি ব্যবস্থারই স্রষ্টা হলেন—স্বয়ং ভগবান!

বলা বাহুল্য, ভগবান এমন কাজ করতে পারেন স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই দ্বিধাহীন চিত্তে সে কথা মেনে নিতে পারে না। অতএব, ভাল ভাবে ভেবে দেখার জন্য উভয় ব্যবস্থার মূল সূত্র দুটিকে পৃথক পৃথক ভাবে পাঠকবর্গ সমীপে তুলে ধরা যাচ্ছেঃ

বর্ণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে শ্রীমদ্ভাগবদগীতা, ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তিটি হলোঃ

চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ

—শ্রী মদ্ভাগবদগীতা ৩য় অঃ ১৩ শ্লোক

অর্থাৎ—"গুণ ও কর্মের বিভাগানুযায়ী আমি চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।"

জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে বেদে বলা হয়েছেঃ

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ মাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরুতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

—ঋগ্বেদ ১০ম মন্ডল ১২শ ঋক

অর্থাৎ—(ভগবানের) মুখ—ব্রাহ্মণ, বাহু রাজন্য বা ক্ষত্রিয় হইল; তাঁহার উরুদেশ বৈশ্য এবং পদদ্বয় শূদ্র হইল।

যেহেতু গুণ এবং কর্মানুযায়ী বর্ণ-ব্যবস্থার সৃষ্টি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং যুক্তি ও ন্যায়-ভিত্তিক অতএব এটাকে ভগবানের কাজ বলে মেনে নিতে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বেরও সম্মুখীন হতে হয় না।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট বেদের বাণীটি অর্থাৎ ভগবানের চারটি বিশেষ অঙ্গ থেকে ব্রাহ্মণাদি চারটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি এবং গুণ-কর্ম তথা যোগ্যতা থাক আর না থাক এদের ঔরসজাত সন্তানেরা চিরকাল পিতৃ পুরুষদিগের পরিচয়ে পরিচিত ও সম্মানিত হবে এমন কথাকে ভগবানের বাণী এবং এমন কাজকে

ভগবানের কাজ বলে অনেকেই দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিতে পারেন না। তাঁদের এই না পারার বহু কারণই রয়েছে, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার কয়েকটি মাত্রকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

o যেহেতু ভগবান গুণ এবং কর্মানুযায়ী বর্ণ-বিভাগ করেছেন অতএব জাতি বিভাগের কাজটি তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ তাহলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি ভুল করে বর্ণের সৃষ্টি করেছিলেন পরে জাতি-ভেদের সৃষ্টি করতঃ সেই ভুলেরই সংশোধন করেছেন।

o ভগবান ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান। অতএব তিনি ইচ্ছা করা মাত্রই সব কিছু হয়ে যায় এবং তাঁর অসাধ্য কিছু থাকতে পারে না।

এমতাবস্থায় তিনি তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্র জাতির সৃষ্টি করতে যাবেন কেন ? আর কেন-ই বা এইভাবে চির কালের জন্য তিনি মানুষে মানুষে ছোট বড় বা উচ্চ নীচ ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে যাবেন ?

o ভগবান সারা বিশ্বের এবং সকল মানুষের স্রষ্টা; তাঁর মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির সৃষ্টি হয়ে থাকলে সারা বিশ্বেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকতো।

অথচ ভারত বর্ষের বাইরে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব ধরে নিতে হয় যে, তিনি শুধু ভারতীয় হিন্দুদিগেরই স্রষ্টা, অথবা ধরে নিতে হয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদিগকে তিনি তাঁর অন্য কোন অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করেছেন।

দুঃখের বিষয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষদিগকে তিনি তাঁর কোন অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করেছেন অথবা আদৌ তাদিগকে তিনি সৃষ্টি করেছেন কি না বেদ-পুরাণাদির কুত্রাপি তার কোন উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না।

এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না। কারণ সুধী পাঠকবর্গ নিজেরা একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলেও জাতি-ভেদের মত এমন অন্যায়, অসংগত এবং সর্বনাশা কাজটি যে ভগবানের দ্বারা অনুষ্ঠিত হতে পারে না তার বহু যুক্তিই খুঁজে পাবেন।

এখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তা হলে জাতিভেদ প্রথার স্রষ্টা কে আর কেন এবং কিভাবে তা এমন জগদ্দল পাথরের মতো সমাজের বুকে চেপে বসতে পারলো ?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদিগকে বর্ণ-ব্যবস্থার কি পরিণতি ঘটে ছিল এবং কেন ঘটে ছিল প্রথমেই সে কথা জেনে নিতে হবে। তা হলেই কি ভাবে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হলো এবং কি ভাবে তা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসলো অতি সহজেই সে কথা জানতে পারা যাবে বলে আশা করি।

বর্ণ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণগণই যে সর্বাধিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন সে কথা বলাই বাহুল্য। আর এ জন্য তাদিগকে যে সর্বাধিক গুণ সম্পন্ন ও সর্বাধিক সৎকার্যশীল হতে হয়েছিল সে কথাও খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ব্রাহ্মণদিগকে যে তাঁদের গুণরাজী এবং কর্মকান্ডকে যথাযোগ্য অনুশীলন ও কঠোর কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে অক্ষুন্ন-অব্যাহত রেখে এই শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হয়েছে আর যাঁরা তা পারেন নি তাঁদিগকে যে নিম্ন বর্ণে অবনমিত হতে হয়েছে ইতিপূর্বে সে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ধর্মীয় নেতা এবং সমাজপতি হিসেবে তাঁরা ধর্মীয় বিধানের আলোকে সমাজ গঠনের বিধি ও নীতি-নিয়ম প্রণয়ন ও প্রবর্তন তথা সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন। শুধু তা-ই নয়—ধর্মীয় বিধানের আলোকে রাষ্ট্র এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার যে নিয়ম প্রণয়ন করেছেন ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-দিগকে সেই নীতি-নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্র ও ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা করতে হয়েছে।

এই সব বিধি বিধান ও নিয়ম কানুন মেনে চলার কারণে সেদিনের ক্ষত্রিয়গণ ছিলেন রাজ্য-রক্ষক, প্রজা-পালক ও শান্তি শৃংখলা বিধায়ক। ক্ষমতার দম্ভ ও ভোগ বিলাসের মোহ সে দিন তাঁদিগকে স্পর্শ করতে পারেনি।

পিতৃ সত্য রক্ষার জন্য অবলীলা ক্রমে রাজ্য রাজত্ব ছেড়ে শ্রীরাম চন্দ্রের বনবাসে গমন, ব্রাহ্মণের সন্তুষ্টির জন্য রাজা হরিশ চন্দ্রের রাজ্যসহ সব কিছু দান করণ এবং দক্ষিণা দানের জন্য সস্ত্রীক চন্ডালের দাসত্ব বরণ প্রভৃতি ইতি-হাস আমাদের অজানা নয়।

অনুরূপ ভাবে বৈশ্যগণ কর্তৃক ধর্মীয় বিধি বিধানানুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা এবং প্রয়োজন বোধে সব কিছু ছেড়ে বৈরাগ্য অবলম্বনের বহু ঘটনাও আমাদের জানা রয়েছে।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ক্ষমতা, ভোগ বিলাস এবং ধনের মোহ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগকে ভীষণ ভাবে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করে ফেলে।

আর এই অবস্থা যাদের হয় তারা স্বাধীন, দুর্মদ, স্বৈরাচারী এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। যে কোন পথে এবং যে কোন উপায়ে ক্ষমতা এবং ধনকে কুক্ষীগত করার জন্য স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর তাদের থাকে না। অন্য কারো আইন এবং অন্য কারো নিয়ন্ত্রণকে তাঁরা তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে ভীষণ প্রতিবন্ধক বলে মনে করে। সব কিছুকে চুরমার এবং ধূলিসাৎ করে দিয়ে তারা নিজস্ব আইন ও নিজস্ব বিধি-বিধানের প্রণয়ন ও প্রবর্তন করে নিয়ে নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে চায়।

একথা বেশ ভাল ভাবেই আমাদের জানা রয়েছে যে সমাজ চিরদিনই বাহুবল এবং ধনবলের কাছে নত হয়ে থাকে। সেদিনের রাজা, মহারাজা, রাজ চক্রবর্তী, রাজাধিরাজ, সম্রাট প্রভৃতিরা অপরিসীম বাহুবলের অধিকারী হয়েছিলেন আর ব্যবসা বাণিজ্য, কুশীদ গ্রহণ ও পশু পালনের মাধ্যমে বৈশ্যগণ অধিকারী হয়েছিলেন অঢেল ধন সম্পদের।

পক্ষান্তরে সমাজপতি ব্রাহ্মণদিগের বাহু বল এবং ধন বল বলতে কিছুই ছিল না। তাঁরা ছিলেন দুর্বল এবং কপর্দকহীন।

শুধু তা-ই নয়; এইসব বাহুবল এবং ধন বলের অধিকারীদিগের প্রদত্ত দান-দক্ষিণাই ছিল তাঁদের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন।

মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্রাহ্মণগণ যতদিন ধর্ম বলে বলীয়ান ছিলেন ততদিন বাহুবল এবং ধন বলের অধিকারীরা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন, যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সম্মানও করেছেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ে সেই সব ব্রাহ্মণেরা ছিলেন না; ছিলেন তাদের বংশধরেরা।

আমরা জানি এবং বেশ ভাল ভাবেই জানি যে, কোন মানুষের সব কটি সন্তানই জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, মন-মেজাজ, মেধা, দৈহিক বল প্রভৃতির দিক দিয়ে একইরূপ হয় না। অনেক সবল ব্যক্তির ছেলেকে দুর্বল হতে দেখা যায়। জ্ঞানী-গুণীর ছেলেও মূর্খ-অপদার্থ হয়। বর্ণ-ব্যবস্থার অধিনে এই সব দুর্বল ও অযোগ্য সন্তানদিগকে নিম্ন বর্ণে অবনমিত হতে হতো। আর ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতি হিসাবে এই অবনমনের কাজটা পরিচালনা করতে হতো ব্রাহ্মণদিগকেই।

অথচ বিভিন্ন পুরাণ ও ভাগবতাদি গ্রন্থের নানা উপাখ্যান ও বর্ণনা-বিবৃতি

থেকে তদানিন্তন ব্রাহ্মণদিগের পরিচয় দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো:

তাঁদের অধিকাংশই নানা কারণে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ হওয়ার মতো গুণাবলী ও কর্মকান্ড থেকে শুধু দূরেই সরে গিয়েছিলেন না বরং তাঁদের অনেকেই "তর্কবাগীশ" "বিদ্যাবাগীশ", "তর্কালংকার", "তর্করত্ন" "ন্যায় শাস্ত্রী" "মহামহিমোপাধ্যায়" বা এমনি ধরনের এক বা একাধিক উপাধী ধারণ করতঃ ধর্মের মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে ধর্মের খুঁটিনাটি এবং নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন এবং সেটাকেই নিজ নিজ পান্ডিত্য, ধার্মিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

ফলে তাঁদের মধ্যে পরস্পর বিবদমান ও শত্রু ভাবাপন্ন অসংখ্য বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, সমাজ ও দল-উপদল প্রভৃতি গড়ে উঠেছে; ধর্ম নিয়ে বড়াই বাহাদুরী এবং একে অন্যকে হেয়, ঘৃণ্য ও অযোগ্য-অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করার এক অতীব দুঃখজনক প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছে।

যাঁরা এসময়ের অবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, ধার্মিক বলে সুপরিচিত ব্যক্তিদিগের অধিকাংশই এ সময়ে অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়েছেন; কপালে তিলক বা ত্রিপুন্ড্রক ধারণ, দেহের স্থানে স্থানে তথাকথিত শ্রীভগবানের পদচিহ্ন অংকন, দিগম্বর হওয়া বা কৌপিন পরিধান, গেরুয়া বসন বা নামাবলীর উত্তরীয় ব্যবহার, মুখমন্ডল অথবা দেহকে ভস্মাচ্ছাদিতকরণ, কন্ঠে রুদ্রাক্ষ বা তুলসীর মালা পরিধান প্রভৃতিকেই তাঁরা ধার্মিকতার পরাকাষ্ঠা হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

এখন ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, এই সব অন্তঃসার শূন্য, পরস্পর কোন্দল-পরায়ন ও শতধা বিচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ দিগের পক্ষে তদানিন্তন কালে দোর্দন্ড প্রতাপে সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা, মহারাজা প্রভৃতি এবং ধনিক-বনিকদিগের উপরে সমাজপতিত্ব করা এবং বর্ণ-ব্যবস্থানুযায়ী এই রাজা মহারাজা ও ধনিক বনিকদিগের অযোগ্য সন্তান বা সন্তানদিগকে নিম্ন বর্ণে টেনে নামানো সম্ভব ছিল কিনা।

সম্ভব যে ছিল না সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর সম্ভব ছিলনা বলেই বর্ণ ব্যবস্থাটি যে অচল হয়ে পড়েছিল সে কথাও খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করিনা।

এই ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ার অন্য একটি বিশেষ কারণও ছিল। উক্ত কারণটিকে আমরা "মানবিক কারণ" বলে অভিহিত করতে পারি।

মানুষকে যে কঠোর সংগ্রাম ও সাধনার মাধ্যমে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয় সেকথা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে। আর একথাও জানা রয়েছে যে, প্রতিষ্ঠা লাভের এই সংগ্রাম ও সাধনার সময়ে মানুষ নিজের চেয়ে তার প্রাণাধিক সন্তান-সন্ততিদিগের কথাই বেশী করে চিন্তা করে। কেননা কোন পিতাই এটা চায়না যে তার মৃত্যুর পরে তার প্রাণাধিক সন্তান-সন্ততিরা দুঃখ কষ্ট ভোগ করুক বা মর্যাদাহীন জীবন যাপনে বাধ্য হোক।

সন্তান-সন্ততিদিগের সুখী ও মর্যাদাশালীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পিতাই যে নিজের জীবনকে তিলেতিলে বিলিয়ে দেয় এমন বহু ঘটনা আমাদের চোখের সম্মুখেই বিদ্যমান রয়েছে।

এসব ক্ষেত্রে যে সন্তানটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও নির্ভরযোগ্য নয় সে সন্তানটির প্রতিই যে পিতা মাতার অধিক মনোযোগ থাকে সে কথাও আমাদের মোটেই অজানা নয়।

এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যে, প্রতিটি পিতাই নিজ নিজ সন্তান সন্ততিকে যথাযোগ্য ভাবে গড়ে তোলা এবং তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে নিরাপদ ও মর্যাদাশালীরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যাওয়াকে একটি বিশেষ মানবিক দায়িত্ব বলে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।

এবারে ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, যেখানে সাধারণ মানুষদিগেরই এই মানসিকতা সেখানে সমাজের গৌরবজনক আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত মানুষদিগের মানসিকতা কি হতে পারে ?

উদাহরণ স্বরূপ কোন এক রাজপুত্রের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। রাজা নিজে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও সাধনার মাধ্যমে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সন্তানদিগকে রাজকীয় ভাবে প্রতিপালন ও আদর সোহাগ করেছেন।

এখন বর্ণ-ব্যবস্থার কারণে যদি তাঁর দুর্বল ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেনি এমন ছেলেটিকে পিতৃ-পুরুষের সম্মান, গৌরব, উপাধি প্রভৃতি ছেড়ে শূদ্র বা চন্ডালাদি নিম্ন বর্ণে নেমে যেতে হয়—তবে মানবিক দৃষ্টি কোণ থেকেই উক্ত রাজা বা স্নেহশীল, মানবতাবোধ সম্পন্ন এবং সমাজে বিশেষ

গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছেন এমন কোন পিতাই এটাকে সমর্থন করতে পারেন না। বলা বাহুল্য, সমাজের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা অন্তরের সাথে যে ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারেন না—সে ব্যবস্থা কোন ক্রমেই সমাজে চালু থাকতে পারে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সমাজের সাধারণত শান্তি প্রিয় মানুষদিগকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক বাহুবল ও ধনবলের অধিকারীদিগের অনুগত থাকতে ও অধীনতা স্বীকার করতে হয়।

বর্ণ-ব্যবস্থার একটা বিশেষ অসুবিধা এই ছিল যে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব যাদের উপরে অর্পিত হয়েছিল বাহুবল এবং ধনবল বলতে যা বোঝায় তার কোনটাই তাদের ছিল না।

ফলে এই শক্তিদ্বয়ের স্বৈরাচারীতা ও স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল না হয়ে আত্মসমর্পনের নীতিই তাঁদিগকে গ্রহণ করতে হয়েছিল।

সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত ব্যক্তিদিগকে যদি নিম্নস্তরের স্বৈরাচারী শক্তির কাছে নতিস্বীকার করতে হয় তবে সে সমাজের অবস্থা কি হতে পারে সে কথা সহজেই অনুমেয়।

এ নিয়ে আর দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। কেননা বর্ণ-ব্যবস্থা যে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেছে এবং এই মৃত্যুর কারণ যে উক্ত ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই সে কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো : বর্ণ-ব্যবস্থার মৃত্যু যে স্বাভাবিক এবং অবধারিত ছিল সে কথা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সেখানে কিভাবে নতুন করে আবার জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ এসে আসর জমিয়ে বসলো ?

এই প্রশ্নের উত্তর : ব্রাহ্মণগণ ছিলেন সমাজে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ। আর বর্ণ ব্যবস্থানুযায়ী বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম গ্রন্থ এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এই ব্রাহ্মণদিগের উপরেই।

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথাক্রমে রাজ্য জয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে ধর্ম এবং ধর্মীয় বিধানাদির দিকে নযর দেয়ার সামান্যতম সুযোগও তাঁদের ছিল না। হয়তো প্রয়োজনও ছিল না।

আর শূদ্রদিগের জন্য তো ধর্ম-কর্মে অংশ গ্রহণটাই ছিল সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং ভীষণ শাস্তি যোগ্য অপরাধ।

অতএব ধর্মের ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণই যে সর্বেসর্বা ছিলেন এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম নাক গলানোরও অধিকার এবং সুযোগ যে অন্য কারো ছিল না সে কথাটি বিশেষ ভাবে মনে রেখে আমাদিগকে পরবর্তী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

বর্ণ-ব্যবস্থার সুযোগে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ যে চরম সাফল্যের সাথে তাঁদের কাজ গুটিয়ে নিয়েছিলেন সে কথা সহজেই অনুমেয়।

এই অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মেই তারা তাদের কঠোর সাধনা ও সংগ্রাম-লব্ধ মান-সম্মান, প্রাধান্য-প্রতিপত্তি, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতিকে সন্তান-সন্ততিগণ সহকারে স্থায়ী ও নিরংকুশ ভাবে ভোগ-ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভয় ছিল—কোন সময়ে বর্ণ-ব্যবস্থার উদ্যত খড়্গ কোন সন্তানটির বন্ধন কেটে তাকে পৃথক করে নেয় এবং শূদ্র বা মুচী-মেথরে পরিণত করে।

তদানিন্তন কালে বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকেই সর্বাধিক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কারণ ক্ষত্রিয় রূপী রাজা মহারাজা প্রভৃতি এবং বৈশ্যরূপী বণিক ব্যবসায়ীরা বাহুবল ও ধনবলে যতই বলীয়ান, শক্তিশালী ও প্রভুত্ব কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে চলেছিলেন সমাজের বুক থেকে ততই বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পেয়ে চলেছিল। এই অবস্থা চলতে থাকলে একদিন ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হবে সে কথা ভেবে তাঁরা ভীষণ ভাবে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন।

এই অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার একটি মাত্র উপায়ই তাঁরা খুঁজে পেয়েছিলেন ; আর তা হলো : এত কাল ধরে চলে আসা গুণ ও কর্মের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে জন্মগত অধিকারের ভিত্তি রচনার মাধ্যমে নিজেদের মর্যাদা ও অধিকারকে চিরস্থায়ী ভাবে সমাজের বুকে চাপিয়ে দেয়া।

এই কাজের জন্য একটি বিরাট সুযোগও তাঁরা পেয়েছিলেন। আর সেই সুযোগটি হলো—জাতি ভেদ সংক্রান্ত উপরোক্ত বেদ মন্ত্রটিকে স্বয়ং ভগবানের মুখনিসৃত বলে চালিয়ে দেয়া।

বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে বর্ণ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত শ্রী মদ্ভাগবদগীতার শ্লোকটির পরেই জাতিভেদ সাক্রান্ত বেদের যে মন্ত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে

তাকে ভগবানের মুখ নিসৃত বলা হলেও আসলে তা 'নারায়ণ' নামক জনৈক ঋষির রচিত।

তিনি "ভগবানের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়-প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে বলে কল্পনা করেছিলেন এবং তদনুযায়ী মন্ত্রটি রচনা করে ছিলেন। এই মন্ত্রটি যে উক্ত ঋষির-রচিত মন্ত্রটির মধ্যেই তার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

বেদের পাঠক মাত্রেরই জানা রয়েছে যে, প্রতিটি বেদ মন্ত্রের শুরুতেই উক্ত-মন্ত্রের দেবতা এবং রচয়ীতা কে, কোন্ ছন্দে পাঠ করতে হবে, এবং কোন্ কাজে ব্যবহার করতে হবে—সুস্পষ্ট রূপে তা বর্ণিত রয়েছে। পাঠকবর্গ ইচ্ছা করলে ঋগ্বেদ-সংহিতা ১০ম মন্ডলের ৯০ সুক্তটি পাঠ করে আমার এই কথার সত্যতা যাঁচাই করে দেখতে পারেন। যাঁদের বেদ পাঠের সুযোগ নেই-তাঁরা-আমার লিখিত "আর্তনাদের অন্তরালে" নামক-পুস্তক খানা পাঠ করলেও এসম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হতে পারবেন।

সে যা হোক, এই ভাবে নারায়ণ ঋষির কল্পনার উপরে ভিত্তি করে রচিত মন্ত্রটিকে সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করা হলো।

এতদ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ বংশানুক্রমিক ভাবে চিরদিনের জন্য তাঁদের কাজ কারবার, ভোগ-বিলাস এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি অব্যাহত রাখার সুযোগও নিশ্চয়তা পেলেন বলে এতে তাদের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি তো-উঠে-ই নি বরং এটাই তাদের কাম্য ছিল বিধায় তারা যৎপরোনাস্তি খুশীই হয়েছিলেন।

বলাবাহুল্য, গুণ এবং কর্ম থাক আর না থাক এতদ্বারা ব্রাহ্মণগণও বংশানুক্রমিক ভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনকে চিরস্থায়ী করার সুযোগ করে নিলেন।

এতদ্বারা যাঁরা কোন সুযোগই পেলেন না বরং এই ব্যবস্থার দ্বারা বংশানুক্রমিক ভাবে—চির দিনের জন্য যাঁদের উপরে দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হলো তারা হলেন—দেশের সাধারণ নাগরীক; বর্ণ-ব্যবস্থার সময়ে যারা "শূদ্র বর্ণ" বলে অভিহিত হয়ে আসছিলেন।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমিক ভাবে ঘৃণ্য দাসত্বের বোঝা বয়ে চলেছেন এবং চির দিনই এ বোঝা তাঁদিগকে বয়ে চলতে হবে।

এই দীর্ঘ পটভূমিকার পরে এবারে আসুন আমরা আমাদের মূল বক্তব্য অর্থাৎ মূর্তি নির্মাণ ও পূজার উদ্ভব কি ভাবে ঘটলো সেই প্রসঙ্গে ফিরে যাই।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, ব্রাহ্মণগণ নিজেদের স্বার্থেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করে ছিলেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ এই সুযোগকে নিজেদের কাজে লাগিয়ে ছিলেন মাত্র। কেননা শক্তি-বলে তাঁরা ইতি পূর্বেই সমাজের বুকে নিজেদের আসন তথা প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিলেন—এবং এই অবস্থায় টিকে থাকার শক্তি সামর্থও তাঁদের ছিল। অতএব জাতি-ভেদ প্রথা প্রবর্তিত না হলেও তাঁদের বিশেষ কোন অসুবিধা হতো না।

কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কেননা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মতো বল বা শক্তি তাঁদের ছিল না। বর্ণ শ্রেষ্ঠ হিসেবে লব্ধ মান মর্যাদা এবং সুযোগ সুবিধা টুকুও নানা কারণে দিন দিন হ্রাস পেয়ে প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

এই অবস্থায় ধর্মীয় বিধানে জাতিভেদ প্রথাকে ভগবানের কাজ বলে উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল না। বরং এমন কিছু করা প্রয়োজন ছিল যা দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের মোকাবেলায় জনমনে নিজেদের আসনকে স্থায়ী ও কার্যকর ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এই উদ্দেশ্যে তাঁরা যে সব উপায় অবলম্বন করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তার মধ্যে দুটি উপায়ই ছিল প্রধান। সে দুটোকে আমরা অতঃপর যথাক্রমে "রক্তের দাবী" ও "ভক্তির প্লাবন" এ দুটি উপ-শিরোনাম দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরবো।

রক্তের দাবী :

বাহুবল, ধনবল, জনবল, বুদ্ধিবল প্রভৃতি বলের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু যে বলটির সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তার নাম—চরিত্র বল বা নৈতিক শক্তি। কেননা, এই বল বা শক্তিটি ছাড়া অন্য সব বল শুধু বিফলই হয় না চরম ধ্বংসকেও ডেকে আনে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই চরিত্র বল বা নৈতিক শক্তি অর্জনের জনাই প্রয়োজন হয় ধর্মের। ধর্মের অণুশাসন এবং এই চরিত্র বলের দ্বারা অন্য সব বলকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। ব্রাহ্মণগণ ছিলেন এই চরিত্র বলের অধিকারী। সুতরাং এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপের দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণদিগেরই।

আলোচ্য সময়ে তাঁরা যে এই বল হারিয়ে ফেলে ছিলেন এবং তারই ফল-

শ্রুতিতে যে অন্যান্য বলের অধিকারীরা দুর্দম ও বেপরওয়া হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ সে কথাটিকেই বিশেষ ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে নতুন করে বাহুবল এবং ধনবল অর্জন এবং সেই বলের সাহায্যে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মোকাবিলা করতঃ শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। একমাত্র চরিত্র বল বা নৈতিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করেই এ কাজ তাঁরা করতে পারতেন। অথচ তাঁরা সেদিকে না গিয়ে কতিপয় কৃত্রিম উপায়ে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করেন। এই কৃত্রিম উপায়গুলির কয়েকটি সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হবে।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, চরিত্রবল বা নৈতিক শক্তি অর্জনই যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের একমাত্র পথ ব্রাহ্মণগণ অতি অবশ্যই সে কথা জানতেন। এ জানার পরেও তাঁরা ভিন্ন পথে গেলেন কেন?

এতকাল পরে এবং এত দূরে বসে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া সম্ভব নয়। তবে বেদ-পুরাণাদির আলোকে তদানিন্তন অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন এমন ব্যক্তিদিগের অনেকেই মনে করেন যে, চরিত্রবল বা নৈতিক শক্তি অর্জন শুধু কঠোর শ্রম এবং সাধনা-সাপেক্ষই নয়—প্রভুত পরিমাণে সময়-সাপেক্ষও। অথচ তদানিন্তন পরিবেশে এই শ্রম, সাধনা এবং সময় ক্ষেপণের সামান্যতম সুযোগও ছিলনা।

তা ছাড়া তদানিন্তনকালে নানা দল-উপদলে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর কোন্দল পরায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে ঐক্যবদ্ধ করতঃ নৈতিক শক্তি অর্জনের জন্য শ্রম ও সাধনায় নিয়োজিত করাও ছিল এক কঠিন ব্যাপার।

সে যা হোক, নৈতিক শক্তি অর্জনের সুযোগ না থাকার কারণেই যে ব্রাহ্মণ-দিগকে এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল সে কথা ধরে নিয়ে আমাদিগকে আলোচনায় ব্রতী হতে হবে।

বলা বাহুল্য, জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন ছিল এই পদক্ষেপ সমূহের একটি। এই প্রথার মাধ্যমে তাঁরা যে নিজেদের আসনটিকে জন্ম-ভিত্তিক ও বংশানু-ক্রমিকভাবে চিরস্থায়ী করে নিতে চেয়েছিলেন ইতিপূর্বের আলোচনা থেকে সে কথা আমরা জানতে পেরেছি।

জন-সমর্থন ছাড়া কোন আইন-কানুন, বিধি-বিধান, প্রথা-পদ্ধতি প্রভৃতি যে চালু হতে পারে না তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। সুতরাং

জাতিভেদ প্রথার মাধ্যমে ব্রাহ্মণদিগের আসনটিকে চিরস্থায়ী করণের পক্ষেও প্রবল জনমত সংগঠনের প্রয়োজন যে অপরিহার্য ছিল আমরা অনায়াসে সেকথা বলতে পারি।

ব্রাহ্মণগণও সেকথা জানতেন এবং জানতেন বলেই জাতিভেদ প্রথাকে স্বয়ং ভগবানের সৃষ্ট বলে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রটিকে বেদমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের চিন্তাও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাঁদিগকে করতে হয়েছিল।

কথাটিকে আরো পরিস্কার করে বলা যেতে পারে যে, একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য সকলের জন্যে বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-অনুশীলন প্রভৃতি এমনকি স্পর্শকরণও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং ভীষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। এমতাবস্থায় জাতিভেদ প্রথা সংক্রান্ত মন্ত্রটি বেদের মধ্যে থাকা আর না থাকা উভয়ই ছিল সাধারণ মানুষদিগের পক্ষে সমান বা একই রূপ অর্থবহ।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য এই জাতিভেদ প্রথার প্রবর্তন ছাড়া অন্য যে সব পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন মূর্তি পূজার উদ্ভাবন ও প্রবর্তন, রক্তের দাবী, ভক্তির প্লাবন সৃষ্টি প্রভৃতি সেগুলোর অন্যতম।

মূর্তি পূজা সহ অন্যান্য পদক্ষেপগুলো সম্পর্কে পরে আলোকপাত করা হবে। এখানে রক্তের দাবী বলতে কি বোঝায় এবং এই দাবীকে জনসাধারণের মন-মগজে বদ্ধমূল করে তোলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে সব শ্লোক রচনা ও যুক্তির অবতারণা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে :

o স্মরণাতীত কালের বশিষ্ট, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, কাশ্যপ প্রভৃতি গোত্রপতি ব্রাহ্মণদিগের মহিমা ও মহাত্মকে সবিস্তারে সাধারণ মানুষদিগের কাছে তুলে ধরা হয়েছিল এবং দাবী করা হয়েছিল যে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদিগের পবিত্র রক্তধারা বর্তমানের যোগ্য-অযোগ্য এবং পাপী-পুণ্যবান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্রাহ্মণের শিরা ও ধমনীতে প্রবাহিত রয়েছে। অতএব এই পবিত্র রক্তের ধারক এবং বাহক হিসবে প্রতিটি ব্রাহ্মণই পবিত্র এবং সম্মানার্হ।

সাধারণ মানুষদিগকে সতর্ক করে বলে দেয়া হয়েছিল যে, যোগ্য-অযোগ্য বা পাপী-পুণ্যবান যা-ই হোক কোন ব্রাহ্মণকেই তিল পরিমাণ অসম্মান দেখানো যাবেনা। কারণ কোন ব্রাহ্মণকে অসম্মান দেখানোর অর্থই হলো

অতীতের সেই মহাপুরুষদিগের পবিত্র রক্তকে অসম্মান দেখানো।

o ঐসব গোত্র-পতিদিগের পরিচয়-সূচক হাজার হাজার শ্লোক রচনা করতঃ ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে ওসবের সংরক্ষণ ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ এ সম্পর্কীয় মাত্র তিনটি শ্লোক নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

পরমা প্যাপদং প্রাপ্তো ব্রাহ্মণান্ন প্রকোপয়েৎ
তে হ্যেনং কুপিতা হন্যুঃ সদ্যঃ সবল বাহনম্

অর্থাৎ—অতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াও ব্রাহ্মণের কোপ করাইবেন না, ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ-অভিচারাদি দ্বারা সবাহন-বল রাজাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে পারেন।

—মনু সংহিতা ৯/৩১৩ ;

লোকান ন্যান্ সৃজেয়ূর্যে লোক পালংশ্চ কোপিতা :
দেবান্ কুর্য্যুর দেবাংশ্চ ক ; ক্ষিন্বংস্তান্ সমৃধ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ—যাহারা (ব্রাহ্মণগণ) স্বর্গাদি লোকের এবং দিকপাল সকলের সৃষ্টি করিতে পারেন এবং দেবতার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগকে শাপ দ্বারা মনুষ্য করিতে পারেন এতাদৃশঃ ব্রাহ্মণকে ক্ষুণ্ন করিয়া কে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ?

—ঐ ৩১৫

উল্লেখ্য যে, এই ধরণের বহু শ্লোকই মনুসংহিতা, পুরাণ সমূহ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর ব্রাহ্মণদিগের অভিশাপে যেসব মানুষ, দেবতা, গন্ধর্ব, অপ্সরা এমনকি স্বয়ং ভগবান অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, কীট-পতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার বা চন্ডাল, পাথর, গাছ-বৃক্ষ প্রভৃতিতে পরিণত হয়েছেন এসব শ্লোকের সমর্থনে তেমন বহু উপাখ্যানই এইসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকতে দেখা যায়।

এই লিপিবদ্ধকরণের কাজ কখন, কি উদ্দেশ্যে এবং কাদের দ্বারা সমাধা হয়েছে আশাকরি সেকথা খুলে বলার প্রয়োজন হবে না। আমাদের প্রতিশ্রুত তৃতীয় শ্লোকটি হলো :

যৈঃ কৃতঃ সর্ব্ব ভক্ষ্যোহগ্নির পেয়শ্চ মহোদধিঃ
ক্ষয়ী চাপ্যায়িতঃ সোমঃ কোনশ্যেৎ প্রকোপ্যতান্।

অর্থাৎ—যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে সর্বভক্ষ করিয়াছেন ও যাঁহারা অগাধজল জলধিকে অপেয় জল করিয়াছেন, যাঁহারা চন্দ্রকে ক্ষয়ী করিয়া পশ্চাৎ অনুগ্রহে পূর্ণাবয়ব করিয়াছেন এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ করাইয়া কে না নষ্ট হইবে ?

—মনুসংহিতা ৯/৩১৪ শ্লোক

বলা বাহুল্য অন্যান্য শ্লোকের মতো এই শ্লোকটির সমর্থনেও বহু কাহিনী রচিত ও বিশেষ দক্ষতা সহকারে সম্প্রচারিত হয়েছে। সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নমুনা স্বরূপ একটিমাত্র কাহিনীর সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে :

"ভৃগু একদা কার্যোপলক্ষ্যে ভগবান বিষ্ণুর নিকটে গমন করেন। ভগবান বিষ্ণু তখন নিদ্রিত ছিলেন। ভগবানকে এমনি অসময়ে নিদ্রিত দেখে ভৃগু ক্রুদ্ধ হন এবং ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করেন। পদাঘাতে বিষ্ণু জাগ্রত হন এবং এই পদাঘাত করার কারণে ভৃগুর কোমল চরণে আঘাত লেগেছে বিবেচনায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উক্ত চরণের সেবা শুরু করেন।

উল্লেখ্য যে, ভগবান বিষ্ণু সেই থেকে ভৃগুর এই পদচিহ্নকে অতীব শ্রদ্ধার সাথে নিজের বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন।

—বিভিন্ন পুরাণ, মহাভারত, অথবা
আশুতোষ দেবের নতুন বাঙ্গালা অভিধান "ভৃগু" শব্দ দ্রঃ

বলা বাহুল্য, এতদ্বারা একথাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল যে, স্বয়ং ভগবানই যেখানে ব্রাহ্মণের পদাঘাতের চিহ্নকে গর্বের সাথে বক্ষে ধারণ করেন এবং কোমল চরণে আঘাত লেগেছে মনে করে পদ সেবায় রত হন সেখানে অন্যান্য দেবতা ও মানুষদিগের কোন প্রশ্নই তো উঠতে পারেনা !

আর স্বয়ং ভগবান যে সব ব্রাহ্মণের পদসেবা করতঃ নিজেকে ধন্য মনে করতেন তাঁদের পবিত্র রক্তই বংশানুক্রমিক ভাবে প্রবাহিত রয়েছে বর্তমানের ব্রাহ্মণদিগের শিরা ও ধমণীতে ; অতএব বর্তমানের ব্রাহ্মণেরাও সমভাবে পূজ্য ও সম্মানার্হ !

০ এই ভাবে পূর্ব-পুরুষদিগের রক্তের দাবীতে কিছুটা প্রতিষ্ঠা লাভের পরেই প্রত্যক্ষভাবে প্রচারণার কাজ শুরু করা হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কীয় তিনটি মাত্র শ্লোক বা মন্ত্রকে নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

ব্রাহ্মণ ঃ সম্ভবেনৈব দেবানামপি দৈবতম্
প্রমাণশ্চৈব লোকস্য ব্রহ্মাত্রৈব হি কারণম্।

—জন্মিবা মাত্রই ব্রাহ্মণ শুধু মনুষ্যদিগেরই নয়—দেবতাদিগেরও পূজ্য হইয়া থাকেন। তাঁহার কথা সকল লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, সুতরাং ব্রাহ্মণের উপদেশ বেদ-মূলক জানিবে।

—মনু সংহিতা ১১শ অঃ ৮৫ শ্লোক

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সত্যার্থ প্রকাশ"-এ পান্ডব গীতার বরাত দিয়ে লিখেছেন :

"ব্রহ্ম বাক্যং জনার্দনঃ"

অর্থাৎ— ব্রাহ্মণের মুখ হইতে যেকোন বাক্য নির্গত হউক না কেন তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবানের মুখ-নিসৃত বলিয়া জানিবে।

—সত্যার্থ প্রকাশ ৪৭৫ পৃঃ

ঈশঃ সর্বস্ব জগতো ব্রাহ্মণঃ বেদ-পারগাঃ।

অর্থাৎ—বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ মাত্রই সমগ্র জগতের ঈশ্বর,

—দেবী ভগবত।

বেদশাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন
ই হৈবঃ লোকত্তিষ্ঠাশ্চ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।।

—বেদ শাস্ত্রের অর্থ এবং তত্ত্ব অবগত আছেন এমন ব্রাহ্মণগণ যেখানেই থাকুন না কেন তাঁহারা ব্রহ্ম হইয়া যান।

—বায়ু পুরাণ ৩/৫

ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের দেহ
বেদে নিরূপণ
ব্রাহ্মণ কৃষ্ণেতে ভেদ
নাহি কদাচন।

—বঙ্গানুবাদ ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ

০ গুণ এবং যোগ্যতা অর্জনের পথে কতদূর অগ্রগতি সম্ভব হতো সেকথা বলা কঠিন। তবে এ পথে নিজদিগকে স্বয়ং ভগবানেরও উর্ধে বলে দাবী করতে ব্রাহ্মণগণ যে বিন্দু মাত্রও কুন্ঠিত হন নি তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ এখানে

পাওয়া যাচ্ছে।

তবে আকাশের ভগবান এবং মাটির মানুষ এ উভয়ের ব্যবধান যে দুস্তর এবং দুরতিক্রম্য তদানিন্তন ব্রাহ্মণদিগের সেকথা অজানা ছিলনা। তাই তাঁরা এসব মন্ত্রের সাহায্যে নিজেদের মর্যাদা যে কত উচ্চ—পরোক্ষভাবে জনমনে তেমন একটা ধারণা সৃষ্টিই করতে প্রয়াস পেয়ে ছিলেন।

জনমনের উপরে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যাদিগের মতো প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে হলে জনগণের আরো কাছে আসা এবং নিজেদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে জনগণের জন্য অপরিহার্য্য করে তোলা যে কতবেশী প্রয়োজনীয় ছিল সেকথা তদানিন্তন ব্রাহ্মণদিগের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। আর জানা ছিল বলেই তাঁরা বিশেষ বিজ্ঞতার সাথে মধ্যবর্তীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

০ এই পর্যায়ে তাঁরা নানাভাবে জনমনে এ ধারণাই বদ্ধমূল করে তুলতে চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণেরাই হলেন ভগবানের সর্বাধিক প্রিয়পাত্র এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত একমাত্র জাতি। তিনি তাঁর পবিত্র মুখ থেকে ব্রাহ্মণ জাতির সৃষ্টি এই কারণেই করেছেন যে, বিশ্ববাসীর মুখের কাজ অর্থাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের যত পূজা, প্রার্থনা, আবেদন-নিবেদন, কাকুতি-মিনতি প্রভৃতি সব কিছু ব্রাহ্মণদিগের মুখের দ্বারা বা তাদের মাধ্যমে সমাধা করতে হবে অন্যথায় ভগবানের কাছে তা গৃহীত হবে না।

এই মধ্যবর্তী ভূমিকা পালনের কথাটি বিশেষ ভাবে স্মৃতিতে জাগরূক রেখে আমাদিগকে পরবর্তী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

ভক্তির প্লাবন সৃষ্টিঃ

বৈদিক যুগের শুরুতে সর্বসাধারণ বিশেষ করে আর্য ঋষিদিগের মধ্যে আর্ত, অর্থার্থী এবং পরে জিজ্ঞাসার মানসিকতা সৃষ্টির কথা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতি পূর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে। এ ধরণের মানসিকতা সৃষ্টির কারণ সম্পর্কেও সেখানে বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে ভক্ত মানসিকতা সৃষ্টি সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। ভক্তির সীমাহীন প্লাবন কিভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি,

জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তার মোটামুটি বিবরণও সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বলে রাখা ভাল যে, ভক্তির প্লাবন বলতে আমরা এখানে অতিভক্তি, অন্ধ-ভক্তি, ভক্তির প্রহসন বা কপটতা প্রভৃতিকেই বোঝাতে চাচ্ছি।

একবার কোনও রূপে কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতিকে এই প্লাবনের শিকারে পরিণত করতে পারলে সে ব্যক্তি, সমাজ বা জাতির অবস্থা কত শোচনীয় হতে পারে তার বহু বাস্তব নিদর্শন আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে। কিন্তু অসুবিধা হলো যাঁরা এই প্লাবনে পতিত হন তাঁরা বাহ্যতঃ জ্ঞানী, গুণী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হওয়ার দাবীদার হলেও তাঁদের আসল অবস্থাটা যে কি তা অনুভব করার মতো শক্তি সামর্থই তাঁদের থাকে না।

আমাদের এই কথার জাজ্জল্যমান প্রমাণ লাভের জন্য সুধী পাঠকবর্গকে এই পুস্তকের "দেবদেবীদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধটিকে আর একবার গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

যাঁদের তেমন সুযোগ এবং ধৈর্য নেই তাঁদের উদ্দেশ্যে উক্ত নিবন্ধের কয়েকটি মাত্র বিবরণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরছি ঃ

০ উক্ত নিবন্ধের (১০৮ পৃঃ) কার্তিক বা কার্তিকেয়র পরিচয় থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে, মহাদেব পার্বতীর সঙ্গে সঙ্গম কার্যে নিরত থাকার সময়ে হঠাৎ কতিপয় দেবতা তথায় উপস্থিত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান। ফলে তাঁর বীর্য মাটিতে পতিত হয়।

পৃথিবী উক্ত বীর্য ধারণ করতে না পেরে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি থেকে তা শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। এই বীর্য থেকে কার্তিক বা কার্তিকেয় জন্ম লাভ করেন। এসময়ে কৃত্তিকাগণ তাঁকে লালন-পালন করেন বিধায় তার নাম হয়—কার্তিক বা কার্তিকেয়।"

মহাদেব যে সকল দেবতার সেরা তাঁর "মহাদেব" নামটিই সে প্রমাণ বহন করছে। তা ছাড়া তিনি অন্যতম ভগবানও। তাঁর মত একজন শ্রেষ্ঠতম দেবতা এবং অন্যতম ভগবান যে অকস্মাৎ কতিপয় দেবতা উপস্থিত হতে পারেন এমন স্থানে স্বীয় স্ত্রী বা অন্য কারো সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারেন না।—পারা যে সম্ভবই নয় সে কথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

তার পরে স্খলিত বীর্য মাটিতে পতিত হওয়ার পরে পৃথিবী তা কেন ধারণ করতে পারলোনা সে কথা বোধগম্য নয়। আর পৃথিবী যদি উক্ত বীর্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করেই থাকে তবে নিশ্চিত রূপেই তা পৃথিবীস্থ অগ্নিতেই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। অতএব বিবরণটি অস্পষ্ট, অবোধগম্য এবং সামঞ্জস্য বিহীন। আর উক্ত বীর্য যদি অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েই থাকে তবে স্বাভাবিক নিয়মেই তা ভষ্মীভূত হয়ে যাওয়ার কথা।

অগ্নি কর্তৃক ভষ্মীভূত না হয়ে তা যদি শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়েই থাকে, তা হলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, বীর্যের সাথে ডিম্বকোষের সংযোগ এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জরায়ুতে অবস্থান ছাড়া সন্তান উৎপাদন কি করে সম্ভব হতে পারে?

সম্ভব যে হতে পারে না বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই তা অস্বীকার করতে পারেন না। অথচ এ বিবরণকে সত্য ও অভ্রান্ত বলে পরম শ্রদ্ধার সাথে বিশ্বাস করা হয়েছে এবং আজও সে বিশ্বাসকে ঠিক তেমনি ভাবেই চালু রাখা হয়েছে। ভক্তির প্লাবন কি ভাবে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় এ থেকে তারই প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

o উক্ত নিবন্ধে (১০৯ পৃঃ) গণেশের পরিচয় দিতে গিয়ে দুই (২) চিহ্নিত অংশে যা বলা হয়েছে তার সারমর্ম হলোঃ "পুত্র গণেশকে দরওজায় পাহাড়া রেখে শিব ও পার্বতী (মহাদেব ও তদীয় পত্নী) সঙ্গমে রত হন। এমন সময়ে সেখানে ভগবান পরশুরামের আবির্ভাব ঘটে। তিনি গণেশের বাধা অগ্রাহ্য করতঃ শিবের সন্নিধানে যেতে উদ্যত হলে গণেশের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়।"

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, শিব মহাদেব তো দূরের কথা সামান্য শালীনতা বোধ রয়েছে এমন কোন অসভ্য ব্যক্তিও যে স্বীয় পুত্রকে পাহাড়ায় রেখে নিজের স্ত্রী বা অন্য কারো সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হতে পারে বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন কোন মানুষই এ কথা বিশ্বাস করতে পারে না।

তার পর পরশুরামের মতো একজন ভগবান (ভগবানের সপ্তম অবতার) এমন আকস্মিক ভাবে যথাযোগ্য অনুমতি ব্যতিরেকে এবং বাধা অমান্য করতঃ কারো বিশেষ করে শিব বা মহাদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে যাবেন সামান্য

বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও একথা বিশ্বাস করতে পারে না।

অথচ এক শ্রেণীর মানুষ এই কাহিনীকে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেছে এবং আজও করে চলেছে। বিশ্বাস যে করে চলছে তার প্রমাণ এক দন্ত বিশিষ্ট গণেশের মূর্তি।

উল্লেখ্য যে, দুর্গাপূজার সময়ে দুর্গামূর্তির পাশে গণেশের যে মূর্তি স্থাপন করা করা হয় আজও উক্ত মূর্তি নির্মাণের সময়ে একটি দাঁতই নির্মাণ করা হয়ে থাকে। অথচ দুটি দাঁত থাকার কথা।

দুটি দাঁত থাকার কথা এজন্যেই বলা হলো যে, শনি (গণেশের মাতুল)-এর দৃষ্টিতে গণেশের মুন্ডপাত হলে একটি হস্তী-মুন্ড কেটে এনে গণেশের কবন্ধের উপরে স্থাপন করা হয়। সেই থেকে গণেশ হস্তী-মুন্ড। হস্তীর দুটি দাঁত থাকার কারণে হস্তিমুন্ড গণেশেরও দুটি দাঁত থাকার কথা। দুটির পরিবর্তে একটি দাঁত নির্মাণের কারণ হলো—যারা এই মূর্তি নির্মাণ ও পূজা করেন তাঁরা আজও এই কাহিনী এবং পরশুরামের আঘাতে গণেশের দাঁত ভাঙ্গার কথা সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে চলেছেন।

o ভৃঙ্গী ও মহাকাল (১১২ পৃঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে "উভয়কে দুয়ারে পাহাড়া রেখে মহাদেব ও দুর্গা সংগমে লিপ্ত হন। সংগম শেষে স্খলিত বস্ত্র হস্তে ধারণ করতঃ দুর্গা বাইরে আসেন এবং ভৃঙ্গী ও মহাকালের নযরে পড়ে যান। ফলে তিনি উভয়কে অভিশাপ দেন যে তারা উভয়ে বানরের মুখাকৃতি নিয়ে মনুষ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করবে।"

প্রিয় পাঠকবর্গ! এবারেও ভেবে দেখুন যে সামান্য বিবেক-বুদ্ধি রয়েছে এমন কোন মানুষ এই কাহিনীকে সত্য, স্বাভাবিক, যুক্তি-গ্রাহ্য এবং বিশ্বাস-যোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারে কিনা।

o লক্ষ্মী (১০৯-১১১ পৃঃ)-এর ভিন্ন ভিন্ন যতগুলি পরিচয় উক্ত নিবন্ধে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে তার কোন একটিকেও কোন বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ সত্য, স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না—পারা সম্ভবই নয়! অথচ এই লক্ষ্মীই ঘরে ঘরে ধন ও সৌভাগ্যদাত্রী হিসেবে মহা ধুমধাম ও শ্রদ্ধা-ভক্তির সাথে সম্পূজিতা হয়ে চলেছেন।

০ স্বর্গের দেবতাদিগের রাজা ইন্দ্র। তিনি গৌতম মুণির শিষ্য ছিলেন। তিনি একদা গৌতম মুণির যুবতী স্ত্রী অহল্যাকে স্নান-সিক্ত আদ্রবস্ত্র পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পেয়ে কামাতুর হন এবং অহল্যার সতীত্ব নাশ করেন। পরে গৌতম মুণি এই ঘটনা জানতে পেরে অভিশাপ দিলে ইন্দ্রের দেহে সহস্র যোনির উদ্ভব ঘটে বলে বিভিন্ন পুরাণে বলা হয়েছে।

০ ভগবান নারায়ণ শঙ্খচুড়ের স্ত্রী তুলশীকে দেখে কামাসক্ত হন এবং তার সতীত্ব নাশ করেন। তুলশীর অভিশাপে ভগবানকে শিলায় পরিণত হতে হয়।

স্বর্গে দেবতাদিগের মনোরঞ্জনের জন্যে সৌন্দর্যের রাণী রতি এবং উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা প্রভৃতি স্বর্গবেশ্যারা সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন বলে বিভিন্ন পুরাণ ভাগবতাদি গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায়। ইন্দ্রের স্ত্রী শচী এবং নারায়ণের স্ত্রী লক্ষ্মীও পরমা সুন্দরী বলে প্রসিদ্ধি রয়েছে। বলাবাহুল্য, এমতাবস্থায় তারা যে এমন ইতর জনোচিত কাজ করতে পারেন সামান্য বিবেক-বুদ্ধি এবং শালীনতা বোধ রয়েছে এমন কোন মানুষই সে কথা বিশ্বাস করতে পারে না। অথচ এক শ্রেণীর মানুষ এসব কিছুকে সত্য এবং অভ্রান্ত বলে অতীতেও বিশ্বাস করেছে এবং আজও বিশ্বাস করে চলেছে।

ভক্তির প্লাবন কি ভাবে মনুষের বিবেক-বুদ্ধি, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং বিচার ও বিবেচনা শক্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে আশা করি এই কয়েকটি উদাহরণ থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে।

একটি পর্যালোচনা ঃ

"দেব-দেবী এবং দেবতা শব্দের তাৎপর্য" শীর্ষক নিবন্ধের শেষে "ব্যাকরণের মতে দেব ও দেবতার সংজ্ঞা" সম্পর্কীয় আলোচনা থেকে আমরা দেব-দেবী ও দেবতা শব্দের মোটামুটি তাৎপর্য বুঝতে পেরেছি। সেখানে ব্যাকরণের যে সূত্রটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হলো ঃ "দেবো দানাদ্ বা দীপনাদ্ বা দ্যোতমদ বা দ্যুস্থানো ভবতীবা।"

অর্থাৎ—যিনি দান করেন তিনি দেব, যিনি দীপ্ত বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা এবং যিনি দ্যুস্থানে থাকেন তিনিও দেবতা। এই হিসেবে সূর্য, চন্দ্র,

পবন, বরুণ প্রভৃতিরা সকলেই দেবতা। কেননা এঁরা যথাক্রমে বিশ্ববাসীকে তাপ, কিরণ, বায়ু এবং পানি দান করে চলেছে।

দীপ্ত বা দ্যোতিত হওয়ার কারণে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতিরাও দেবতা।

আর দ্যুস্থানে থাকার কারণে সূর্য, সবিতা, বিষ্ণু, মিত্র, পুষা প্রভৃতিরা যে দেবতা বেদের শ্লোক থেকেই সে তথ্য আমরা জানতে পেরেছি।

এ দিক দিয়ে বিচার-বিবেচনা করা হলে বৈদিক ঋষিদিগের দেবতা নির্বাচন ঠিকই হয়েছে বলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো ঃ পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থে দুর্গা, লক্ষ্মী, শনি, সুবচনী প্রভৃতি নামে যে শত শত দেবদেবীর নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে তাদের দেবতা হওয়া সম্পর্কে ব্যাকরণের কোন সূত্র আছে কি না ?

আমার জানা মতে তেমন কোন সূত্র নেই। তবে এ সম্পর্কে কতিপয় ধর্মগ্রন্থ এবং প্রখ্যাত পন্ডিত মন্ডলীর প্রায় সর্বসম্মত অভিমত হলো ঃ

বিশ্ব সৃষ্টির মূলে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটি গুণ বিদ্যমান। বিভিন্ন অভিধানে এই তিনটি গুণের যে পরিচয় লিখিত রয়েছে তার সার-সংক্ষেপ হলো ঃ

সত্ত্ব—প্রকৃতির তিন গুণের মধ্যে প্রধান গুণ। এই গুণ দ্বারা মানুষের মনে দয়া, ধর্ম, ন্যায়, সত্য, ভক্তি, মহত্ব ও পবিত্রতাদি সৃষ্টি হয়।

রজ— (রজস) ধুলা, পুষ্পরেণু, পরাগ, দ্বেষ, রাগ, অহংকারাদির কারণ গুণ।

তম— (তমস) তমোগুণ, মোহ, অন্ধকার, পাপ প্রভৃতি।

বলাবাহুল্য, বিশ্ব সৃষ্টির মতো এমন একটি বিরাট ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হওয়ার প্রয়োজন এখানে নেই। আমরা যথাক্রমে শুধু দেবতা, মানুষ এবং অসুর বা দৈত্য দানবাদি এই তিন শ্রেণীর মধ্যে উপরোক্ত গুণ ত্রয়ের কোনটি বা কোন্ কোনটির কি পরিমাণ রয়েছে সে কথা জানার চেষ্টা করবো।

উল্লেখিত ধর্মগ্রন্থ সমূহ এবং হিন্দু পন্ডিত মন্ডলীর এ সম্পর্কীয় অভিমত হলো ঃ

o একমাত্র দেবতাগণই সত্ত্বগুণের অধিকারী। অতএব তাঁদের দ্বারা সামান্যতম পাপও অনুষ্ঠিত হতে পারে না। অর্থাৎ পাপ প্রবণতা বলতে কোন কিছুর অস্তিত্বই তাদের মধ্যে নেই।

o মানুষ উপরোক্ত তিনটি গুণেরই অধিকারী। অতএব মানুষের দ্বারা শুধু পুণ্য, শুধু পাপ এবং পাপ পুণ্য উভয়টা-ই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

o অসুর বা দৈত্য-দানবদিগের মধ্যে একমাত্র তমঃ গুণ বিদ্যমান। অতএব শুধু পাপ কাজই তারা করতে পারে। অর্থাৎ দেবতাদিগের মধ্যে যেমন পাপ প্রবণতা বলতে কিছু নেই অসুর বা দৈত্য-দানবদিগের মধ্যেও তেমনি পুণ্য প্রবণতা বলতে কিছু নেই ; একটি অন্যটির বিপরীত।

বলাবাহুল্য, মানুষ বা দৈত্য-দানব এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তথাপি দেবতাদিগের মর্যাদা ও গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য তাদের প্রসঙ্গকে টেনে আনতে হলো।

এবারে আসুন, ব্যাকরণের সূত্র এবং ধর্ম গ্রন্থের আলোকে দেবতা বলতে কি বোঝায় নতুন করে সে কথা আবার ভেবে দেখি :

o যিনি দান করেন তিনি দেবতা।

o যিনি দীপ্ত বা দ্যোতিত হন তিনি দেবতা।

o যিনি দ্যুস্থানে (অন্তরীক্ষে) থাকেন তিনি দেবতা।

o যিনি বা যাঁরা একমাত্র সত্ত্বগুণের অধিকারী এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক—তিনি বা তাঁরা দেবতা।

এই পটভূমিতে বিচার করা হলে ইতি পূর্বে পুরাণ-ভাগবতাদির আলোকে দেবদেবীদিগের উদ্ভব, কার্যকলাপ ও চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তা থেকে অতীব দুঃখ এবং অপরিসীম বেদনার সাথে বলতে হয় যে, ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব থেকে শুরু করতঃ এমন একজন দেব-দেবীও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি দেবতা পদ-বাচ্য হতে পারেন।

অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব ও ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি প্রখ্যাত দেবতা বৃন্দের সকলেই পুরাণ ভাগবতাদির বর্ণনানুযায়ী চরিত্রহীন, নারীর সতীত্ব হরণকারী, অভিশপ্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছেন একথা ভাবতেও মন দুঃখ ও হতাশায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তের যে কোন একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তার একটি হলো : পুরাণ-ভাগবতাদির এসব বিবরণ যদি সত্য হয় তবে দেবদেবী বলে যাঁরা পরিচিত ও সম্পূজিত হয়ে আসছেন তাঁদের একজনও দেবদেবী পদবাচ্য হতে পারেন না।

আর এঁরা যদি প্রকৃতই দেব দেবী হন তাহলে পুরাণ, ভাগবতাদি গ্রন্থের বিবরণ সত্য হতে পারে না। বলাবাহুল্য, আমাদিগকে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটিকেই গ্রহণ করতে হয়। কেন না ভগবান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব এবং ইন্দ্র বরুণাদি প্রখ্যাত দেবতাবৃন্দ উচ্ছৃংখল, চরিত্রহীন, নারীর সতীত্ব হরণকারী প্রভৃতি হতে পারেন কোন ক্রমেই এ কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারি না।

তবে অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, আমরা বা অন্য কেউ বিশ্বাস করতে না পারলেও অন্ততঃ এদেশে বিশ্বাস করার লোক যথেষ্টই রয়েছেন এবং তাঁদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী বলে সুপরিচিত লোকদিগের সংখ্যাও মোটেই কম নয়।

"অন্য কেউ" এবং "এ দেশে" বলার কারণ হলো : অতীতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষই সেই সব দেশের দেবদেবীদিগের এমনি ধরণের অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, প্রকৃত সত্যের বিপরীত এবং অশালীন জন্ম বৃত্তান্ত ও চরিত কথায় বিশ্বাস পোষণ করতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে তাঁরা সেই বিশ্বাস থেকে মুক্তি লাভ করেছেন। এই দেশের এক শ্রেণীর মানুষ আজও তা পারেন নি এই যা তফাৎ।

সে যা হোক, এই আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেবদেবীদিগের সম্পর্কে ব্যাকরণের সূত্র, বিশ্বস্ত ধর্ম গ্রন্থসমূহ, প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ এবং মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধির রায় একটি-ই। আর তা হলো —দেব-দেবীরা অর্থাৎ—প্রকৃতই যাঁরা দেবদেবী তাঁরা সকলেই সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট এবং নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক।

বলাবাহুল্য, যারা আসল বা প্রকৃত দেব-দেবী নয় তাদের কথা স্বতন্ত্র এবং আমাদের কথিত দেবদেবীদিগের সাথে তাদের সামান্যতম সম্পর্কও নেই—থাকতে পারে না।

এখানে কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন যে, যারা দেবদেবীই নয় তাদের

আবির্ভাব ঘটলো কি করে আর কিভাবেই বা তারা আসল দেবদেবীদিগের শামিল হতে পারলো ?

পরবর্তী আলোচনায় সুযোগ বুঝে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া হবে। এখানে অন্য যে প্রশ্নটির উত্তর দেয়া খুবই প্রয়োজন তা হলো—ব্যাকরণের সূত্র, বিশুদ্ধ ধর্ম গ্রন্থসমূহ। প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ এবং মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধি যেখানে দেবদেবীদিগকে সত্ত্ব গুণ বিশিষ্ট এবং নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক বলে সুস্পষ্ট রায় দেয় সেখানে পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থে পাইকারী ভাবে সকল দেবদেবীর জন্ম, জীবন যাত্রা, আকৃতি-প্রকৃতি, কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে এমন অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য এবং প্রকৃত সত্যের বিরোধী কাহিনীসমূহ কিভাবে স্থান পেলো ? আর এই স্থান দানের কাজটা সাধিত হয়েছে কার বা কাদের দ্বারা ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ এবং সরল। কেননা বর্ণ-ব্যবস্থা শুরু হওয়া থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত হাজার হাজার বৎসর ধর্মীয় গ্রন্থসমূহের প্রণয়ন, সংরক্ষণ এবং ধর্মীয় কার্যকলাপের পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে ব্রাহ্মণদিগের উপরই অর্পিত হয়েছিল। এতে অন্য কারো নাক গলানোর সামান্যতম অধিকারও যে ছিল না এই আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে।

বেদ ও উপনিষদের মতে দেবতার সংখ্যা যে মাত্র তেত্রিশ জন, "বেদের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে তার নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণাদি আমরা পেয়েছি। পরবর্তী সময়ে পুরাণের মাধ্যমে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ দেব-দেবীদিগের সংখ্যা যে তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে "পুরাণের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে সে কথাও আমাদের জানা হয়েছে।

এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই সব দেবদেবীদিগের জন্ম, আকৃতি-প্রকৃতি, জীবন যাত্রা প্রভৃতি সম্পর্কে অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অশালীন এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিরোধী কাহিনীর রচনা ও প্রচারণা যে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

এখানে পুনরায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, দেবদেবী দিগের এরূপ অদ্ভুত, অযৌক্তিক, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত জন্ম বৃত্তান্ত এবং অশালীন ও অবিশ্বাস্য

কার্যকলাপের বিবরণ পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থের প্রণেতা ব্রাহ্মণগণ কিভাবে ও কোন্ সূত্রে থেকে সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলিকে উপরোক্ত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে সংরক্ষিত করারই বা কি প্রয়োজন ছিল ?

"পুরাণের প্রণেতা বা প্রণেতা দিগের পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধে এই সূত্র সমূহের কথা বলা হয়েছে। এই সূত্র সমূহ যে ভীষণ ভাবে দুর্বল এবং নির্ভরযোগ্য নয় তথ্য-প্রমাণাদি সহকারে সে কথা সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এখানে আবার নতুন করে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

তবে এই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত এবং শালীনতা বিবর্জিত কাহিনী সমূহকে কেন ধর্ম গ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়েছিল সেই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন।

পূর্ববর্তী আলোচনার মধ্যেই এই প্রশ্নের অনেকখানি উত্তর নিহীত রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : আলোচ্য সময়ে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তথা বাহুবল ও ধনবলে প্রভূত শক্তিশালী এবং সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত দুটি জাতির মোকাবিলায় নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে লিপ্ত ছিলেন।

সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে এজন্য নিজেদের চরিত্রবল বা নৈতিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করাই ছিল উদ্দেশ্য সাধনের সুপরীক্ষিত একমাত্র পথ। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সে পথে না গিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছিলেন।

এই পথে চলতে গিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁরা জনমনে এই বিশ্বাসকেই বদ্ধমূল করে তুলতে চেয়েছিলেন যে, ব্রাহ্মণগণই ভগবানের একমাত্র প্রিয় পাত্র এবং তাঁদিগকেই তিনি শ্রেষ্ঠতম জাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

এমন কি জন্মমাত্রই ব্রাহ্মণগণ শুধু যে দেবতা মন্ডলীই নয় বরং স্বয়ং ভগবানেরও পূজ্য হয়ে থাকেন ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি সহকারে সে তথ্যও সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

এখানে বিশেষ ভাবে প্রণিধান যোগ্য যে, স্বৈরাচারী শক্তি সমূহ চিরদিনই উপর থেকে শক্তিবলে জনগনের উপরে স্বীয় প্রভুত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে থাকে। জনগনের মনের সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক থাকে না; শক্তি, মদ-মত্ততার জন্য তেমন প্রয়োজনও তারা অনুভব করেন না। বলাবাহুল্য, আমাদের কথিত বাহুবল এবং ধন-বলের অধিকারী তথা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও

সে প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণগণ নিজদিগকে অলৌকিক ও অতিমানবিক শক্তির অধিকারী, ভগবান ও দেবদেবী বৃন্দের একমাত্র প্রিয় ও পূজ্য, ভগবান ও দেবদেবীবৃন্দ এবং সাধারণ মানুষদিগের মধ্যে একমাত্র সেতুবন্ধ হিসেবে উপস্থাপিত করতঃ জনগণের মনের গহীনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিলেন।

এই কাজের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা সাধারণ মানুষদিগের মন মগজে এমন একটা ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পান যে, মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয়, বিপদ-আপদ, মুক্তি-কল্যাণ, জরা-ব্যাধি, নিরাময়-নিরাপত্তা প্রভৃতি এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকাদি এক একটি অশরীরি শক্তি বা দেব-দেবীর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির উপরেই একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর একমাত্র ব্রাহ্মণগণই এই দেবদেবীদিগের পরিচয় এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধান ও ক্রোধ প্রশমনের পথ-পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণাদি সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

তা ছাড়া জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভগবান এবং দেবদেবীদিগের উদ্দেশ্যে যাবতীয় আবেদন-নিবেদন ও পূজা-প্রার্থনাদি অনুষ্ঠানের যোগ্যতা এবং অধিকারও যে একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই রয়েছে এমন একটা ধারণাও জনমনে সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা তাঁরা নানাভাবে করেছিলেন বলে প্রমাণ রয়েছে।

নিজেদের প্রাধান্য, যোগ্যতা ও অলৌকিক-অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হওয়া এবং ভগবান ও দেবদেবীদিগের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক থাকার কথা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই যে, ব্রাহ্মণগণ ভগবান ও দেবদেবীদিগের জন্ম, জীবন যাত্রা এবং কার্যকলাপাদি সম্পর্কে এসব অদ্ভুত ও চমকপ্রদ কাহিনী রচনা করেছিলেন একটু অভিনিবেশ সহকারে পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ করলেই সে কথা বুঝতে পারা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ নিজ পুত্র গনেশ এবং অনুচর ভৃঙ্গী ও মহাকালকে দরওয়াজায় পাহাড়া রেখে ভগবান মহাদেব কর্তৃক তদীয় পত্নী দুর্গা বা পার্বতীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হওয়া, অকস্মাৎ সেখানে ভগবান পরশুরাম ও কতিপয় দেবতার উপস্থিতি এবং সঙ্গম শেষে স্খলিত বস্ত্র হস্তে ধারণ করতঃ উলঙ্গ

অথবা অর্ধোলঙ্গ অবস্থায় বাইরে এসে পার্বতীর ভৃঙ্গী ও মহাকালের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার বিবরণ সমূহকে স্মরণ করা যেতে পারে।

এহেন ঘটনা যে, আদৌ সত্য এবং বিশ্বাস যোগ্য হতে পারে না সে কথা বলাই বাহুল্য। তথাপি এই ঘটনাকে সত্য বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, নিঃসন্দেহে ঘটনাটি ছিল অতীব গোপনীয় এবং লজ্জাজনক, কোন তৃতীয় পক্ষের সেখানে উপস্থিতি সম্ভবই ছিল না। তা ছাড়া ঘটনাটি ঘটেছিল সুদূরের সেই কৈলাশ পর্বত বা স্বর্গলোকে অবস্থিত মহাদেবের নিজস্ব পুরীর নিভৃত কক্ষে।

মর্তের ব্রাহ্মণগণ যে, সুদূরের সেই কৈলাশ পর্বত অথবা স্বর্গলোকে অবস্থিত সেই নিভৃত কক্ষটিরও খবর রাখেন একথা প্রমাণ করাই যে এই কাহিনী রচনার উদ্দেশ্য সে কথা বুঝতে অনেক বিদ্যা-বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসে ব্রাহ্মণদিগের এই কার্যকলাপের সমর্থন রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন এমন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, সুদূর অতীতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এমন একটা ধারণা গড়ে উঠেছিল অথবা গড়ে তোলা হয়েছিল যে ধর্ম বলতেই অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও চমকপ্রদ কার্যকলাপকে বোঝায়। অর্থাৎ যা অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং চমক-প্রদ নয় তা ধর্মই হতে পারে না।

অনুরূপ ভাবে ভগবান, দেবদেবী, মহাপুরুষ প্রভৃতি সম্পর্কেও এই একই ধারণা গড়ে তোলা হয়ে ছিল। অর্থাৎ—ভগবান, দেবদেবী এবং মহাপুরুষ হতে হলে তাদের জন্ম, জীবন যাত্রা, কার্যকলাপ প্রভৃতি অতি অবশ্যই অদ্ভুত, অলৌকিক, অস্বাভাবিক এবং চমকপ্রদ হতে হবে। আর যিনি বা যার জন্ম, জীবন যাত্রা ও কার্যকলাপাদি যত বেশী অদ্ভুত, যত বেশী অলৌকিক, যত বেশী অস্বাভাবিক এবং যত বেশী চমকপ্রদ তিনি তত বড় ভগবান, তত বড় দেবতা এবং তত বড় মহাপুরুষ।

এতদ্বারা তদানিন্তন কালের ব্রাহ্মণদিগের গৃহীত কর্ম পন্থার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। পরবর্তী নিবন্ধে তৃতীয় পর্যায় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

এই প্রসঙ্গে উপসংহারে ব্রাহ্মণগণ কেন দেবদেবী সংক্রান্ত এসব অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনীকে ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন সেই প্রশ্নটির উত্তর দেয়া যাচ্ছে ঃ

পূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে একথা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, সেই বর্ণ-ব্যবস্থার শুরু থেকে বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ-অনুশীলন এমন কি স্পর্শ করণও শূদ্রদিগের জন্য সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ এবং ভীষণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছিল। জাতিভেদ প্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদিগের বেলায়ও সেই একই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

বলাবাহুল্য, এতদ্বারা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম সম্পর্কীয় স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

এই শূন্যতার অবসান ঘটানো এবং ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ধর্ম এবং দেবদেবী সম্পর্কীত যে সব কাহিনী ও বিধি-বিধান রচিত হয়ে চলেছিল সেগুলি যে সত্য, অভ্রান্ত এবং স্বয়ং ভগবানেরই মুখনিসৃত তার প্রত্যক্ষ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ওগুলিকে পুরাণ-ভাগবতাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত করণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের পঠনীয় ও শ্রবণীয় বলে ঘোষণা করা হয়। শুধু তা-ই নয়—তাদের জন্যে এসব গ্রন্থের পঠন ও শ্রবণকে মহাপুণ্যজনক, পাপক্ষয়-কারী এবং পারত্রিক কল্যাণের উপায় হিসেবেও বর্ণনা করা হয়।

এই ভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সমাধা করার পরে তাঁরা তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করেন। আর এই তৃতীয় পর্যায়ের কাজটিই ছিল মূর্তি পূজার উদ্ভাবন ও প্রচলন। পরবর্তী নিবন্ধে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলন ঃ

মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলনের প্রশ্নে তদানিন্তন ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভিন্ন ভিন্ন এই তিনটি দলের একটি ছিল দেবদেবীদিগের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের ঘোর পক্ষপাতি। অন্য দলটি ছিল একাজের ঘোর বিরোধী।

তৃতীয় দলটি ছিল বিশেষ শর্তসাপেক্ষে মূর্তিপূজা প্রচলনের সমর্থক।

প্রথমোক্ত দলটি যে তৃতীয় দলটির যুক্তির সারবত্তা ও গুরুত্বকে উপলব্ধি করতঃ তাদের আরোপিত শর্তকে মেনে নিয়ে মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের কাজে হাত দিয়েছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথমোক্ত দলটি যেসব যুক্তির ভিত্তিতে দেবদেবীদিগের মূর্তি নির্মাণ ও পূজা প্রচলনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলভুক্তগণ নিজ নিজ মতের সমর্থনে যেসব যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন সেগুলিকে পরবর্তী নিবন্ধে 'অভিমত' উপ-শিরোনাম দিয়ে তুলে ধরা হবে। পরিশেষে তৃতীয় দলটির আরোপিত শর্ত এবং তার পরিণতির কথা আমরা তুলে ধরবো।

আমরা জানি, মানুষের কোন কাজই উদ্দেশ্যবিহীন নয়। এমতাবস্থায় মূর্তির উদ্ভাবন ও পূজা প্রচলনের মতো এমন একটি ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী অথচ অভিনব ও বিরাট ঝুঁকি পূর্ণ কাজ যে উদ্দেশ্য বিহীন হতে পারেনা সে কথা বলাই বাহুল্য।

অতএব সে উদ্দেশ্যটা কি তা অবশ্যই আমাদিগকে জেনে নিতে হবে। কেননা অন্যথায় প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনের আমাদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এই উদ্দেশ্যের কথা জানতে হলে ব্রাহ্মণদিগের বেছে নেয়া পথের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের কথা বিশেষ ভাবে আমাদিগকে মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে সেই পথেরই তৃতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা আলোচনায় ব্রতী হচ্ছি আর এই পর্যায়গুলি একটি থেকে অন্যটি বিচ্ছিন্ন বা পৃথক নয়।

আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

ক) তদানিন্তন ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য তথা প্রবল পরাক্রান্ত এবং সমাজের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাজা-মহারাজা প্রভৃতি এবং প্রভূত অর্থশালী ধনিক-বনিকদিগের মোকাবিলায় সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

উপরোক্ত শক্তিদ্বয় স্বাভাবিক নিয়মেই উপর থেকে জোর করে সমাজের বুকে চেপে বসে ছিল; জনগণের মনের সাথে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না এবং শক্তির দাপটে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনও তারা বোধ করে নি।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণ রক্ত, বংশ, ধার্মিকতা, অলৌকিকত্ব, অতিমানবিকত্ব প্রভৃতির দাবীতে জনগণের মনের গহীনে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

খ) ব্রাহ্মণগণ নিজদিগকে ভগবান, দেবদেবীবৃন্দ ও সাধারণ মানুষদিগের মধ্যবর্তী এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী একক ও অপরিহার্য সত্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টাও নানা ভাবে চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

গ) মানুষ সৃষ্টির সেরাজীব হলেও মানুষকেই গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক দুর্বল, সর্বাধিক অসহায় এবং সর্বাধিক পরমুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশ্য এর বিশেষ কারণও রয়েছে। তবে সে বিষয় এখানে আমাদের আলোচ্য নয়।

ব্রাহ্মণগণ যে মানুষের এই দুর্বলতা, অসহায়তা এবং পর-মুখাপেক্ষীতাকে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেটাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ঘ) এই সুযোগ গ্রহণ করতঃ ব্রাহ্মণগণ মানুষের প্রতিটি প্রয়োজনের পশ্চাতে কোন না কোন দেব বা দেবীর কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকার যুক্তি দেখিয়ে দেবদেবীদিগের সংখ্যা তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ কোটিতে উন্নীত করেছিলেন।

ঙ) এই দেবদেবীদিগের সন্তুষ্টি বা ক্রোধের কারণেই যে মানুষের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, পাওয়া-না পাওয়া, সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতি এবং যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক সংঘটিত হয়ে থাকে আর ভগবান এবং এইসব দেবদেবীদিগের সন্তুষ্টি-বিধান ও ক্রোধ প্রশমনের যোগ্যতা এবং অধিকার যে একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই রয়েছে সর্বসাধারণের মন-মগজে এই বিশ্বাস গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও তারা সর্বপ্রযত্নে চালিয়ে গিয়েছিলেন।

মোটামুটি ভাবে এটাই হলো প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্রাহ্মণদিগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। তাঁদের এই কার্যকলাপকে

বিধি-সম্মত বলে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা স্বয়ং ভগবানের নামে এবং শাস্ত্রের ভাষায় যেসব ঘোষণা বাণী প্রচার করেছিলেন পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার দুটি মাত্রকে নিম্নে বঙ্গানুবাদসহ হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

দৈবাধীনং জগৎ সর্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ।
তেমন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনাস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ দৈবতম্ ।।

অর্থাৎ—সমস্ত জগত দেবতাদিগের অধীন; সমস্ত দেবতা মন্ত্রের অধীন; মন্ত্র সমূহ ব্রাহ্মণদিগের অধীন ; অতএব, ব্রাহ্মণগণই সর্বোত্তম দেবতা এবং অন্য সব দেবতাই তাঁদের অধীন।

—স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বিরচিত "সত্যার্থ প্রকাশ" ৬০১ পৃঃ দ্রঃ

আমাদের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় ঘোষণাটি হলো ঃ

গুরুর্ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম 'তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ।।

অর্থাৎ—গুরু (ব্রাহ্মণ)-ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, গুরুই পরম ব্রহ্ম ; অতএব গুরুই একমাত্র নমস্য বা নমস্কারের যোগ্য।

—"গুরু গীতা" গুরু মাহাত্ম দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এইভাবে শাস্ত্রের ভাষায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এমন কি পরম ব্রহ্মের আসন অধিকার করেও ব্রাহ্মণগণ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন না। কারণ এগুলি সবই ছিল উপদেশ বা মুখের ভাষণ এবং শাস্ত্রের বচন।

নিজেদের বিদ্যমানতাকে জনসাধারণের কাছে একান্তরূপে অপরিহার্য করে তুলতে হলে কিছু বাস্তব ও স্থায়ী কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন।

বলাবাহুল্য, সেই বাস্তব ও স্থায়ী কর্মপন্থার একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধানটিই হলো—মূর্তিপূজার প্রচলন। অবশ্য বোধগম্য কারণেই মূর্তিপূজা প্রচলনের এই কারণটিকে ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করেন নি। তাঁরা মূর্তিপূজা প্রচলনের যেসব কারণের কথা বলেছেন তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে অতঃপর নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা হবে।

তবে এই কারণ সমূহকে তুলে ধরার পূর্বে মূর্তিপূজাকে কেন 'বাস্তব এবং স্থায়ী কর্মপন্থা" বলা হলো সে সম্পর্কে দুকথা বলার প্রয়োজন বোধ করছি।

বৈদিক যুগ থেকে আলোচ্য সময় পর্যন্ত যাগ-যজ্ঞ, হোম-তর্পণ, দান-ধ্যান এবং বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে বলি ও আহুতি প্রদানের কাজই প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে চালু ছিল।

দেশের রাজা-মহারাজা ও ধনিক-বনিকেরা এতকাল নানা উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থব্যয়ে এবং মহা ধুমধামের সাথে গোমেধ, অশ্বমেধ, নরমেধ, রাজসূয়, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞের আয়োজন করে এসেছেন; সাধারণ মানুষদিগের এতে অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ এবং অধিকার ছিল না, শুধু তা-ই নয় এতে অংশ গ্রহণই তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিল।

অথচ সাধারণ মানুষদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভই ছিল এ সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিজ্ঞ মহলের অনেকেই মনে করেন যে সেই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই সাধারণ মানুষদিগকে এতকাল পরে ধর্ম-কর্মে টেনে আনা হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটানো হচ্ছিল।

এই পটভূমিকার পরে মূর্তিপূজা প্রচলনের পক্ষে যে, সব যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছিল তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে পৃথক পৃথক ভাবে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে:

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অসীম এবং অনন্ত আর মানুষ হলো সসীম ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী। এমতাবস্থায় অসীম অনন্তকে ধারণা করা তাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এই সমস্যার একটি মাত্র সমাধানই রয়েছে। আর তা হলো: তাঁর একটা প্রতীক বা প্রতিকৃতি গড়ে তোলা। যার মাধ্যমে মানুষ তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হতে সক্ষম হয় এবং তাঁকে একান্ত কাছে ও একান্ত আপনজন রূপে পেয়ে প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের মনের আকুতি নিবেদন করতে পারে।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বিশ্বব্যাপী বিরাজিত রয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর সম্পর্কে কোন ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। অথচ মানুষ তাঁকে অতি নিকটে এবং একান্ত আপনজন রূপে পেতে চায়। অতএব বিশ্বব্যাপী বিরাজিত অসীম অনন্ত সত্তাকে সীমার মধ্যে টেনে এনে মানুষের একান্ত কাছে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণের মাধ্যমেই একাজকে সহজ ও সম্ভব করে তোলা যেতে পারে।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অনন্ত শক্তির অধীকারী। অথচ বাহন ব্যতীত

শক্তি পরিদৃশ্যমান ও মানুষের বোধগম্য হতে পারে না। প্রতীক বা মূর্তিই সেই অনন্ত মহাশক্তির বাহন। এই বাহনের পূজা করা হলেই তাঁর পূজা করা হয়।

০ পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। এমতাবস্থায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রতীক, মূর্তি বা যা কিছুরই পূজা করা হোক না কেন এটা যে তাঁরই পূজা তা অবশ্যই তিনি বুঝতে পারেন। এদিক দিয়ে মূর্তি গড়াই প্রকৃষ্ট উপায়।

০ দেবদেবীগণ সেই অনন্ত মহাশক্তিরই অংশ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ। অথচ সেই অনন্ত মহাশক্তি এবং দেবদেবীগণ চিন্ময়; সুতরাং চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নন, যা চর্মচক্ষে অপরিদৃশ্যমান তাকে ধারণা করা যায় না। আর যাকে ধারণা করা যায় না তাঁর পূজা এবং তাঁর উদ্দেশ্যে আবেদন-নিবেদনও সম্ভব হতে পারে না। মৃন্ময় মূর্তির মাধ্যমে সেই চিন্ময়কে চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান করে তোলা সম্ভব। আর মৃন্ময় মূর্তির পূজা আসলে যে সেই চিন্ময়েরই পূজা সেকথা বলাই বাহুল্য।

০ সিদ্ধ পুরুষগণ ঈশ্বর বা ভগবানের নিকট থেকে সরাসরিভাবে অথবা ধ্যান যোগে কিংবা দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেবদেবীদিগের অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত এবং কার্যকলাপাদি সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন।

সাধারণ মানুষদিগের পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। সিদ্ধ পুরুষদিগের মাধ্যমে লব্ধ পরিচয় অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি গড়াকেই এই সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্ট উপায় হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তাছাড়া পূজার এক পর্যায়ে ব্রাহ্মণগণ সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীকে আহ্বান জানান এবং মন্ত্রের সাহায্যে মূর্তির মধ্যে তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ঐ মূর্তির মধ্যে সংশ্লিষ্ট দেব বা দেবীর আবির্ভাব ঘটে। পূজার পরে মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের তিরোভাব ঘটানো হয়ে থাকে।

অতএব মূর্তি নির্মাণই চিন্ময় ও অদ্ভুত অলৌকিক-দেবদেবীদিগের পূজানুষ্ঠান ও সন্তুষ্টি বিধানের একমাত্র উপায়।

অভিমত:

পূর্ববর্তী নিবন্ধে উল্লেখিত দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ যাঁরা মূর্তিপূজার

ঘোর বিরোধী ছিলেন তাঁরা তাঁদের এই বিরোধীতার যেসব কারণের কথা বলেছিলেন আমরা প্রথমে তার উল্লেখযোগ্য কতিপয়কে নিম্নে পৃথক পৃথকভাবে তুলে ধরবো।

তাঁদের এই বিরোধীতার অনুকূলে তাঁরা যেসব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন পরে একে একে তার কতিপয়কে তুলে ধরা হবে। পরিশেষে কতিপয় চিন্তাশীল মণীষীর এ সম্পর্কীয় অভিমতকে আমরা তুলে ধরবো।

o সেই অনন্ত পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতএব মানুষের দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, ভুলত্রুটি-প্রবণতা প্রভৃতির কথা অবশ্যই তিনি পরিজ্ঞাত রয়েছেন।

তিনি অসীম অনন্ত বিধায় তাঁকে সম্যকরূপে জানা বা ধারণা করা যে মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয় সে কথাও অবশ্যই তাঁর জানা রয়েছে।

সকল মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি যে সমান নয় এবং মানুষ যে তাদের নিজ নিজ সাধ্যশক্তি অনুযায়ীই তাঁকে জানবে আর এটাই যে স্বাভাবিক সে কথাও অবশ্যই তাঁর জানা রয়েছে।

যেহেতু তাঁকে সম্যকরূপে জানার সাধ্যশক্তিই তিনি মানুষকে দেন নি অতএব সম্যকরূপে জানার দাবীও তিনি করতে পারেন না। আর যেখানে সম্যকরূপে জানা সম্ভবই নয় সেখানে প্রতীক-মূর্তি বা পুতুল-প্রতিমা প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই তা সম্ভব হতে পারে না।

এমতাবস্থায় প্রতীক, মূর্তি বা পুতুল-প্রতিমা নির্মাণ যে শুধু পন্ড শ্রমই নয়—ধৃষ্টতারও শামিল সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

o পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেয়া এইসব যোগ্যতার দ্বারা মানুষ এই বিরাট সৃষ্টি রহস্য দেখতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। ফলে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁর বিরাটত্ব, সৃষ্টি-নৈপুণ্য, সংরক্ষকত্ব ও পরিচালনা-শক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে তারা একটা ধারণায় উপনীত হয়ে থাকে।

অন্য কথায় যেখানে নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী তাঁকে জানা ও উপলব্ধি করার জন্য গোটা বিশ্বটাই মানুষের চোখের সম্মুখে স্বয়ং তিনিই প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন সেখানে নতুন করে প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণকে একটা বিরাট প্রহসন ও অনধিকার চর্চা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারেনা।

o পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশ্রোতা এবং সর্বস্রষ্টা। মানুষের অন্তরের খবরও তিনি পরিজ্ঞাত রয়েছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যেখানে, যে অবস্থায়, যেভাবে এবং যে কোন ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্যে প্রাণের আকুতি নিবেদন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করুক সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা জানতে ও দেখতে পারেন এবং এটাই স্বাভাবিক। এমন কি কারো অন্তরের অন্তস্থলেও যদি তাঁর প্রতি প্রেম-ভক্তি ও ভালবাসা লুকানো থাকে তা-ও তাঁর অপরিজ্ঞাত নয়।

এমতাবস্থায় তাঁকে ডাকা, প্রেম-ভক্তি প্রদর্শন করা বা প্রাণের আকুতি নিবেদন করার জন্য প্রতীক বা মূর্তি নির্মাণের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। বরং এদিয়ে তাঁর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বশ্রোতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকেই ব্যঙ্গ করা হয়।

o পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এবং দেবদেবীরা চিন্ময় বা চৈতন্য স্বরূপ। যেহেতু তাঁরা কেউ স্থূল-দেহী নন অতএব তাঁদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্ষয়-ক্ষতি, অভাব-অভিযোগ প্রভৃতি থাকতে পারে না—থাকা সম্ভবই নয়।

অথচ ব্রাহ্মণগণ মূর্তি স্থাপন করতঃ সেই মূর্তির সম্মুখে তাঁরই উদ্দেশ্যে ভোগ-নৈবেদ্যাদির আকারে লোভনীয় খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি পরিবেশন ও নিবেদন করে থাকেন।

এতদ্বারা বিশ্ববাসীর কাছে তাঁকে ভোগ-বিলাসী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর এবং পরমুখাপেক্ষী রূপেই তুলে ধরা হয়ে থাকে। এটা শুধু যে ধৃষ্টতা-ই নয় অতি জঘন্য পাপও সেকথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা। প্রতীক বা মূর্তি-পূজাই যে এই ধৃষ্টতা এবং পাপের মূল সে কথাও খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না।

o দেবদেবীরা যে ব্রাহ্মণদিগের কল্পনা-প্রসূত এবং তাদের প্রায় সকলকেই লম্পট, চরিত্রহীন, পরস্ত্রীর সতীত্ব নষ্টকারী প্রভৃতি রূপে চিত্রিত করা যে পুরাণ প্রণেতা ব্রাহ্মণদিগেরই বিকৃত রুচির পরিচায়ক সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না।

পূজার সময়ে দেবদেবীদিগের উদ্দেশ্যে পাদ্য, অর্ঘ, ভোগ, পানীয়, আচমণীয়, তাম্বুল প্রভৃতি নিবেদনের ব্যবস্থা অতীব হাস্যকর।

কেননা দাবী করা হয়ে থাকে যে, দেবদেবীরা সকলেই চিন্ময়। চিন্ময়-

দিগকে পদব্রজে পূজকের বাড়ীতে বা অন্য কোথায় যেতে হয় না। অতএব তাঁদের উদ্দেশ্যে পাদ্য (পা-ধোয়ার জল) নিবেদনেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না।

তা ছাড়া ব্রাহ্মণদিগের দাবী এবং পুরাণ-ভাগবতাদির বর্ণনানুযায়ী প্রতিটি দেবদেবীরই গরু, ঘোড়া, হাঁস, ইঁদুর, গাধা, কুকুর, ময়ূর, সাপ, সিংহ প্রভৃতি কোন না কোন বাহন রয়েছে। তাঁরা যদি বাহনে চড়েই আসেন তা হলেও পাদ্য বা পা-ধোয়ার জল সরবরাহের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

অতএব দেবদেবীদিগের উদ্দেশ্যে পাদ্য নিবেদনকে একটা বিরাট অজ্ঞতা এবং খামখেয়ালী ছাড়া কিছুই বলা যেতে পারে না। তার পরে ভোগ (খাদ্য), পানীয়, (খাবার জল), আচমণীয় (মুখ ধোয়ার জল), তাম্বুল (পান-সুপারী) প্রভৃতি নিবেদনকেও একটা বিরাট তামাসা ছাড়া আর কিছু বলার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না।

মূর্তিপূজা প্রবর্তকদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত ছিল যে দেবদেবীরা সকলেই স্বর্গলোকের অধিবাসী, সেখানে পান-সুপারী হয় না সুতরাং পান-সুপারী খাওয়ার অভ্যাসও তাঁদের গড়ে উঠতে পারেনা। দেবদেবীরা যদি বাংলাদেশ বা আর্যাবর্তের অধিবাসী হতেন তা হলেও অগত্যা ধরে নেয়া যেতো যে তাঁরা পান-সুপারীতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন।

মূর্তিপূজার প্রবর্তক ব্রাহ্মণগণ মূর্তিপূজার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য সাধারণ মানুষদিগের মন মগজে অন্য যে বিশেষ ধারণাটি বদ্ধমূল করে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন তা হলো ঃ

ঈশ্বর এত বিরাট এবং এত উর্ধলোকে অবস্থিত যে শত চেষ্টা করেও তাঁর নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষদিগের পক্ষে সম্ভব হতে পারেনা।

বিভিন্ন দেবদেবী, মুণি মহাপুরুষ, গুরু-পুরোহিত প্রভৃতরা কেউবা ঈশ্বরের স্ত্রী, কেউবা পুত্র, কেউবা প্রিয় পাত্র প্রভৃতি। পূজার্চনা, ভোগ, দান, নামকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে এঁদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারলে এঁরাই ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করতঃ এইসব পূজকদিগের বিপদাপদ ও ইহ-পরকালের মুক্তি ও মঙ্গলের ব্যবস্থা করে দেবেন।

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ মূর্তিপূজা বিরোধীদিগের বক্তব্য এই ছিল যে, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী নিরপেক্ষ এবং অসীম করুণাময়। অতএব তাঁর কাছে সুপারিশ বা মধ্যস্থতা করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা এবং তেমন কোন সুযোগও থাকতে পারেনা।

বলা বাহুল্য, মূর্তিপূজার সমর্থক ব্রাহ্মণদিগের এসব কার্যকলাপকে বর্বর যুগীয় চিন্তার ফসল ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। আর মূর্তিপূজা প্রচলনের ফলেই যে এ ধরণের কার্যকলাপ সমাজে স্থান পেয়েছে এবং স্থায়ী হয়ে রয়েছে সে কথাও কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

উপরোল্লেখিত দ্বিতীয় দল অর্থাৎ মূর্তিপূজা বিরোধীদিগের এ সম্পর্কীয় আর যে সব অভিমত রয়েছে স্থানাভাব বশতঃ সেগুলিকে এখানে তুলে ধরা সম্ভব হলনা বলে আমরা বিশেষভাবে দুঃখিত। অতঃপর তাঁরা তাঁদের এসব অভিমতের সমর্থনে যেসব শাস্ত্রীয় প্রমাণ তুলে ধরেছিলেন তার কতিপয়কে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে ঃ

নতস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

অর্থাৎ—যাহার নাম মহদ্‌যশঃ অর্থাৎ যিনি যাবতীয় মহৎ গুণের অধিকারী সেই পরম প্রভুর কোন প্রতিমা বা তুলনা হইতে পারে না।

—যজুর্বেদ ৩২ অঃ ৩য় মন্ত্র

অন্ধতমঃ প্রবিশন্তি যেহ সম্ভূতি মুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যউ সম্ভূত্যারিতাঃ ॥১॥

অর্থাৎ—যাহারা ব্রহ্মের স্থানে "অসম্ভূতি" অর্থাৎ অনুৎপন্ন প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অন্ধকার অর্থাৎ অজ্ঞানতা এবং দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়।

—যজুর্বেদ ৪০ অঃ

যদ্বচোন ভ্যুদি তং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদ মুপাসতে॥

অর্থাৎ—যাহারা ব্রহ্মের স্থানে "সম্ভূতি" অর্থাৎ কারণ হইতে উৎপন্ন কার্যরূপ পৃথিব্যাদি ভূত, পাষাণ ও বৃক্ষাদির অবয়ব এবং মনুষ্যাদির শরীরের উপাসনা করে, তাহারা উক্ত অন্ধকার অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকার অর্থাৎ মহামূর্খ চিরকাল ঘোর দুঃখ রূপ নরকে পতিত হইয়া মহাক্লেশ ভোগ করে। ॥২॥

অজ্ঞা যজন্তি বিশ্বেশং পাষাণাদিষু কেবলম্।

অর্থাৎ—অজ্ঞলোকেরা পাষাণাদিকেই ঈশ্বর বলিয়া অর্চনা করে।

—বৃহৎ নারদীয় পুরাণ

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাহ বস্থিতঃ সদা
তম বজ্ঞায় মাং মর্তাঃ কুরুতে হর্চা বিড়ম্বনম্।।

অর্থাৎ—আমি সর্বভূতে ভূতাত্ম স্বরূপে অবস্থিত আছি; অথচ অজ্ঞ লোকেরা সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্য প্রতিমাদিতে পূজারূপ বিড়ম্বনা করিয়া থাকে।

—ভাগবত ৩য় স্কন্দ ২৯ অঃ ২১ শ্লোক

যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বাঽর্চাং ভজতে মৌঢ়াদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ।।

অর্থাৎ—যে সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে উপেক্ষা করিয়া প্রতিমার ভজনা করে সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়।।

—ঐ ২২ শ্লোক

মনসা কল্পিতা মূর্তি নৃণাং চেন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্ন লব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তথা।।

অর্থাৎ—মনের কল্পিত দেবমূর্তি যদি মনুষ্যদিগকে মোক্ষদান বা পরিত্রান করিতে পারিত তবে মনুষ্যগণ স্বপ্নলব্ধ রাজ্য দ্বারাও রাজা হইতে পারিত।

—মহানির্বান তন্ত্র

অব্যক্তং ব্যক্তি মা পন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্।।

অর্থাৎ—অল্পবুদ্ধি জনগণ আমার নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট, পরম স্বরূপ অবগত নহে, তাহারা অজ্ঞতার জন্য আমাকে ব্যক্তি (মনুষ্য, মৎস, কূর্ম প্রভৃতি) ভাব বলিয়া মনে করে।

—শ্রী মদ্ভাগবদ্গীতা ৭ম অঃ ২৪ শ্লোক।

ইতিপূর্বে "পুরাণের প্রণেতা বা প্রণেতাদিগের পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধে মহাভারতের উদ্ধৃতি তুলে ধরে দেখানো হয়েছেঃ বেদ-বিভাগকারী, বহু ধর্মীয় গ্রন্থ-প্রণেতা, মহামুণি বেদব্যাস ধ্যানে ঈশ্বরের রূপ কল্পন', স্তবস্তুতির মাধ্যমে তাঁর অনন্ত গুণকে সীমাবদ্ধকরণ এবং তীর্থযাত্রা দ্বারা তাঁর বিশ্ব-ব্যাপকতাকে হ্রাস করার কারণে অনুতপ্ত হয়ে কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

মহামুণি বেদব্যাস পন্ডিতের মতো ব্যক্তি যেখানে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করাকেই মহাপাপ বলে স্বীকার করছেন সেখানে সেই রূপের মূর্তিনির্মাণ যে কত বড় মহাপাপ সে কথা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

মূর্তিপূজার অসারতা সম্পর্কে এমনি ধরণের বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণই সেদিন আমাদের কথিত দ্বিতীয় দলভূক্ত ব্যক্তিগণ তুলে ধরেছিলেন। বাহুল্য বোধে সেগুলোকে এখানে আর উদ্ধৃত করা হলো না।

অতঃপর প্রখ্যাত মনীষীদিগের এ সম্পর্কীয় অভিমতের মাত্র কয়েকটিকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

প্রথমেই আর্যসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত পন্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী মহাশয়ের লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সত্যার্থ প্রকাশ" থেকে তাঁর এ সম্প-র্কীয় কতিপয় অভিমতকে তুলে ধরা হলো ঃ

"মূর্ত্তিপূজা করা পাপ" এই উপশিরোনাম দিয়ে উক্ত গ্রন্থের ৫৪১ পৃষ্ঠার তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন ত হলো—"বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে ধর্ম তাহা না করিলে অধর্ম। সেই রূপ নিষিদ্ধ কর্ম করিলে অধর্ম এবং তাহা না করিলে ধর্ম। যখন তোমরা বেদ নিষিদ্ধ মূর্তিপূজা প্রভৃতি কর্মকর তখন তোমরা পাপী নহ কেন ?"

"মূর্ত্তির পূজা করা অধর্ম, উহা সিঁড়ি নহে—মরণ ফাঁদ" শীর্ষক উপ-শিরনাম দিয়ে অতঃপর তিনি উক্ত গ্রন্থের ৫৪৩ পৃষ্ঠার অভিমত প্রকাশ করেছেন ... ... "জড় পূজা দ্বারা মনুষ্যের জ্ঞান কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না, বরং মূর্ত্তিপূজা দ্বারা যে জ্ঞান আছে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। ... ... পাষাণাদি নির্মিত মূর্তির পূজা দ্বারা কেহ কি কখনও পরমেশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারে ? না—না"।

"মূর্ত্তিপূজা সোপান নহে কিন্তু একটি প্রকান্ড গর্ত। তন্মধ্যে পতিত হইলে মনুষ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। পুনরায় সেই গর্ত হইতে সে বাহির হইতে পারে না, কিন্তু তন্মধ্যেই সে মরিয়া যায়।"

"মূর্ত্তিপূজা উপলক্ষ্যে লোকেরা কোটি কোটি টাকা মন্দিরে ব্যয় করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং মন্দিরে প্রমাদ ঘটে।"

"মন্দিরে স্ত্রী পুরুষের মেলামেশা হয়। তাহাতে ব্যভিচার, কলহ-বিবাদ এবং রোগাদি উৎপন্ন হয়"।

"মূর্ত্তিপূজার ভরসায় শত্রুর পরাজয় এবং নিজের বিজয় মনে করিয়া মূর্তিপূজক নিশ্চেষ্ট থাকে। ফলে নিজের পরাজয় হইলে রাজ্য, স্বাতন্ত্র্য এবং ঐশ্বর্য সুখ শত্রুর অধীন হয় ......"।

"দুষ্টবুদ্ধি পূজারীদিগকে যে ধন দেওয়া হয় তাহা তাহারা বেশ্যা, পরস্ত্রী গমন, মদ্যপান, মাংসাহার এবং কলহবিবাদে ব্যয় করে। তাহাতে দাতার সুখের মূল নষ্ট হইয়া দুঃখ সৃষ্টি করে"।

"যাহারা জড় পদার্থের ধ্যান করে, তাহাদের আত্মাও জড় বুদ্ধি হয়। কারণ ধ্যেয়র জড়ত্ব-ধর্ম অন্তঃকরণ দ্বারা অবশ্য আত্মায় সঞ্চারিত হয়।"

"আরণ্য সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ লেখক জনাব আবদুস সাত্তার উক্ত গ্রন্থের ৪৪ পৃষ্ঠায় সুপণ্ডিত সুধীর বাবুর এ সম্পর্কীয় একটি অভিমত তুলে ধরেছেন। তা হলো—"বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের পুরোহিত-পুষ্ট দেবদেবীর প্রভাব আমাদের সমাজে আজও অপ্রতিহত। এর পার্শ্বে আর একদল দেবদেবীও সেই আদিমকাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করে নি। ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজের পূজা প্রাপ্তির জন্য এদের মাথা ব্যথা নেই। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এদের প্রভাবও সমাজ-স্বীকৃত। এদের প্রচলিত নাম—"গ্রামদেবতা।"

"বাংলাদেশে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদি পর্বেই এই অকুলীন দেবতার দল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। অন-আর্য সংস্কৃতির অন্তঃশীলা প্রবাহের স্রোত রেখা ধরেই এদের আবির্ভাব।"

"বেদ-পূর্ব যুগের সব কথা আমাদের জানবার কথা নয়। কিন্তু ইন্দ্র, বরুণ অগ্নি, মিত্র প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের পুরা কাহিনীর অঙ্গাবরণ নেই বলে এই সব দেবতার স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বলাবাহুল্য, আদিম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত-প্রেত আত্মার জন্ম দিয়েছিল সেই ভয় এবং বিশ্বাসই পরিমার্জিত সংস্করণে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করেছে।"

"বৈদিক দেবতা তো আসলে প্রকৃতি দেবতা ছাড়া আর কিছু নয়। বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের পর্যায়টি মানব সমাজের অভিব্যক্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।"

"ঋগ্বেদের দেবতত্ত্বের মধ্যে আদিম মানুষের বিশ্বাসই নিহিত। জীবপূজা, অচেতন পদার্থপূজা, এবং সর্ব-প্রাণপূজার সংমিশ্রণে বৈদিক দেবতার আবির্ভাব এবং এই দেবতাদের ক্রমবিকাশের আদি পর্বটি গ্রাম দেবতাদের আবির্ভাবের সঙ্গেও জড়িত।"

বলাবাহুল্য, শ্রদ্ধেয় সুধীর বাবু এখানে "জড়পূজা" দ্বারা মাটি, পাথর, কাঠ প্রভৃতি নির্মিত মূর্তিপূজার কথাই বুঝাতে চেয়েছেন এবং দেবদেবী ও মূর্তিপূজা যে ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই উদ্ভাবিত ও প্রচলিত হয়েছে সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ইন্দ্রের অপর নাম যে "পুরন্দর" শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জদরো খননের পরে প্রত্নতাত্ত্বিকগণ তথাকার সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তার সার-সংক্ষেপ হলো ঃ

উক্ত দুস্থানে দ্রাবিড় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আর্যগণ ভারতে আসার পরে তাদের একটি দল ইন্দ্রের নেতৃত্বে উক্ত স্থান দ্বয় অধিকার করেন। তথাকার "পুর" বা বাসস্থান সমূহ ইন্দ্রের নেতৃত্বে ধ্বংস হয় বলে আর্যগণ ইন্দ্রের এই "পুরন্দর" নাম দিয়াছিলেন। পুরন্দর অর্থ—"পুর" বা বাসস্থান ধ্বংসকারী।

এ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে ইন্দ্র তদানিন্তনকালের আর্যদিগেরই একজন ছিলেন। অথচ ভক্তির আতিশয্যে সেই ইন্দ্রকে স্বর্গের দেবতা বানানো হয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি করা হয়েছে, তাঁকে লক্ষ্য করে বহু সংখ্যক বেদ-মন্ত্রও রচিত হয়েছে। পুরাণে তাঁর বীরত্ব সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অথচ তিনি ছিলেন একজন মানুষ।

অনুরূপ ভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি ছিলেন দ্বারকার রাজা। তদানিন্তন কালে তিনি যে একজন প্রখ্যাত বীর ও কূটনীতিক ছিলেন তার বহু প্রমাণ আমাদের হাতেই রয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বেশ চতুরতার সাথে তিনি পান্ডব পক্ষে যোগ দেন এবং অর্জুনের রথের সারথ্য গ্রহণ করেন। এই যুদ্ধে তাঁর গৃহীত ভূমিকা মোটেই সমালোচনা উর্ধে নয়। মোট কথা, তিনি একজন মানুষ ছিলেন।

অথচ, অতিভক্তের দল তাঁকে শুধু ভগবান বানিয়েই ক্ষান্ত হয় নি—তাঁর এই ভগবানত্বের দাবীকে সুদৃঢ় ও জনগণের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বহু সংখ্যক বেদ-মন্ত্র রচিত হয়েছে; পুরাণ-ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে বহু অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে—এবং তাঁর মূর্তিনির্মাণ করতঃ সেই মূর্তিকে পূজার আসনে বসানো হয়েছে। দেবদেবীদিগের উদ্ভব কিভাবে ঘটেছে বা ঘটানো হয়েছে এ থেকে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

এবারে আসুন, আমাদের কথিত তৃতীয় দলটি কোন্ বিশেষ শর্তে মূর্তি-পূজা সমর্থন করেছিল তা জানতে চেষ্টা করি।

মূর্তিপূজার পক্ষপাতি আমাদের কথিত প্রথম দলটি মূর্তিনির্মাণ ও পূজা প্রচলনের পক্ষে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছিল যথাস্থানে তার কতি-পয়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ কারণে খুবই অনুধাবন যোগ্য একটি যুক্তির বিবরণ সেখানে তুলে ধরা হয়নি। সেই যুক্তিটি এই ছিল যে :

মানুষের মন খুবই চঞ্চল; এতই চঞ্চল যে বিশেষজ্ঞগণ মনকেই সর্বাধিক চঞ্চল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তবে এই চঞ্চল মন দিয়েও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান কোন কিছু সম্পর্কে চিন্তা করা এবং একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

কিন্তু অসুবিধা হলো, ঈশ্বর এবং দেবদেবীগণ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বা চর্মচক্ষে পরিদৃশ্যমান নন বলে এই চঞ্চল মন দিয়ে তাঁদের সম্পর্কে চিন্তা করা এবং একটা ধারণায় উপনীত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারেনা।

অতএব এমন কিছু করা দরকার যদ্বারা এই চঞ্চল মনকে একটি মাত্র কেন্দ্রের প্রতি কিছুক্ষণের জন্য হলেও সর্বতোভাবে নিবদ্ধ করা যেতে পারে এবং এই প্রক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে মন নিবদ্ধ করার একটা অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

বলাবাহুল্য, এই অভ্যাস গড়ে ওঠার পরেই সার্থকভাবে চিন্ময় ঈশ্বর এবং দেবদেবীদিগের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও তাঁদের সম্পর্কে একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব।

আর এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বর ও দেবদেবীদিগের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বা মূর্তিনির্মাণই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এই অভ্যাস গড়ে ওঠার পরে প্রতীক বা মূর্তির যে কোন প্রয়োজনই থাকতে পরে না সে কথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। অতএব এটা একটা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে প্রতীক বা মূর্তি লক্ষ্য নয়—লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার একটা উপায় বা উপলক্ষ্য মাত্র।

আমাদের কথিত তৃতীয় দলটি প্রথমোক্ত দলের এসব যুক্তির কিছুটা সারবত্তা থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েও শর্ত আরোপ করেছিলেন যে, যেহেতু প্রতীক বা প্রতিমারা ঈশ্বর নয়—দেবতাও নয়; আর যেহেতু ওসবের

পূজার অন্যান্য আপত্তিকর দিক ছাড়াও সৃষ্টির সেরা মানুষের পক্ষে মাটি, কাঠ বা পাথরে গড়া প্রতীক বা মূর্তির চরণে প্রণত হওয়া এবং কৃপা করুণার ভিখারী হওয়া ভীষণভাবে অবমাননাকরও। অতএব যথাযোগ্য চেষ্টা সাধনার মাধ্যমে দ্রুততার সাথে এ পর্যায় অতিক্রম করতে এবং প্রতীক প্রতিমার অপসারণ ঘটাতে হবে।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকাল এমন কি আধুনিক কালের বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিরাও প্রতীক বা মূর্তিপূজা যে একান্তই একটা সাময়িক ব্যাপার এবং প্রশিক্ষণ মাত্র সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব এই প্রশিক্ষণের পরিসমাপ্তি ও প্রতীক—প্রতিমার অপ-সারণ প্রয়োজন বলে দৃঢ় কন্ঠে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং করে চলেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ এ ধরণের দুটি মাত্র অভিমতকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে : প্রখ্যাত পন্ডিত স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর লিখিত "সত্যার্থ প্রকাশ"-এর ৩৬ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হলো :

"......— এই কারণে অজ্ঞান দিগের জন্য মূর্তিপূজা, কেননা, সোপান-পর-ম্পরা অতিক্রম করিয়াই গৃহের ছাদে পৌঁছান যায়। প্রথম সোপান পরিত্যাগ করিয়া উপরে উঠিতে ইচ্ছা করিলে উঠা যায় না। এই কারণে মূর্তিই প্রথম সোপান।"

"ইহার পূজা করিতে করিতে যখন জ্ঞান হইবে এবং অন্তঃকরণ পবিত্র হইবে তখন পরম-আত্মার ধ্যান করিতে পারিবে।"

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর এম, এ, সপ্ততীর্থ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) দর্শন শাস্ত্রী, সিদ্ধান্ত বাগীশ, ভক্তিভূষণ প্রমুখ কতিপয় পন্ডিত বিরচিত এবং বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য "হিন্দু ধর্ম শিক্ষা" নামক পুস্তকে এ সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করে-ছেন—" সাকার উপাসক ভক্তি সহকারে প্রতিমাপূজা করেন। ...... কেহ কেহ ফুলে-জলে পূজা করেন, কেহ কেহ ষোড়শোপচারেও পূজা করেন। তাঁহারা গরমের দিনে পাখার বাতাস আর শীতের দিনে পশমী কাপড়ে শ্রী মূর্তির আবরণ দিতে দ্বিধা করেন না।

যিনি শীত গ্রীষ্মের জন্মদাতা, যাঁহার সামনে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ

বাতাস সর্বদা নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে তিনি যে শীত গ্রীষ্মে কষ্ট পান ইহাই কল্পনা।"

"...... যতদিন পর্যন্ত আপনার হৃদয়মন্দিরে সর্বভূতস্থিত ঈশ্বরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না যায় ততদিন পর্যন্ত প্রতিমাদিতে ঈশ্বরের অর্চনা করিতেই হইবে।"

এই সুদীর্ঘ আলোচনার পরে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই এখানে প্রশ্ন জাগে যে এত কিছু সাধ্যসাধনার পরে যে মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটানো হয়েছিল অদ্যাপি তার কতটুকু ফল পাওয়া গিয়েছে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে অতীব দুঃখ বেদনা ও হতাশার সাথে বলতে হয় যে, এই প্রচেষ্টা অতি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং এই ব্যর্থতার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ আমাদের চোখের সম্মুখেই বিদ্যমান।

কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে, অতীব দ্রুততার সাথে "মনস্থির" করার এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতঃ মূর্তিপূজার অবসান ঘটানো এবং নিরাকার বিশ্বপ্রভুর ধ্যান-ধারণায় আত্মনিয়োগের আশায় এই কার্যক্রম গৃহীত হলেও হাজার হাজার বছরে অন্ততঃ এতদ্দেশের একজন ব্যক্তিরও মনস্থির হয় নি এবং কোন একটি স্থানেও মূর্তিপূজার অবসান ঘটে নি।

অর্থাৎ—কয়েক হাজার বছর পূর্বে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল মূর্তিপূজকগণ আজও সেখানেই ঘুরপাক খেয়ে চলেছেন। এ দেশের পূজারী ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে অত্যতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহ, পুত্র প্রভৃতি নির্বিশেষে প্রত্যেকে একের পর এক সারাটি জীবন মূর্তিপূজায় কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করছেন ; জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েও মনস্থির করতে এবং মূর্তিপূজার অবসান ঘটাতে সক্ষম হচ্ছেন না আমরা বিস্ময়ের সাথে প্রত্যহ তা অবলোকন করছি।

শুধু তা-ই নয়, তাঁরা যে দিনে দিনে সেই প্রতীক বা মূর্তিকেই আসল ঈশ্বর এবং আসল দেবদেবী রূপে চিরস্থায়ী ভাবে গ্রহণ করতঃ অভিষ্ট সিদ্ধি এবং কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের একমাত্র বিধি-সম্মত উপায় হিসেবে মহাধুমধামের সাথে ওসবের পূজার্চণা চালিয়ে যাচ্ছেন সে ঘটনাও আমাদের দৃষ্টির অগোচর নয়। এটাকে চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে ?

এবারে আসুন গোটা বিষয়টাকে একবার নিবিষ্ট ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে পর্যালোচনা করি !

মূর্তিনির্মাণ তো দূরের কথা মূর্তি কল্পনাও যে অন্যায় এবং জঘন্য পাপজনক কাজ বেদাদি বিশ্বস্ততম ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি এবং কতিপয় প্রখ্যাত মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত থেকে ইতিপূর্বে সে কথা আমরা জানতে পেরেছি।

মূর্তিপূজা যে নিস্ফল এবং মূর্খ ও অবিজ্ঞজনোচিত কাজ শ্রী মদ্ভাবগদগীতা এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি ও বিদগ্ধ পন্ডিত মন্ডলীর অভিমত থেকে সেকথাও আমরা জানতে পেরেছি।

আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত এই পরিবেশে প্রতীক বা মূর্তিপূজা বিশেষ করে লিঙ্গ, যোনি, গরু, ছাগল, গাছ, মাছ, শূকর, কচ্ছপ প্রভৃতির পূজা যে শুধু অশোভনীয়ই নয়—বর্বরজনোচিত কাজও সেকথা বুঝবার মতো জ্ঞান বুদ্ধি নিশ্চিত রূপেই আমাদের রয়েছে।

সর্বোপরী প্রতীক বা মূর্তিপূজা যে একটা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণও আমাদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

এসব কারণেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্য-শিক্ষিত মানুষেরা যে প্রতীক বা মূর্তিপূজাকে চিরদিনের জন্য বর্জন করেছেন সে ঘটনাও নিশ্চিত রূপেই আমাদের অজানা নয়।

বলাবাহুল্য, এত কিছুর পরেও যাঁরা প্রতীক বা মূর্তিপূজাকে যখের ধনের মতো আঁকড়ে ধরে রয়েছেন তাঁদের জন্য দুঃখ প্রকাশ ছাড়া আমাদের করণীয় আর কিছুই থাকতে পারেনা। তাঁদের মনের পরিবর্তন ও মূর্তিপূজার অবসান ঘটুক, সারা বিশ্বের মানুষ সেই অসীম অনন্ত ও একক বিশ্বপ্রভুর দাসত্ব ও আরাধনায় তৎপর হয়ে উঠুক সেই মহান দরবারে এটাই আজ অন্তরের আকুল প্রার্থনা।

অন্যান্য দেশের দেবদেবীদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ঃ

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের মানুষেরাই যে দেবদেবী এবং তাদের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যকলাপের প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান

রয়েছে। দেশভেদে এবং ভাষাভেদে তাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে বিশেষ কোন ভিন্নতা নেই।

সেসব দেশের মানুষেরাও এককালে এইসব দেবদেবীদিগের মূর্তিনির্মাণ করেছে এবং নানাভাবে তাদের সন্তুষ্টি বিধান ও ক্রোধ প্রশমনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

বর্বর যুগীয় মন-মানসের কল্পনা-প্রসূত এইসব দেবদেবীদিগের সংখ্যা যেমন প্রচুর দাপট-দৌরাত্মোর কাহিনীও তেমনই চমকপ্রদ।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে অন্ধকারেই এদের জন্ম এবং অন্ধকারে থাকতেই এরা অভ্যস্থ। ফলে যেখানে অন্ধকার যত বেশী সেখানে এদের দাপট এবং প্রভুত্বও ততই জমজমাট। অন্ধকারে অভ্যস্থ বিধায় আলোর ঝলকানি এরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই দেখা যায় যে, পৃথিবীর যেসব দেশ যতই উন্নত অগ্রসর হয়েছে ততই ওরা পালিয়ে গিয়ে সে সব দেশের বন-জঙ্গল এবং নিভৃত কোণের অধিবাসী এবং উপজাতীয়দিগের উপরে ভর করে নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে এবং আজও করে চলেছে।

সভ্য শিক্ষিত দেশ সমূহের মধ্যে একমাত্র পাক-ভারত উপমহাদেশেই আজও ওদের দাপট এবং প্রভুত্ব বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়। তবে সুখের বিষয় তথাকার একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যেই এই দাপট এবং প্রভুত্ব সীমাবদ্ধ। আরও সুখের বিষয় এই দাপট এবং প্রভুত্ব দিনে দিনে হ্রাস পেয়ে চলেছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যে অন্যান্য দেশের মতো এখান থেকেও ওদের পাত্তারি গুটাতে হবে তার লক্ষণও দিনে দিনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে।

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশ থেকে মূর্তিপূজা তিরোহিত হয়েছে বলে মূর্তিপূজার গোড়ার কথা লিখতে বসে সে-সব দেশের প্রতি গুরুত্ব আরোপের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। ওদের সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে চুপ থাকা হলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বিধায় এখানে দুকথা লিখতে হচ্ছে।

একটি কথা ভেবে আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারা যায় না যে, দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, পরিবেশ ভিন্ন এবং তদানিন্তন কালে এক দেশের সাথে অন্যদেশের পরিচয় এবং যোগাযোগ না থাকলেও এদেশের দেবদেবীদিগের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দেবদেবীদিগের শুধু ভাষাগত কারণে নামের ভিন্নতা ছাড়া

আর কোন ভিন্নতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

অর্থাৎ জন্ম, স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ এবং অদ্ভুত অবিশ্বাস্য কার্য-কলাপের বেলায় সকল দেশের দেবদেবীদিগের মধ্যে বেশ একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব কল্পনার রাজ্যে মানুষে মানুষে মিল থাকার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। নিম্নের এই সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থেকেও সুধী পাঠক বর্গ সেই মিল খুঁজে পাবেন বলে আশা করি।

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করণের জন্যে ওসব দেশের প্রখ্যাত দেবদেবীদিগের মাত্র কয়েক জনের পরিচয় এখানে তুলে ধরতে হলো। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে ওসব দেবদেবী সম্পর্কে পৃথক একখানা বই লিখার আশা রাখি।

নাম	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
১। জুপিটার (Jupiter)	স্বর্গের রাজা, তিনি মানুষ ও দেবতাদিগের পিতা।
২। জুনো (Juno)	জুপিটারের স্ত্রী, স্বর্গের রাণী। জুনো খুবই ঈর্ষা পরায়না দেবী। তার ঈর্ষায় স্বর্গে এবং মর্তে অনেক অঘটন ঘটেছে। মার্স, হিদ, লুসিনিয়া, ভল্কান প্রভৃতি তার পুত্র।
৩। ডায়েনা (Diana)	জুপিটারের কন্যা। তিনি মৃগয়া এবং সতীত্বের দেবী। এঁকে আলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও বলা হয়ে থাকে। ইনি এ্যাপলো (সূর্যদেব)-এর যমজ ভগ্নি।
৪। অ্যাপলো (Apollo)	গ্রীক এবং রোমানদিগের মতে ইনি সূর্যদেব। সঙ্গীত এবং কাব্যের দেবতা হিসেবেও তাদের মধ্যে অ্যাপলোর পূজা প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য যে সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য রোড্‌স্‌ দ্বীপের সুবিখ্যাত পিতল মূর্তিটি এই অ্যাপলো দেবেরই মূর্তি।
৫। অ্যারিথুসা (Arethusa)	ডায়েনার সহচরী; জলকন্যা। জলদেবতা

অ্যালকিউস তার অনুসরণ করলে তিনি নির্ঝর রূপ ধারণ করেন।

৬। মিনার্ভা (Minerva) জুপিটারের কন্যা। জ্ঞান, যুদ্ধবিগ্রহ ও চারু-শিল্পের দেবী। তিনি দেবদাসী এবং চির কুমারী। প্রেমের সহিত তাঁর চির বিরোধ।

৭। অ্যারকিনি (Archne) লিডিয় দেশের রাজকুমারী, উত্তম সূচীকার্য জানতেন বলে গর্ব করায় মিনার্ভা তাকে মাকড়শায় পরিণত করেন।

৮। আইও (Io) একজন দেবী। পিতা ইনেকাস, মাতা ইস-মিনি। স্বর্গের রাজা জুপিটার তার প্রেমে মুগ্ধ হন। পরে পত্নী জুনোর ভয়ে তাকে গাভীতে রূপান্তরিত করেন। মিসর দেশে গাভীরূপে ভ্রমনকালে তিনি নিজের রূপ ফিরে পান এবং তথাকার অসাইরিসকে বিবাহ করেন।

৯। আইরিস (Iris) টমাস ও ইলেক্টার কন্যা, তিনি জলদেবীর সংবাদ বাহিকা ছিলেন। জুনা তাকে ইন্দ্র-ধনুতে রূপান্তরিত করেন।

১০। ইউরেনাস (Uranus) আকাশের দেবতা। তিনি পৃথিবী দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ দেবতা স্যাটা-র্নের পিতা।

১১। স্যাটার্ন (Saturn) রোমকদিগের প্রাচীনতম দেবতা। তিনি স্বীয় পুত্রদিগকে জন্ম মাত্রই খেয়ে ফেল-তেন, কিন্তু তার স্ত্রী রিয়া (Rhea) তাকে পুত্রের পরিবর্তে বড় বড় প্রস্তর খন্ড খেতে দিতেন। এই রূপে কয়েকটি পুত্র মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যায়। এদের মধ্যে জুপি-টার, নেপচুন, ও প্লুটো অন্যতম। এই আচ-রণের জন্য পুত্র জুপিটারের হাতে তিনি নিহত হন।

১২। স্ফিংক্স (Sphinx) থিবস্-এর নিকটে বসবাসকারী এক রাক্ষস এর মস্তক নারীর ন্যায়, দেহ সিংহের ন্যায় এবং পক্ষীর ন্যায় পালক ছিল। পথিক-দিগকে হেঁয়ালী জিজ্ঞাসা করতো। উত্তর দিতে না পারলে খেয়ে ফেলত। ঈদিপাশ নামক জনৈক পথিক একটি হেঁয়ালীর উত্তর দিলে এই রাক্ষস আত্মহত্যা করে। মিসরে এই রাক্ষসের একটি প্রস্তরমূর্তি বিশেষ বিখ্যাত।

১৩। ঈওলাস (Aeolus) হিপ্পোটিসের পুত্র। ইনি বায়ু দেবতা।

১৪। এথিনা (Athena) প্রাচীন গ্রীকদিগের জ্ঞান, যুদ্ধ ও চারুশিল্পের দেবী।

১৫। ফ্লোরা (Flora) পুষ্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তার গ্রীক নাম ক্লোরিস (Cloris)।

১৬। বেলোনা (Bellona) গ্রীক দেবতা মার্সের ভগিনী। ইনি যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পিতা ফরসিস; মাতা সিল্টো।

১৭। বোরিয়াস (Boreas) উত্তর-পূর্ব বায়ুর দেবতা।

১৮। ব্যকাস (Bacchus) রোমকদিগের মদ্যদেবতা। গ্রীক নাম "ডাইও নিসাস"। পিতা জুপিটার মাতা সেমেলি।

১৯। মর্ফিউস (Morpheus) নিদ্রা দেবতা, একে স্বপ্নের দেবতাও বলা হতো।

২০। মার্কারী (Mercary) জুপিটারের অন্যতম পুত্র। তাকে দস্যু, মেষপালক, পর্যটক, ব্যবসায়ী প্রভৃতির দেবতা বলা হতো। তিনি অন্যান্য দেবতা-দের নিকট থেকে দ্রব্যাদি চুরি করে বেড়ান।

তিনি ফেনাসের মেখলা, মার্সের তরবারি, জুপিটারের দন্ড ও নেপচুনের যষ্ঠি চুরি করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার মাথায় পক্ষযুক্ত একটি টুপী আছে এবং পা-এ পাখা আছে। ফলে তিনি বাতাসের মত বেগে ছুটতে পারেন।

২১। ভার্টাম নাস (Vertum nus) — ঋতু বিশেষতঃ বসন্ত ও তৎকালে উৎপাদিত ফল-পুষ্পের অধিদেবতা।

২২। ভালকান (Vulcan) — ধাতুদ্রব্য শিল্প ও অগ্নির দেবতা। পিতা জুপিটার, মাতা জুনো, তিনি আগ্নেয়গিরি রূপ কর্মশালায় বসে দেবগণের বর্ম তৈরী করেন।

২৩। ভেস্টা (Vesta) — গৃহ ও মেষপাল প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্যাটার্ন তার পিতা এবং জুপিটার তার ভ্রাতা।

২৪। জেফাইরাস (Zephyrus) — পশ্চিম বায়ুর দেবতা। ফ্লোরা দেবীর প্রণয়ী।

২৫। ট্রাইটন (Triton) — সমুদ্রের দেবতা। নেপচুনের পুত্র। তিনি ভেরী বাজিয়ে সমুদ্রের তরঙ্গকে শান্ত করেন।

২৬। নেমেসিজ (Nemesis) — এক দেবী। রাত্রির কন্যা। তিনি মানুষকে সুখ, দুঃখ, এবং উদ্ধতদিগকে শাস্তি প্রদান করেন।

২৭। প্যান (Pan) — মেষ পালকদিগের দেবতা। তিনি মধুমক্ষিকাদের রক্ষক এবং মৎস্য ও পশু শিকারের পৃষ্ঠপোষক। তিনি শৃঙ্গধারী, ছাগপদ ও লাঙ্গুল বিশিষ্ট।

২৮। প্যান্ডোরা (Pandora) — জুপিটারের আদেশে ভলকান কর্তৃক সৃষ্ট পরমা-সুন্দরী প্রথমা নারী। জুপিটার একটি পাত্রে সকল প্রকার দুর্বিপাক আবদ্ধ করে তাকে পাত্রটি প্রদান করেন। তিনি কৌতু-

হলী হয়ে তা দেখতে গেলে সমস্তই বের হয়ে পড়ে। কেবল মাত্র আশা পাত্রের মধ্যে থাকে। সেই কারণে মানুষের জীবনে বহু দুর্বিপাক আছে আর তার সঙ্গে মানুষের জীবনে আশাও আছে।

২৯। ক্লোথো (Clotho) — ভাগ্যদেবীগণের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। জীবন-সূত্র প্রস্তুত করাই তার কাজ।

৩০। ক্লোরিস (Cloria) — পবন দেবতার স্ত্রী; গ্রীকদিগের ফুলপরী।

৩১। ওপস্ (Ops) — স্যাটার্নের স্ত্রী, কৃষি কার্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

৩২। ওরাইয়ন (Orion) — বিখ্যাত শিকারী দৈত্য। মৃত্যুর পরে তিনি নক্ষত্র মন্ডলে স্থান লাভ করেন। ভারতে এই নক্ষত্রকে 'কাল পুরুষ' নামে অভিহিত করা হয়।

৩৩। কেরন (Charon) — দৈত্য বিশেষ। মানুষ মরে গেলে তিনি তাকে নরকের পথে বিদ্যমান স্টাইক ও একিরণ নামীয় নদীর পাড়ে নিয়ে যান।

৩৪। এরিবাস (Erebus) — যমপুরীর অন্যতম দেবতা। যম পুরীর মধ্যে বিদ্যমান অন্ধকারকেও এই নামে অভিহিত করা হয়।

৩৫। হাইমেন (Hymen) — বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

৩৬। হিবি (Hebe) — জুপিটার ও জুনোর কন্যা। ইনি যৌবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী

৩৭। শমাশ বা শিমুশ — সূর্যদেব।

৩৮। সিন — চন্দ্রদেবতা

৩৯। ঈ বা আয়া — বরুণদেব

৪০। অণু — অন্ধকার, আকাশ ও তারকা রাজীর দেবতা।

৪১। ইশতার— — প্রেম, সৌন্দর্য বা শুক্রগ্রহের প্রতীক।

৪২।	অনলীল—	মাটির দেবতা।
৪৩।	বেলিত—	শক্তির দেবী।
৪৪।	নরগাল	যুদ্ধ ও বিক্রমের দেবতা ও মঙ্গল গ্রহের প্রতীক।
৪৫।	মরদুক	আলোকের দেবতা ও বুধ গ্রহের প্রতীক।
৪৬।	হবারে (Hvare)	সূর্যদেবতা
৪৭।	হেলিওস (Helios)	,,
৪৮।	শবর	,,
৪৮।	নাটসেস (Natches)	,,
৪৯।	ইনকাস (Incas)	,,*

উপজাতীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত মূর্তিপূজাঃ

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই দেশের "আদিম অধিবাসী" "আদিবাসী" বা "উপজাতীয়" বলে পরিচিত এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছেন। শিক্ষা দীক্ষার অভাব, পশ্চাৎমুখীতা এবং রক্ষণশীলতার কারণে তাঁরা নিজদিগকে আধুনিক সভ্য সমাজ থেকে কঠোরভাবে দূরে রেখেছেন। ফলে সেই আদীম যুগ থেকে বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসা ধারণা-বিশ্বাস এবং প্রথাপদ্ধতি আজও তাঁদের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে চালু রয়েছে আর জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে সেটাকেই তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। বলাবাহুল্য, তাঁদের মধ্যে প্রচলিত দেবদেবী এবং মূর্তিপূজাই এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

কিন্তু অসুবিধা হলো—তাঁদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে বহু দল গোত্র প্রভৃতি রয়েছেন এবং তাঁদের বিশ্বাস এবং প্রথা-পদ্ধতির মধ্যেও বহু তারতম্য রয়েছে। সকলের কথা পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরতে হলে বিরাট একখানা পুস্তক লিখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আপাততঃ তা সম্ভব নয়। স্থানাভাব বশতঃ এখানেও দু'চার কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে তাঁদের সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। আলোচনা সংক্ষেপ করার জন্যে নমুনা স্বরূপ এখানে তিনটি মাত্র উপজাতীয় সম্পর্কেই আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

* Smiun clotrs History of the world IF, Page 105—109

নিম্নে প্রথমে উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাম পরে তাদের ভাষায় তাদের বিশ্বস্থ প্রধান প্রধান দেবদেবীদিগের নাম ও বন্ধনীর মধ্যে সে-সবের বাংলা প্রতিশব্দ দেয়া হলো।

ক. টিপরা সম্প্রদায়ঃ

১) তুইবুকমা (জল দেবী)।
২) কের, খরাংগমা (রোগব্যাধি, মহামারী প্রভৃতির দেবী)।
৩) খুরুক সোনাই (মাথা ধোয়ার দেবতা)।
৪) হানুক মানো জনাইনাই (বিশ্বদেবতা)।
৫) বুরহাসা (প্রধান দেবতা)
৬) চোংগ প্রাংগমা (বুর হাসার স্ত্রী)।
৭) কামিনী (গ্রাম দেবতা)
৮) মুলিথানাই (গর্ভনষ্ট হওয়া ও মৃত সন্তানের জন্ম থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
৯) ছলংগতাই (নির্বুদ্ধিতা থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১০) মালাংগতুই (বোকামী থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১১) সাকজা কবী (হটকারীতা থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১২) বাইবারী (গঞ্জনা থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১৩) খাহমালী (সহজভাবে বোঝানোর দেবী)।
১৪) হমালী (অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী দেবী)।
১৫) মাইলুংমা (শস্য দেবী।)
১৬) খুলুমরু (কার্পাস দেবী)।
১৭) হাকামা (রণদেবী)।
১৮) বিশচিনি শামুংগ (ভাগ্য বা লক্ষ্মী দেবী)।

খ. চাকমা সম্প্রদায়ঃ

১) ধানফং (জুম চাষে সাফল্য-দানের দেবতা)।
২) চুঙুলাং (পরম পুরুষ বা পরম দেবতা)।
৩) পরমেশ্বরী (সন্তান সন্ততি, বিবাহ, গৃহশান্তি, ফসল বৃদ্ধি প্রভৃতির দেবী)।*
৪) ভাদ্যা (ভাত দেয়া থেকে উৎপত্তি। মৃত স্বজনদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে এ পূজা করা হয়ে থাকে)।

গ. লুসাই সম্প্রদায়ঃ

১) কাংগপুইজাম (রোগ-ব্যাধি বাড়ানোর দেবতা)।
২) সিক (বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দানকারী দেবতা)।
৩) সাংখুয়া (মৃত পুরুষদিগের আত্মার মঙ্গলকারী দেবতা)।
৪) খাল (হোয়াই বা অপদেবতা-দিগের কোপ দৃষ্টি থেকে রক্ষাকারী দেবতা)।
৫) দাউব উল (বন-জঙ্গল, পাহাড়, নদ-নদী প্রভৃতির বিপদ থেকে রক্ষাকারী দেবতা)।
৬) রাতেক (ফসল বৃদ্ধি ও পোকা-মাকড় থেকে শস্য রক্ষাকারী দেবতা)।

* চুঙুলাং ও পরমেশ্বরী সঙ্গমে লিপ্ত হয়, বৃষ্টির আকারে বীর্যপাত হতে থাকে, ফলে পৃথিবী মাতা উর্বরা হয়ে ওঠেন, প্রচুর শস্য সম্ভারে মাঠ ভরে যায় চাকমাগণ গভীরভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ঋগ্বেদের একটি সুক্তের সাথে এই বিশ্বাসের মিল রয়েছে।

স্থানাভাব বশতঃ এখানেই ইতি টানা উচিত ছিল। কিন্তু তা করা হলে সুধী পাঠক বর্গের অনেকেই প্রকৃত অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকায় একান্ত বাধ্য হয়ে সুপন্ডিত, সুলেখক এবং উপজাতীয়দিগের সম্পর্কে গভীর গবেষণাকারী জনাব আবদুস সাত্তারের "আরণ্য সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থের কিছুটা অংশ উপহার স্বরূপ পাঠক বর্গের সম্মুখে তুলে ধরতে হলো ঃ

উক্ত গ্রন্থের ৪৩ পৃষ্ঠায় বহু তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরার পরে তিনি লিখেছেন—"চন্দ্র ও সূর্য ছাড়াও আদিবাসী সমাজের ধর্ম ও বিশ্বাসে আকাশ, পৃথিবী, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পশুপাখি, জীব জন্তু, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি সব কিছুর অন্তরালে আত্মাধারী দেবদেবীর অস্তিত্ব বর্তমান। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির মূল আধার বা নায়ক সৃষ্টি-কর্তার অস্তিত্ব সন্ধানে আদিম সমাজ যতটা না ব্যাপৃত থেকেছে তার চেয়ে বেশী ব্যাপৃত থেকেছে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের রহস্য উদ্ঘাটনে।

কেননা, এর অন্তরালে ক্রিয়াশীল ছিল ভয়। এবং এই ভয়ের পটভূমিকাতেই জন্মলাভ করেছে বিচিত্র ধরণের দেবদেবী। অবশ্য এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল পূর্ব-পুরুষদের মৃত আত্মার ভয়। ফলে সৃষ্টিকর্তা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী ইত্যাদির অন্তরালের কল্পিত দেবদেবী তাদের পূজা অর্চনায় যতটা না প্রাধান্য পেয়েছে তার চেয়ে বেশী প্রাধান্য পেয়েছে গ্রামদেবতা এবং গ্রামদেবী।

গ্রাম দেবতা বা গ্রাম দেবীর আধিপত্য আদিম সমাজে অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য যে, গ্রাম দেবদেবীরা আসলে পূর্বপুরুষ এবং প্রকৃতির বিভিন্ন পর্যায়ের অন্তরালে অদৃশ্য আত্মা (Spirit Being) এবং তাদের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভয়-ভীতি জড়িত।

বাংলাদেশের আদি সমাজের গ্রাম দেবদেবীদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের লুসাই-কুকিদের হোয়াই (রাম হোয়াই এবং তুই হোয়াই) এবং সিলেটের খাসীয়াদের উব্লাই মুলুক, উব্লাই উমুতং, উব্লাই সংসপাই, উরিং, কেউ, কারিহ ও কাথলাম সম্পর্কে আগেই ইংগীত দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য সমাজের গ্রাম দেবদেবীদের মধ্যে মুরু ও মুরুংদের ওরেং ও

সুংতিয়াং; সেন্দুজদের খোজিং; খুমীদের নদগ ও বোগলে; টিপরাদের চুমা-মাথলায়ে, হাকাকা, খুলুমরু, কালাইয়া-গরাইয়া, বুরসার, মাতাই চাং-গরামু, কিচকিনি, সামুং, তুইমা; চাকমাদের মালক্ষ্মী, বুহত্তারা, ধলধুরি, পরমেশ্বরী, সত্যা, হাত্যা, ফুলকবরী, মেককোমরী, মোহিনী কালা খেদর, ভূত, রাখোয়াল, বিয়াত্রা, থান, চাল্লোয়াদে, বজমপতি, থাম্নাং, চেঙ্গং, মগনী, শিজি, কালী জান্দর, আনেকা, লাওজ্যা ঠাকুর ইত্যাদি;

গারোদের তাতারা রাকুনা, নস্তনুপান্তু, মাচি, সালজং, ছোছুম, নোরিংগ্রো, নোজিংজু, গোয়েরা, নোরিচিত, কিমরীবোন্তী, মেন, আছিমাদিংছিমা, কাল-কেম, চোরাবুদি, রোকিম, মিসি আগ্রাং, সোলজং ইত্যাদি; হিন্দু প্রভাবান্বিত আদিম সমাজ যেমন হাজং, দলুই, হদি, বোনা, রাজবংশী প্রভৃতিদের চন্ডী, শীতলা, মনসা, বুকিনী, ভাদু, করম, পলাশাই, হিঙ্গুলাই, মেলাই সেপাই, চেতাই, বাশুলী, বরাহী, কামার বুড়ি, ডাকিনী, যোগিনী, হিড়িমাই প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা আবশ্যক যে হিন্দুদের দেবদেবী এবং আদিম সমাজের দেবদেবী অনেক ক্ষেত্রেই অবিচ্ছেদ্য সূত্রে আবদ্ধ।"

অতঃপর উক্ত গ্রন্থের ৯৬ পৃষ্ঠায় প্রস্তরপূজা ও হিন্দুসমাজের অম্বুবাচী উৎসবের সাথে উপজাতীয়দিগের গভীর সম্পর্কের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি লিখেছেন ঃ

"প্রস্তরপূজা আদিম সমাজের আদিমতম নিদর্শন এবং খাসীয়া সমাজই সেই বৈশিষ্ট্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের গারো, সেন্দুজ, পাংখো, বন-যোগী প্রভৃতি সমাজেও প্রস্তরপূজার ধারা অব্যাহত থাকলেও খাসীয়া সমাজে এটা প্রকট এবং তাদের এই রীতি প্রস্তরযুগ (Stone Age), নিরক্ষর যুগ (Pre-literate Age) এবং ক্রো ম্যাগনন মানবের যুগ (Cro-Magnon Age)-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।"

অম্বুবাচী খাসীয়াদের জাতীয় উৎসব। আসামের কামাখ্যা মন্দিরে এই উৎসব বিশেষ ঘটা করে পালন করা হয়। খাসীয়া ভাষায় "কা-মেইখা"-এর অর্থ "মায়ের জলধারা"। 'কা-মেইখা' থেকেই কামাখ্যা শব্দের উৎপত্তি বলে খাসীয়াদের ধারণা।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের ১০ম দিবস থেকে ১৩শ দিবস পর্যন্ত এই তিন দিন কামাখ্যা মন্দিরের পাশ দিয়ে লাল পানি নির্গত হয়। এতে পৃথিবী

মাতা ঋতুবতী হয়েছেন বলে তাদের বিশ্বাস। এই তিন দিন হল-কর্ষণ, শস্য বোনা এবং সাংসারিক অন্যান্য কাজও নিষিদ্ধ।

নৃত্যগীত ও আনন্দের মাধ্যমে খাসীয়া সমাজ এই তিন দিন কাটানোর পর চতুর্থ দিবসে পৃথিবী মাতার শুচিতা ফিরে আসলে তারা যার যার গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

শুধু খাসীয়া সমাজ নয়—আসামের আবর, মিসমী, লাখের, মিরি প্রভৃতি আদিম সমাজও এ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত নয়। হিন্দুসমাজ অম্বুবাচীর চতুর্থ দিবসে কতকগুলো প্রস্তর খন্ড পৃথিবী মাতার প্রতিভূ কল্পনা করে তাদের স্নান করিয়ে ফুল, চন্দন, তেল ও মাল্যভূষিত করে এবং এভাবেই পৃথিবী মাতা শুচিস্থ প্রাপ্ত হলেন বলে তাদের ধারণা।

বাংলাদেশ ও ভারতের রাঁচী অঞ্চলের ওরাওঁ সমাজ একই বিশ্বাসের অনুকরণে—'হরি আরি' পূজা ও উৎসব পালন করে, হরি আরি উৎসবে আকাশ দেবতার সঙ্গে পৃথিবী মাতা বা ধরতীমাই-এর বিবাহ কল্পনা করা হয়।

এই বিবাহ কল্পনা করার উদ্দেশ্যই যাতে পৃথিবী উর্বরা এবং উৎপাদিকা শক্তি অর্জন করতে পারে। কাজেই ধরমেশ বা প্রধান দেবতার সঙ্গে পৃথিবী মাতার বিবাহ ওরাওঁ সমাজে উর্বরতার প্রতীক (Fertility culf):

"..... ছোট নাগপুরের খাড়োয়ারদের মুচুকরাণী উৎসব একই অর্থ জ্ঞাপন করে। মুচুকরাণী উৎসবেও খাড়োয়ারেরা এক খন্ড লম্বা পাথরকে স্ত্রী লোক কল্পনা করে অন্য আরও এক খন্ড পাথরের সঙ্গে বিবাহ দেয়। এই বিবাহ ও পৃথিবী মাতার সঙ্গে সৃষ্টিকর্তা বা প্রধান দেবতার বিবাহ বলে ধরে নেয়া হয়।"

এখানে বলা আবশ্যক যে, শুধু অম্বুবাচী, প্রস্তর ও মূর্তিপূজা, দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রামদেবতা, ভূত-প্রেত প্রভৃতির প্রতি বিশ্বাস পোষণের দিক দিয়েই নয় ধর্ম এবং বিশ্বাসের বেলায়ও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই উপজাতীয় দিগের সাথে হিন্দুসমাজের যথেষ্ট মিল থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। উদাহরণ। স্বরূপ এ সম্পর্কে আর দুটি মাত্র বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যাচ্ছে।

লক্ষ্যণীয় যে হিন্দুসমাজ সব কিছুর মূলাধার এবং সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পোষণ করেন; আবার প্রতিটি কাজের পশ্চাতে কোন না কোন দেবদেবী,

অপদেবতা, গ্রামদেবতা ভূত-প্রেতাদির কর্তৃত্ব থাকার প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করেন।

উপজাতীয় দিগের মধ্যেও অনুরূপ বিশ্বাস বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। তারাও যে সকল কাজের মূলে কোন না কোন দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রামদেবতা, ভূত-প্রেতাদির কর্তৃত্বের প্রতি বিশ্বাস পরায়ণ ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

অতঃপর তারাও যে সব কিছুর মূলাধার এবং সর্বশক্তিমান হিসেবে একজন প্রধান দেবতার প্রতিও বিশ্বাস পোষণ করেন তার প্রমাণ তুলে ধরা যাচ্ছে।

এ জন্যে আমরা প্রথমে এক একটি উপজাতী সম্প্রদায়ের নাম এবং পাশাপাশি তাদের ভাষায় সেই ঈশ্বর বা প্রধান দেবতার নাম তুলে ধরবো।

বাংলাদেশের কুকি, লুসাই ও খুমীদের কাছে সেই সৃষ্টিকর্তা বা প্রধান দেবতার নাম পাথিয়ান; মুরংদের—তুরাই; সেন্দুজ, পাংখো ও বনযোগীদের পত্যেন; খাসীয়াদের—উ ব্লাই নবং থউ; গারোদের—তাতারা রাবুগা; সাঁওতালদের—ঠাকুর জিয়ো; ওরাওঁদের—ধরমেশ; চাকমা, মগ, হাজং, হদি, টিপরা, রাজবংশী প্রভৃতির—ঈশ্বর বা পরমেশ্বর ইত্যাদি।

আমাদের দ্বিতীয় বিষয়টির নাম "পৌরহিত্য বাদ"। ইতি পূর্বের বিস্তারিত আলোচনা থেকে আমরা হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ্যবাদ বা পৌরহিত্যবাদ-এর কথা জানতে পেরেছি। ব্রাহ্মণগণই যে উক্ত সমাজের ধর্মীয় বিধি নিষেধাদির প্রবর্তন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার কাজকে সম্পূর্ণ রূপে নিজেদের আয়ত্বাধীন ও অধিকার ভুক্ত করে রেখেছেন তার নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণাদি সেখানে তুলে ধরা হয়েছে।

উপজাতীয়দিগের মধ্যেও সেই একই অবস্থা বিরাজমান থাকতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ আমরা অতঃপর এক একটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নাম লিখবো এবং পাশাপাশি তাদের ভাষায় ব্রাহ্মণ বা গুরুদেবকে ওদের ভাষায় কি বলা হয়ে তা তুলে ধরবো।

কুকি, ও লুসাইগণ তাদের ভাষায় ব্রাহ্মণকে বলেন—থেমপু; খাসীয়াগণ—লাংদুহ; রাজবংশী, হাজং, দালুই, হদি প্রভৃতিরা ঠাকুর; টিপরাগণ—আজোই বা আচাই; গারোরা—কমল; ওঁরাওগণ—নাগমেতিয়া প্রভৃতি।

ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের উপজাতীয়গণ

তাদের ব্রাহ্মণ বা গুরু পদবাচ্য ব্যক্তিদিগকে শামান (Shamen), মেডিসিনম্যান (Medicine-man), আংগাকাক (Angnkak) প্রভৃতির কোন না কোন একটা বলে অভিহিত করে থাকেন।

আদিম সমাজের অতি-প্রাকৃত বিশ্বাসের মূল সূত্র কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আরণ্য সংস্কৃতির প্রণেতা উক্ত গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"আদিম সমাজ জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে গিয়ে যখন দেখেছে যে, প্রকৃতির অন্তরালের অদৃশ্য শক্তির কাছে তারা বড়ো অসহায় তখনই তারা হাত বাড়িয়েছে অদৃশ্য শক্তির (Unseen fores) কাছে।

কেননা জন্ম-মৃত্যু, রোগ-জরা, ভয়-ভীতি ইত্যাদি তাদের আয়ত্বের বাইরে এবং নিশ্চয়ই এসব অদৃশ্য শক্তির দ্বারা পরিচালিত। তাই সে অদৃশ্য শক্তির অন্বেষণ করতে গিয়ে গোটা প্রকৃতিই তাদের কাছে পূজার উপজীব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এজন্যেই আদিম সমাজকে প্রকৃতির পূজারী বা জড়োপাসক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় "অ্যানিমিজম" (Animism)।

স্থানাভাব বশতঃ উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়ানো আর সম্ভব হচ্ছেনা বলে এখানে শুধু বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতীয়দিগের কয়েকটি মাত্র সম্প্রদায়ের কথা তা-ও অতি সংক্ষেপে তুলে ধরতে হলো। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির ধর্মীয় বিশ্বাস এবং পূজা-প্রার্থনাদি সম্পর্কে কিছুই বলা সম্ভব হলোনা।

তবে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকেই উপজাতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং মূর্তিপূজা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী রয়েছেন এমন পাঠকদিগকে আরণ্য-সংস্কৃতি বা এই ধরণের অন্যান্য গ্রন্থাদি পাঠ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

এইসব উপজাতীয় মানুষেরা প্রায় সকলেই সাধারণতঃ বন-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত এবং আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত সমাজ থেকে দূরে অবস্থান করেন, নিদারুণ পশ্চাৎপদতা এবং সুকঠিন রক্ষণশীলতার কারণে তাদের অধিকাংশই আধুনিক শিক্ষা-সভ্যতাকে ভয় করেন এবং সর্বপ্রযত্নে সেই পরিবেশ থেকে

তারা জনসাধারণকে এটাই বুঝাতে চেয়েছিলেন যে কোন কিছুর সত্য,

নিজদিগকে দূরে রাখেন। তাদের অধিকাংশই যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সভ্যতার ধারে কাছেও যান না তার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীও আমরাই। এসব কারণে আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত মানুষেরা প্রায় সকলেই যে এই সব উপজাতীয়দিগকে অসভ্য বর্বর প্রভৃতি বলে অভিহিত করেন সেটাও আমাদের অজানা নেই।

এই তথাকথিত বর্বর ও অসভ্যদিগের ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানাদির সাথে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হিন্দুসমাজের এই মিল দেখে কেউ যদি মনে করেন যে হিন্দুসমাজ অন্যান্য দিক দিয়ে যত উন্নতি-অগ্রগতিই সাধন করুক না কেন অন্ততঃ ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় প্রথা-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় আচারানুষ্ঠাননাদির দিক দিয়ে তাঁরা খুব বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এই অসভ্য বর্বরদিগের প্রায় সমপর্যায়েই রয়ে গিয়েছেন তা হলে তাকে খুব বেশী দোষ দেয়া যায় কিনা চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ সুধী মন্ডলীর কাছে গভীর ভাবে সে কথা ভেবে দেখার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি।

মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব ঃ

এ কথা বলাই বাহুল্য যে "মূর্তিপূজার গোড়ার থা" জানতে হলে মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব বা এখন থেকে কতদিন পূর্বে এই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা বা গোড়া পত্তন হয়েছিল অতি অবশ্যই সে কথা আমাদিগকে জানতে হবে। অথচ বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং ভীষণভাবে তমসাচ্ছন্ন। জটিল এবং তমসাচ্ছন্ন এজন্যেই বলা হলো যে—

o কবে, কখন এবং কিভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল তার নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

o প্রায় সকল দেশের মূর্তিপূজার প্রবর্তক বা প্রবর্তকেরাই মূর্তিপূজা সম্পর্কীয় যে সব বিবরণ রেখে গিয়েছেন তা শুধু অদ্ভূত, অবিশ্বাস্য এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীতই নয়—ভীষণ ভাবে বিভ্রান্তিকরও।

o পৃথিবীর সকল দেশে একই সময়ে এবং একই সঙ্গে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটে নি। সুতরাং সকল দেশের মূর্তিপূজাও সমান ভাবে প্রাচীন হতে পারে না। এমতাবস্থায় পৃথিবীর কোন্ মূর্তিটি বা কোন্ মূর্তিসমূহ সর্ব-

প্রথম নির্মিত ও পূজিত হয়েছিল তা নির্ণয় করা শুধু ভীষণ ভাবে কষ্ট-সাধ্যই নয় এরূপ অসম্ভবও।

o কঠোর ধৈর্য ও প্রচেষ্টার সাহায্যে যদি এসব জটিলতা এবং ধূম্রজাল অপসারিত করা সম্ভবও হয় এবং অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ও হেঁয়ালীপূর্ণ বিবরণ সমূহের মধ্যে যদি কিছু সত্য নিহিত থেকেও থাকে তবে সে গুলোকে বিশাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্ধার করে আনা এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তুলে ধরা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।

অথচ মূর্তিপূজার গোড়ার কথা' জানা আমাদের প্রয়োজন। অন্যথায় এই পুস্তক লিখা যে একান্ত রূপেই তাৎপর্যহীন এবং পন্ডশ্রম মাত্র সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে যে একমাত্র ভারতীয় হিন্দুসমাজ ছাড়া পৃথিবীর আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত দেশ সমূহের কুত্রাপি আজ আর এ ধরণের মূর্তিপূজা বিদ্যমান নেই।

অতএব প্রথমে আমরা ভারতীয় হিন্দুসমাজের মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ে ব্রতী হবো—এবং পরে অন্যান্য কয়েকটি দেশের প্রতি দৃষ্টি ফেরাবো। তবে পৃথিবীর যে দেশটির মূর্তিপূজা সর্বাধিক প্রাচীন অন্য কথায় পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনাকারী দেশ কোনটি তা নির্ণয়ের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকবে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এ কাজে প্রচন্ড ধরণের কতিপয় বাধা মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গকে মূল আলোচনায় অংশ গ্রহণের পূর্বে অতি অবশ্যই এই বাধাগুলি সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। অন্যথায় প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হয়ে উঠবেনা। অতএব প্রথমেই সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

এ কাজে প্রথম ও প্রধান বাধা হলো: মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জন-মনে গড়ে তোলা এবং কঠোর ভাবে বদ্ধমূল হয়ে পড়া নিদারুণ ভ্রান্ত ধারণার বিদ্যমানতা।

উল্লেখ্য যে, মূর্তিপূজাকে সত্য, সনাতন এবং বিধি-সম্মত বলে চিরস্থায়ী ভাবে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠাদানের উদ্দেশ্যেই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মহল এর প্রাচী-নত্ব প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন।

তারা জনসাধারণকে এটাই বুঝাতে চেয়ে ছিলেন যে কোন কিছুর সত্য, সনাতন এবং বিধি-সম্মত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো তার প্রাচীনত্ব বা সুদীর্ঘ-কাল ধরে চালু থাকা। যেহেতু মূর্তিপূজা সুপ্রাচীন কাল থেকে অব্যাহত ভাবে চালু রয়েছে—অতএব এটা সত্য, সনাতন এবং বিধিসম্মত না হয়ে পারে না।

স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের এ প্রচেষ্টা যে সফল হয়ে ছিল অদ্যাপি মূর্তিপূজা চালু থাকা এবং মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জনমনে বদ্ধমূল ভ্রান্তধারণার বিদ্যমানতাই সে-কথার জাজ্জল্যমান প্রমাণ বহণ করছে।

অথচ অন্ততঃ ভারতীয় হিন্দুসমাজের ক্ষেত্রে দেবদেবী, অপদেবতা, গ্রাম দেবতা, ভূত-প্রেত প্রভৃতি সম্পর্কীয় ধারণা বিশ্বাস সুপ্রাচীন হলেও সেই অনুপাতে মূর্তিপূজা যে মোটেই সুপ্রাচীন নয় তার জাজ্জল্যমান প্রমাণ এই পুস্তকের "পুরাণের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে আমরা জানতে পেয়েছি।

মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব প্রমাণের তাদের এই প্রচেষ্টা কি ভাবে সফল হয়ে-ছিল তার তিনটি মাত্র কারণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

o বৈদিক, উপনিষদীয় এমন কি দ্বাপর যুগের শেষ ভাগেও যে মূর্তি-পূজার উদ্ভব ঘটে নি এবং বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি বিশ্বস্ততম ধর্মগ্রন্থ সমূহ এবং প্রখ্যাত মুণি মহাপুরুষদিগের অধিকাংশই যে মূর্তিপূজাকে অন্যায়, অসার এবং মূর্খ ও অবিজ্ঞ-জনোচিত কাজ বলে কঠোর ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন সাধারণ মানুষেরা সে-কথা জানতো না—জানার কথাও নয়।

মূর্তিপূজা প্রবর্তনে ইচ্ছুক ব্রাহ্মণদিগের প্রচেষ্টায় এটা চালু হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারা ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকে বংশানু-ক্রমিক ভাবে এই অনুষ্ঠানকে চালু থাকতে দেখেছেন এবং দূর থেকে হলেও এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ফলে এটা যে সত্য, সনাতন এবং বিধিসম্মত অনুষ্ঠান হিসেবে আবহমানকাল ধরে চালু রয়েছে এমন একটা ধারণা তাদের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে পড়া মোটেই বিচিত্র নয়।

o মূর্তিপূজা যে আসল কাজ নয় বরং একত্ববাদী ধ্যান ধারণায় উপনীত হওয়ার জন্যে প্রশিক্ষণ-মূলক একটি সাময়িক ব্যবস্থামাত্র সে কথা যাঁরা জানতেন তাঁদের মৃত্যুর পরে তাঁদের বংশধরেরা স্বাভাবিক নিয়মেই কালক্রমে সে কথা ভুলে গিয়েছেন। ফলে এটা যে সত্য, সনাতন, বিধিসম্মত অনুষ্ঠান

রূপে আবাহমান কাল ধরে চালু রয়েছে এমন একটা ধারণা তাদের মন ও মগজে সুদৃঢ়রূপে আসন গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছে।

০ পুরাণ জাতীয় ধর্মগ্রন্থ সমূহ, কল্প-কাহিনী, চরিতামৃত, স্তব মালা, গান, কবিতা, নাটক নভেল প্রভৃতি এবং সাড়ম্বর পূজানুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মূর্তিপূজাকে সত্য, সনাতন, অপরিহার্য এবং আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে এমন একটা ধারণা জনগণের মন-মানসে বদ্ধমূল করে তোলা হয়েছে।

এই বদ্ধমূল করে তোলার কাজে তারা কত দূর সফল হয়েছেন অতঃপর তার দুটি মাত্র বাস্তব ঘটনাকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

প্রথমেই মুলতানের রক্তবর্ণের চর্মাবৃত এবং রক্তবর্ণের চক্ষু-তারকা বিশিষ্ট আদিত্য (সূর্য) দেবের কাষ্ঠমূর্তিটির কথা তুলে ধরা যেতে পারে। সর্বসাধরণের বদ্ধমূল বিশ্বাস মূর্তিটি শেষ "কৃত্য" যুগে স্থাপিত হয়েছে।

"আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে হিসেব করে দেখানো হয়েছে যে "কৃত্য" যুগের শেষে মূর্তিটি নির্মিত হয়ে থাকলে এখন থেকে তার সময়ের ব্যবধান দাঁড়ায় ২,১৬,৪০২ বছর।

অথচ হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা যে এখন থেকে পাঁচ হাজার বছরের উর্ধে নয় তার অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে এবং যথা স্থানে তা তুলে ধরা হবে। তাছাড়া এত দীর্ঘকাল কোন কাষ্ঠমূর্তি অক্ষত অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে কি না সে কথাও বিশেষ ভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। অথচ ও সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা বদ্ধমূল থাকার কারণে কোন দিনই সে কথা ভেবে দেখা হয় না।

দ্বিতীয় বাস্তব ঘটনাটি অম্বুবাচী উৎসব সম্পর্কে। এই উৎসবের কথা ইতিপূর্বে যথাস্থানে বলা হয়েছে। উৎসবের কথা বলা হলেও যে কাহিনীটিকে অবলম্বন করে এই উৎসবের আয়োজন সে কাহিনীটির বিবরণ সেখানে তুলে ধরা হয় নি। কাহিনীটি হলো:

আদি যুগে যখন পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবই ঘটে নি, শুধু দেবদেবী, দৈত্য-দানব এবং ভূত-প্রেতাদির কাজ-কারবার চলছিল সে সময়ে পতির নিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষ রাজার কন্যা সতী দেহ ত্যাগ করেন।

ভগবান মহাদেব স্ত্রীর এই আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে উম্মাদ হয়ে ছুটে আসেন। ক্রোধে প্রস্রাব করতঃ শ্বশুরের যজ্ঞ ভাসিয়ে দিয়ে সতীর মৃত দেহ

কাঁধে নিয়ে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়াতে থাকেন। সৃষ্টি ধ্বংসের আশংকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত হন এবং মহাদেবকে সম্মোহিত করেন। ফলে মহাদেব সতীর দেহ পরিত্যাগ করতঃ হিমালয় পর্বতে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত হন।

সুযোগ বুঝে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে সতীর মৃত দেহকে খন্ড বিখন্ড করেন। একান্নটি খন্ড চক্রের ঘূর্ণনে চারি দিকে ছুটে যায় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পতিত হয়। এটাই "একান্ন পীঠ" বা তীর্থ স্থান নামে খ্যাত। সতীর স্ত্রী অঙ্গটি কামাখ্যা পর্বতে পতিত হয়েছিল বলে বর্ণিত রয়েছে। এবং একথাও বর্ণিত রয়েছে যে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দশম দিবসে ঐ অঙ্গ থেকে সতীর ঋতুস্রাব হতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ঋতু-স্রাবকে কেন্দ্র করেই কামাখ্যা (উক্ত স্ত্রী অঙ্গটির) পূজাও অম্বুবাচীর উৎসব পালিত হয়ে আসছে।

বলা আবশ্যক যে, উল্লেখিত স্ত্রী অঙ্গটি প্রস্তরনির্মিত। কোথায় সতী আর কোথায় তাঁর এই প্রস্তর নির্মিত স্ত্রী অঙ্গ! অথচ সেই কল্প যুগ থেকে নিয়মিত ভাবে এই ঋতুস্রাব হয়ে চলছে বলে হিন্দুসমাজ এবং পার্বত্য উপজাতীয়দিগের মধ্যে গভীর বিশ্বাস বিদ্যমান থাকতে দেখা যায়।

উদাহরণের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি: সেই আদিম কাল থেকে মূর্তিপূজা চালু রয়েছে বলে জনমনে গড়ে তোলা এই গভীর ভ্রান্তবিশ্বাসের বিদ্যমানতাকে অস্বীকার বা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই। মূর্তিপূজকদিগের মন-মানস এবং কার্যকলাপের খবর রাখেন এমন ব্যক্তি মাত্রই এই গভীর ভ্রান্তবিশ্বাসের সাথে কম বেশ পরিচিত রয়েছেন।

হাজার হাজার বছরে এবং পুরুষানুক্রমে মন-মগজে এমন সুগভীর হয়ে গেড়ে বসা এই ভ্রান্তবিশ্বাসের অপনোদন কিভাবে করা যায় সেটাই এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

তবে মিথ্যার ধূম্রজাল যত প্রকান্ড এবং প্রচন্ডই হোক সত্যকে সত্য করে এবং সার্থক ভাবে তুলে ধরতে পারলে ওসব কিছুকে কাটিয়ে ওঠা যে সম্ভব অন্য কথায় সত্যের জয় যে অবশ্যম্ভাবী সে দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে সত্যকে সত্য করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে

যাবে। প্রকৃতই যারা সত্যানুসন্ধিৎসু এবং স্থির-প্রাজ্ঞ অন্ততঃ তাঁরা যে এ থেকে উপকৃত হবেন সে আশাও দৃঢ় ভাবেই আমরা পোষণ করি।

অতঃপর মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান উপায়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। তবে এ উপায়টি সম্পর্কেও যে জনমনে প্রচন্ড ধরনের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে প্রথমেই সে কথা বলে রাখতে হচ্ছে।

অতএব সেই উপায়টি কি সেকথা বলার পরে তার সম্পর্কে যে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে এবং সবশেষে প্রকৃত পক্ষে পুরাণ সমূহ কতদিনের প্রাচীন সে সম্পর্কীয় তথ্যাবলী তুলে ধরা হবে।

আমাদের কথিত উপায়টি হলো—"পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব নির্ণয়"। কেননা মূর্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও তথ্যাবলী একমাত্র পুরাণ জাতীয় গ্রন্থ সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে দেখা যায়। অতএব পুরাণ প্রণয়নের সময়েই যে ওগুলোর রচনা এবং লিপিবদ্ধ করণের কাজ সমাধা করা হয়েছিল সে কথা অনায়াসেই বুঝতে পারা যাচ্ছে।

এমতাবস্থায় পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব নির্ণয়ই যে মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের একমাত্র না হলেও অন্যতম প্রধান উপায় সেকথা বুঝতে পারাও মোটেই কঠিন নয়।

কিন্তু মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টির মতো পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও যে প্রচন্ড ধরণের ভ্রান্তধারণা সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে ইতিপূর্বে সেকথা বলা হয়েছে।

পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে জনমনে গড়ে তোলা এই গভীর ভ্রান্ত-ধারণার দুটিমাত্র উদাহরণকে নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

o পদ্ম পুরাণের সৃষ্টিখন্ডে পুরাণ শাস্ত্রকে সর্বশাস্ত্রের আদি, সর্ব লোকের উত্তম, সর্বজ্ঞানের উপপাদক, ত্রিবর্ণের সাধক, পবিত্র এবং শত কোটি শ্লোকে নিবদ্ধ বলা হয়েছে।

সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, লোক সকল নিঃশেষ হলে ব্রহ্মার আদেশে কেশব (শ্রীকৃষ্ণ—লেখক) বাজি (ঘোড়া—লেখক) রূপে সমুদ্র থেকে পুরাণ আহরণ করেন।

o অগ্নি পুরাণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—মৎস্য কূর্মাদি রূপধারী কালাগ্নিরুদ্র রূপী বিষ্ণুই ব্রহ্মেশ্বর এবং পুরাণই বিদ্যাসার। পুরাকালে ব্রহ্মা-

বিদ্যাক্ষর পরম অগ্নি পুরাণ ও ভগবানের মৎস্যাদিরূপ ধারনের কারণ দেবদের বিষ্ণু বশিষ্ট মুণির এবং ব্রহ্মা দেবগণের নিকট বর্ণনা করেন।

পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ভ্রান্তধারণা সৃষ্টির উদাহরণ তুলে ধরাই এখানে আমাদের লক্ষ্য। অতএব এসব বিবরণের সত্যতা, বাস্তবতা প্রভৃতি সম্পর্কে কোনরূপ মন্তব্য করার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমরা শুধু সুধী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে চাই যে, "পুরাণ সমূহ অনাদিকাল থেকে বিদ্যমান রয়েছে" জনমনে এই ভ্রান্তধারণা সৃষ্টিই এসব বিবরণ প্রচারের লক্ষ্য কিনা গভীরভাবে সেকথা আপনারা ভেবে দেখুন। বলা আবশ্যক যে, শুধু পদ্ম এবং অগ্নি পুরাণই নয়—প্রতিটি পুরাণ এবং উপ-পুরাণই কেউবা নিজেকে কোটি কল্প বছরের, কেউবা কোটি কোটি বছরের পুরাতন বলে দাবী করছে। আবার কেউবা বিশ্বসৃষ্টির পূর্বেও বিদ্য-মান থাকার দাবী জানাচ্ছে।

পুরাণ সমূহ বেদব্যাস মুণির রচিত বলে যাঁরা দাবী করেন তাঁদের দাবী যে সত্য হতে পারেনা এবং বেদব্যাস মুণির তিরোধানেরও বহু পরে যে এসব রচিত হয়েছে ইতিপূর্বে সে সম্পর্কে বহু প্রমাণ আমরা তুলে ধরেছি। অতঃ-পর এখন থেকে মোটামুটিভাবে কতদিন পূর্বে পুরাণ সমূহ রচিত হয়েছে তার বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কতিপয় প্রমাণকে নিম্নে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে :

o পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিশ্বকোষের অভিমত :

Purans (disorderd geneologis of kings compounded with legends, put in present form fourth country A. D. and latter).

—Encylopedia of wcrid History by W. L. Langer page 43.

ডব্লু, এল, লেঙ্গারের এই গবেষণা সঠিক হয়ে থাকলে ধরে নিতে হয় যে, যীশুখৃষ্টের ৪০০ বছর পরে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে।

o ডঃ বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় এম, এ, (সংস্কৃত বেদ) রিসার্চ স্কলার, সং-স্কৃত বিভাগ, প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রয়াগ; তাঁর লিখিত "বেদ ও পুরাণের ভিত্তিতে ধর্মীয় ঐক্যের জ্যোতি" নামক গ্রন্থে বহু তথ্য প্রমাণাদি তুলে ধরে মন্তব্য করেছেন :

"অতএব পুরাণ রচনার সময়কাল প্রায় ২,৫০২ খৃঃ পূঃ হইতে ২,৫৫৩ খৃঃ পূর্বের মধ্যকাল হইবে।"

—ঐ ১১ পৃঃ

শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণা সঠিক হলে ধরে নিতে হয় যে এখন থেকে প্রায় ৩৫০০—৪০০০ বছর পূর্বে পুরাণ রচিত হয়েছে।

উল্লেখ্য : মহামুণি বেদব্যাস যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরেও জীবিত ছিলেন তার বহু অকাট্য প্রমাণ এই পুস্তকের "পুরাণ প্রণেতা বা প্রণেতাদিগের পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধে আমরা পেয়েছি।

আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে। এ সম্পর্কীয় বহু তথ্যপ্রমাণও এই পুস্তকের যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

"বেদব্যাস মুণি কর্তৃক পুরাণ সমূহ প্রণীত হয়েছে" মহল বিশেষের এই দাবী সত্য হলে পুরাণ সমূহের বয়স যে পাঁচ হাজার বছরেরও কম সে-কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

কিন্তু পুরাণ সমূহ যে বেদব্যাস মুণি কর্তৃক প্রণীত হয় নি এবং হতে যে পারে না, বরং তার মৃত্যুর অনেক পরে অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্তৃকই যে প্রণীত হয়েছে তার বহু অকাট্য প্রমাণ এই পুস্তকের যথাস্থানে আমরা পেয়েছি।

সে দিক থেকে বিবেচনা করা হলেও শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণাকে সঠিক বলেই ধরে নিতে হয়। শুধু শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় মহাশয়ই নন তাঁর মতো অনেকেই পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রায় একই ধরণের অভিমত প্রকাশ করেছেন।

উদাহরণ স্বরূপ মাত্র আর একজন প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পন্ডিত ব্যক্তির এ সম্পর্কীয় অভিমতকে তুলে ধরা যাচ্ছে। এই প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পন্ডিত ব্যক্তিটি হলেন—ভারতীয় আর্যসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বহু শাস্ত্রবিদ ও গবেষক মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতী।

তিনি তাঁর রচিত 'সত্যার্থ প্রকাশ'' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে এ সম্পর্কীয় যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার কয়েকটি মাত্রকে নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"মূর্তিপূজা এবং তীর্থ সনাতন কাল হইতে প্রচলিত আছে" এই দাবী খন্ডন করতে গিয়ে "সত্যার্থ প্রকাশের" ৫৭০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

"... ... যদি ইহা চিরকাল ছিল তবে বেদ এবং ব্রাহ্মণাদি ঋষি মুণি কৃত গ্রন্থ সমূহে তাহার উল্লেখ নাই কেন? এই মূর্তিপূজা আড়াই অথবা তিন সহস্র বৎসরের কাছাকাছি বাম মার্গী এবং জৈনদিগের দ্বারা প্রচলিত হইয়াছিল। প্রথমে আর্যাবর্তে ছিল না।''

''এসব তীর্থ সমূহও ছিল না। যখন জৈনগণ-গিরনার, পালিটানা শিখর, শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করিয়াছিল, সে সময় পৌত্তলিকগণও সেই সব তীর্থের অনুকূলে তীর্থ রচনা করে।"

"যদি কেহ এ সকলের আরম্ভ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি পান্ডাদিগের অতি প্রাচীন খাতা পত্র এবং তাম্রলিপি প্রভৃতি দেখিবেন। তাহা হইলে ইহা নির্ণয় হইবে যে এইসব তীর্থগুলি পাঁচশত অথবা একসহস্র বৎসরের এদিকেই রচিত হয়েছে। সহস্র বৎসরের ওদিকের লেখা কাহারও নিকট দেখা যায় না। সুতরাং তীর্থগুলি আধুনিক।"

বেদব্যাস মুণিকে যাঁরা পুরাণ সমূহের প্রণেতা বলে দাবী করেন তাঁদের দাবীকে খন্ডন করতে গিয়ে উক্ত গ্রন্থের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন :

''বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণের কর্তা হইলে পুরাণগুলিতে এত অলীক গল্প থাকিত না। কেননা শারীরিক সূত্র, যোগ শাস্ত্রের ভাষ্য প্রভৃতি ব্যাসোক্ত গ্রন্থসমূহ অবলোকন করিলে জানা যায় যে, ব্যাসদেব মহান বিদ্বান, সত্যবাদী, ধার্মিক যোগী ছিলেন। তিনি এমন মিথ্যা কথা কখনও লেখেন নাই।"

''এতদ্বারা সিদ্ধ হয় যে, যে সকল সম্প্রদায়ী লোকেরা পরস্পর বিরোধী ভাগবতাদি নবীন কপোল কল্পিত গ্রন্থ সমূহ রচনা করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্যাসদেবের গুণের লেশমাত্রও ছিল না। আর বেদশাস্ত্রের বিরুদ্ধ অসত্য কথা লেখা ব্যাসদেবের ন্যায় বিদ্বান পুরুষের কার্য নহে। কিন্তু ইহা (বেদশাস্ত্র) বিরোধী, স্বার্থপর, অবিদ্বান ব্যক্তিদের কর্ম।''

উক্ত গ্রন্থের ৫৮০ পৃষ্ঠায়—''পুরাণের সকল কথাই কি মিথ্যা? না কোন সত্যও আছে?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন—''অনেক কথাই মিথ্যা। তবে ঘুণাক্ষর ন্যায় অনুসারে সত্যও আছে। যাহা সত্য তাহা বেদাদি

সত্য শাস্ত্রের। কিন্তু যাহা মিথ্যা তাহা পোপদের পুরাণ রূপগ্রহ। যথা—শিবপুরাণে শৈবগণ শিবকে পরমেশ্বর মানিয়া বিষ্ণু, ইন্দ্র, গণেশ এবং সূর্য্যাদিকে তাঁহার দাস ঠিক করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ **বিষ্ণুপুরাণ** প্রভৃতিতে বিষ্ণুকে পরমাত্মা এবং শিব প্রভৃতিকে বিষ্ণুর দাস করিয়াছেন। **দেবী ভাগবতে** দেবীকে পরমেশ্বরী কিন্তু শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতিকে তাঁহার কিঙ্কর করিয়াছেন। **গণেশ খণ্ডে** গণেশকে ঈশ্বর এবং অবশিষ্ট সকলকে দাস করা হইয়াছে।"

"বলুন তো এ সকল কথা যদি এই সমস্ত সম্প্রদায়ী পোপদিগের না হয় তবে কাহাদের? যে কোন একজন সাধারণ ব্যক্তির রচনায় এমন পরস্পর বিরুদ্ধ কথা থাকিতে পারে না। এবং বিদ্বানদের রচিত হইলে এসকল কখনও থাকিতে পারে না। ইহাদের একটিকেও সত্য স্বীকার করিলে অপরটি মিথ্যা হয়। আর যদি দ্বিতীয়টিকে সত্য স্বীকার করা হয়, তৃতীয়টি মিথ্যা, আবার তৃতীয়টিকে সত্য মানিলে অন্য সবগুলিই মিথ্যা হয়।"

এই পুস্তকের পুরাণ সম্পর্কীয় আলোচনা, বিশ্বকোষ এবং এই প্রখ্যাত ও সর্বজনমান্য পন্ডিত দ্বয়ের সুচিন্তিত অভিমত সমূহ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা হলে পুরাণের প্রাচীনত্ব সম্পর্কীয় এত কালের ধারণা যে বিভ্রান্তিকর এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহলের কারসাজিরই ফল সে কথা সর্বসাধারণ বিশেষ করে সত্যানুসন্ধিৎসু এবং স্থির প্রাজ্ঞ মহলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি।

মূর্তিপূজাকে যে বিশ্বস্ততম ধর্ম গ্রন্থ সমূহ এবং অধিকাংশ মহাপুরুষ অসার এবং অবিজ্ঞ-জনোচিত কাজ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন তার বহু তথ্য প্রমাণ এই পুস্তকের যথাস্থানে তুলে ধরা হয়েছে।

অতঃপর মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "সত্যার্থ প্রকাশের" বিভিন্ন স্থানে হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা-কাল সম্পর্কে যে সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর কয়েকটি মাত্রকে পাঠক বর্গের ভেবে দেখার জন্য নিম্নে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে:

মহর্ষী দয়ানন্দ তাঁর সত্যার্থ প্রকাশের ৫৭০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—

"এসব তীর্থ সমূহও ছিল না; যখন জৈনগণ গিরনার, পালিটানা শিখর,

শত্রুঞ্জয় এবং আবু প্রভৃতি তীর্থ রচনা করিয়াছিল সে সময়ে পৌত্তলিকগণও সেই সব তীর্থের অনুকূলে তীর্থ রচনা করে।"

বলা বাহুল্য, হিন্দু এবং জৈনদিগের তীর্থ রচনা যে একই সময়ের ঘটনা এ থেকে তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর উক্ত গ্রন্থের ৮২০ পৃষ্ঠায় "মূর্তিপূজার প্রচলন জৈনদের মতবাদ হইতে হইয়াছে" শিরোনাম দিয়ে মূর্তিপূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণাদি তিনি তুলে ধরেছেন এবং উপসংহার টানতে গিয়ে দৃঢ় কন্ঠে বলেছেন—"এখন দেখ! জৈনমত হইতেই মূর্তিপূজা সংক্রান্ত যাবতীয় কলহ-বিবাদ প্রচলিত হইয়াছে। ভ্রান্তি এবং অসত্যের মূলাধারও এই জৈনমত।"

ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা রয়েছে যে জৈন মতবাদের প্রবর্তক "বর্ধমান" যীশু খ্রীষ্টের ৫২৭ বছর পূর্বে উত্তর বিহারের 'বৈশালী নগর' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। পরে তাঁর নাম হয় "মহাবীর।" ত্রিশ বছর বয়ক্রম পর্যন্ত সংসার ধর্ম পালন করার পরে তিনি তপস্বী হন এবং বারো বছর পরে তিনি মহাবীর নাম ছাড়াও "জিন" (রিপুজয়ী) এবং নির্গ্রন্থ (সংসার বন্ধন মুক্ত) নামে পরিচিত হন। প্রায় ত্রিশ বছর বিভিন্ন স্থানে স্বীয় মতবাদ প্রচারের পরে তিনি দেহ ত্যাগ করেন। বলাবাহুল্য, তাঁর "জিন" নাম থেকেই তার এই মতবাদে বিশ্বাসীগণকে 'জৈন" বলা হয়ে থাকে।

পরবর্তী সময়ের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ যে মহাবীরের মূর্তিনির্মাণ ও সেই মূর্তির পূজানুষ্ঠানকে সর্বপ্রধান ধর্মীয় অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সে কথাও জানা রয়েছে।

মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতীর মতে এটাই ছিল আর্যাবর্তের প্রথম মূর্তিপূজা এবং সাধারণ হিন্দুসমাজকে এর প্রভাব থেকে দূরে রাখার অভিপ্রায়েই যে এ সময় থেকে হিন্দুসমাজেও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিনির্মাণ এবং পূজা উপাসনার কাজ শুরু হয়েছিল তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সে কথাই ব্যক্ত করেছেন।

মহর্ষী দয়ানন্দ সরস্বতীর এই অভিমত নির্ভুল হলে আমাদিগকে অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে জৈনদিগের সাথে সাথে হিন্দুসমাজেও মূর্তিপূজার গোড়া পত্তন হয়েছিল।

কিন্তু একটি বিশেষ কারণে তাঁর এই অভিমতকে আমরা পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারছিনা। সেই বিশেষ কারণটি হলো : গৌতম বুদ্ধের গৃহ-ত্যাগ এবং সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ।

মানুষের জড়া, ব্যাধি, মৃত্যু, বার্ধক্য প্রভৃতি এবং হিন্দুসমাজের জাতি-ভেদ প্রথা, মূর্তিপূজা ও অন্যান্য কদাচারই যে তাঁর মনোবেদনা এবং সংসার ত্যাগের কারণ ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে। বৌদ্ধত্ব লাভের পরে তিনি যে তাঁর শিষ্যদিগের মধ্যে বিশেষ করে মূর্তিপূজার অসার-তার কথাই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন সে কথাও তাদের অজানা নয়।

ঐতিহাসিকদিগের হিসেব অনুযায়ী যীশুখৃষ্টের ৫৬৮ বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করেন এবং আশি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এ হিসেবে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়।

এ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী হওয়া এবং মহাবীরের সংসার ত্যাগ প্রায় একই সময়ের ঘটনা।

এখন কথা হলো : মহাবীরের জন্মের প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজা চালু থাকতে দেখে গৌতম বুদ্ধ যদি ব্যথিত হয়ে থাকেন তবে মহাবীরের মৃত্যুর পরে তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্তৃক মূর্তিপূজার সূচনা বা গোড়াপত্তন হওয়া এবং তাদের দেখাদেখি হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজা চালু হওয়া সম্পর্কে মহর্ষী দয়ানন্দের অভিমত সত্য হতে পারে না।

মহর্ষী দয়ানন্দের এই ভুল হওয়ার কারণ আমরা জানিনা এবং তা নিয়ে চুল চেরা বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং সুযোগও আমদের নেই।

আমরা শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছি যে, যেহেতু এখন থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ মূর্তিপূজার সাথে পরিচিত হয়ে-ছিলেন অতএব একরূপ নিশ্চিত রূপেই ধরে নিতে হয় যে, এখন থেকে অন্ততঃ তিন হাজার বছর পূর্বে হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে হিন্দুসমাজ কর্তৃক দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, শনি, সুবচনী, মনসা, মঙ্গলচন্ডী প্রভৃতি বহু সংখ্যক দেবদেবীর মূর্তিপূজিত হয়ে চলেছে। সবগুলি দেব-

দেবীর মূর্তিকে যে একদিনে এবং একই সঙ্গে উপাস্যের আসনে বসনো হয় নি সে কথা সহজেই অনুমেয়। মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব বা সূচনার কথা জানতে হলে কোন দেব বা দেবীর মূর্তিকে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে নির্বাচন করতঃ এই কাজের সূচনা করা হয়েছিল সেকথা অবশ্যই আমাদিগকে নির্ণয় করতে হবে।

এখানে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাইনা। পরবর্তী "মূর্তিপূজার সূচনায় পরিবেশের প্রভাব" শীর্ষক নিবন্ধে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

অতঃপর অন্যান্য কতিপয় দেশের মূর্তিপূজা কত প্রাচীন সে সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

০ ইরাকের রাজা নমরূদ (বিল, নিপর বা আল নিমরোদ—পরাক্রান্ত শিকারী দেবতা)-এর রাজকীয় মন্দিরে প্রধান দেবতা শমাশ বা শিমূশ (সূর্য-দেব) ছাড়াও সিন (চন্দ্র দেবতা) ইসতার (প্রেম এবং সৌন্দর্যের দেবতা), অন-লীল (মাটির দেবতা) প্রভৃতি দেবদেবীদিগের মূর্তিপূজা প্রচলিত থাকা এবং তার বিরোধীতা করার অপরাধে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে অন্যান্য শাস্তি ছাড়াও অগ্নিতে নিক্ষেপ করার ঘটনা প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে।

ঐতিহাসিকদিগের মতে যীশুখৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। অতএব এটা ছিল এখন থেকে প্রায় ৪৫০০ বছর পূর্বের ঘটনা।

এমতাবস্থায় এই মূর্তি সমূহের নির্মাণ এবং পূজানুষ্ঠান যে এখন থেকে অন্ততঃ ৪৫০০ বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল সেকথা অনায়াসে বলা যেতে পারে।

০ পবিত্র কাবা গৃহের অভ্যন্তরে হোবল, লাত, মানাত, উজ্জা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে ৩৬০টি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সম্পূজিত হওয়ার ঘটনাও ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কিন্তু প্রসিদ্ধ হলেও ইরাকের মূর্তিসমূহের মতো এগুলি তত প্রাচীন ছিল না। কেননা ইরাকের অগ্নি পরীক্ষারও বহু পরে ৮৬ বছর বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শিশু পুত্র ইসমাঈল এবং হাজেরা (রাঃ)-কে যে কাবা সন্নিহিত স্থানে রেখে গিয়েছিলেন এবং কয়েক বছর পরে এই ইসমাঈল (আঃ) সহ কাবা গৃহের পুনর্নির্মাণ করেছিলেন এটাও অন্ততঃ মুসলমান মাত্রেরই জানা রয়েছে। এ সময়ে যে কাবা গৃহে কোন মূর্তি ছিলনা এবং

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জীবদ্দশায় যে সেখানে কোন মূর্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে নি—ঘটতে পারা যে সম্ভবই ছিল না সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

পরবর্তী সময়ে একত্ববাদী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার কারণেই যে তদানিন্তন সেবায়েতদিগের দ্বারা এই সব মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সে কথাও খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি না। অতএব কাবা গৃহে মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং পূজানুষ্ঠানের কাজ এখন থেকে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে শুরু হয়েছিল বলে আমরা ধরে নিতে পারি।

o মিশর থেকে পালিয়ে এসে দীর্ঘদিন যাযাবর অবস্থায় থাকা কালে বনিইসরাইল সম্প্রদায় কর্তৃক স্বর্ণ দ্বারা গোবৎসের মূর্তি নির্মাণ এবং সেই মূর্তির পূজা সম্পর্কীয় ঘটনাটি পবিত্র কোরআনে বিবৃত হয়েছে। বনি ইসরাইল দিগের এই যাযাবর অবস্থা যীশু খৃষ্টের জন্মের প্রায় তেরশত বছর পূর্বে ঘটেছিল বলে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব এই গোবৎস মূর্তির পূজা যে এখন থেকে প্রায় তিন হাজার তিনশত বছর পূর্বের ঘটনা সে কথা একরূপ নিঃসন্দেহেই ধরে নেয়া যেতে পারে।

o গ্রীক পুরাণে বহু সংখ্যক দেবদেবীর নাম এবং তাদের অদ্ভুত অলৌকিক কার্যকলাপের বহু চমকপ্রদ বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই পুস্তকের "অন্যান্য দেশের দেবদেবীদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়" শীর্ষক নিবন্ধে যে সব দেব-দেবীর নাম তুলে ধরা হয়েছে তার অধিকাংশই গ্রীক দেবদেবী। হিসেব করে দেখা গিয়েছে—গ্রীক পুরাণাদির রচনা এবং মূর্তিপূজার শুরু এখন থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বের ঘটনা।

o সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম আশ্চর্য রোডস্ দ্বীপের সুবিশাল পিতল মূর্তিটি আসলে অ্যাপোলো দেবের মূর্তি। গ্রীক এবং রোমানদিগের মতে অ্যাপোলো হলেন—সূর্যদেব। রোডস্ দ্বীপে এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় ৩,২৬০ বছর পূর্বে।

o গ্রীসের হারমিয়ন, ট্রোরেজেন, উলফিস, অর্টেমিস, সাই কিয়ন প্রভৃতি অঞ্চলে এই অ্যাপোলো দেবের পূজার জন্য বহু সংখ্যক "সূর্য মন্দির" (Tample of the sun) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব

গ্রীক এবং রোমানগণ যে সূর্যপূজক ছিলেন এবং এখন থেকে প্রায় ৩,৫০০ বছর পূর্বে ওসব স্থানে অ্যাপোলো বা সূর্য মূর্তির পূজা শুরু হয়েছিল সে কথা অনায়াসে ধরে নেয়া যেতে পারে।

o সুলেখক এবং তথ্যানুসন্ধানী জনাব আবদুস সাত্তার তাঁর লিখিত "আরণ্য সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থে বহু উপজাতীয় সম্প্রদায় এবং বেশ কয়েকটি প্রাচীন সভ্য জাতির মধ্যে মূর্তিপূজার উদ্ভব ঘটা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এবং তাঁর কথার সমর্থনে অকাট্য যুক্তি ও নির্ভর যোগ্য বহু তথ্য প্রমাণও তুলে ধরেছেন।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি "মেশা ভারদে ন্যাশনাল পার্ক" (Messa verde National Park)-এ বিখ্যাত "সূর্য পিরামিড" (Pyramid of the sun), "নাটসেস" (Natchez), "ইনকাস" (Incas), "চেয়েন্নী" (Chryanne) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করতঃ ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, মেলানেশিয়া, পলিয়নেসিয়া, মাইক্রোনেসিয়া, পারস্য, গ্রীস, প্রভৃতি দেশে প্রধান দেবতা হিসেবে সূর্যপূজা প্রচলিত থাকার কথা অকাট্য রূপে প্রমাণ করেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই পূজার সূচনা হলেও এই সূচনার কাজ যে এখন থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে এমন কি এদের কোন কোনটি যে এখন থেকে এক হাজার বছরের মধ্যে ঘটেছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

"আল বেরুনীর ভারত-তত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে "মূর্তিপূজার সূচনা ও বিগ্রহ সমূহের বিবরণ" শীর্ষক নিবন্ধে বেশ কয়েকটি দেশের মূর্তিপূজার সূচনা এবং যে ঘটনার উপরে ভিত্তি করতঃ এই সূচনা হওয়ার দাবী করা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতিপূর্বে অন্যত্র তুলে ধরা হয়েছে।

Torah গ্রন্থের অনুগামীরা (ইহুদী বা বনি ইসরাইল সম্প্রদায়—লেখক) যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রপিতামহ সারুঘের সময় থেকে মূর্তিপূজার সূচনা হওয়ার কথা বিশ্বাস করেন উক্ত গ্রন্থে বিশেষ দৃঢ়তার সাথে সে কথা লিখা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থের বিবরণ নির্ভুল হলে ধরে নিতে হয় যে এখন থেকে প্রায় ৪,১০০ বছর পূর্বে সেখানে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

o যে ঘটনাকে কেন্দ্র করতঃ রোমানদিগের মধ্যে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল বলে দাবী করা হয়ে থাকে সে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে "আল-বেরুণীর ভারত তত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখা হয়েছে ঃ

Ramulus ও Romanus নামক ফ্রাংক জাতীয় ভ্রাতৃদ্বয় রাজা হয়ে রোম-নগরীর পত্তন করে—পরে Romulus তার ভ্রাতাকে হত্যা করে। ফলে দীর্ঘ কাল যাবত অন্তর্বিপ্লব এবং যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকে। অবশেষে Romulus স্বপ্নে দেখে যে তার ভ্রাতাকে সিংহাসনে না বসানো পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে না। সে তখন তার ভ্রাতার একটি স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ করতঃ সিংহাসনে নিজের পার্শ্বে স্থাপন করে এবং প্রতিটি রাষ্ট্রীয় ঘোষণায় "আমরা (উভয়ে) এই আদেশ দিচ্ছি"-এই বাক্য ব্যবহার করতে থাকে। সেই হতে বহু বচন ব্যবহার করা রাজাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

এর পরে Romulus এক উৎসবের আয়োজন করে এবং অভিনয়াদি দ্বারা তার ভ্রাতার সমর্থক দিগের শত্রুতা প্রশমিত করতে চেষ্টা করে। তা ছাড়া চার রং-এর চারটি অশ্বারোহী মূর্তি নির্মাণ করতঃ সে সূর্যের একটি কীর্তি-সৌধও নির্মাণ করে। সবুজ বর্ণের মূর্তিটি মৃত্তিকার প্রতীক, নীল বর্ণের মূর্তিটি জলের, লালটি অগ্নির এবং শ্বেত মূর্তিটি বায়ুর প্রতীক। অতঃপর ঐই মূর্তি চতুষ্টয়ের পূজা করা হয়। এই সৌধটি এখনও রোমে বিদ্যমান রয়েছে।

ঐতিহাসিক দিগের মতে যীশুখৃষ্টের জন্মের ৭৩৫ বছর পূর্বে রোম নগরীর পত্তন হয়। এই হিসেবে এখন থেকে ২,৭১৭ বছর পূর্বে রোম নগরীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল বলে ধরে নিতে হয়।

o প্রাচীন পারস্য বাসীগণ যে প্রতি গৃহে অগ্নি শিখাকে অনির্বাণ রাখা এবং অগ্নি পূজায় অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিল ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই সে কথা জানা রয়েছে। পরে তারা যে "হুবারে" বা সূর্যকে "আহুরা মাজদা" বা জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মের চক্ষু কল্পনা করতঃ সূর্যপূজাও শুরু করেছিল সে কথাও তাদের অজানা নয়।

বৈদিক যুগে আর্যাবর্তে যজ্ঞ ও হোম বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠান রূপে চালু

থাকার কথা ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি। যজ্ঞ এবং হোমকে অগ্নি পূজা ছাড়া আর কিছু বলা যেতে পারে না।

পারস্যে প্রবেশকারী আর্য শাখাটির দ্বারাই যে যজ্ঞ ও হোমের অনুকরণে সেখানে অগ্নি পূজার সূচনা হয়েছিল সে কথা সহজেই অনুমেয়। আর্যাবর্তে এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যজ্ঞ ও হোম প্রচলিত থাকার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব পারস্যে অগ্নি পূজার সূচনা যে পাঁচ হাজার বছরের অধিক নয় সে কথা বলাই বাহুল্য।

মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আর একটি মাত্র ঘটনার বিবরণ দিয়ে এই নিবন্ধের ইতি টানছি। এটাই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম মূর্তিপূজা এবং এ থেকেই যে পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল বিবরণটি থেকে তার অকাট্য ও বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে দৃঢ় আশা পোষণ করি।

o সুপ্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম এবং এতদ্দেশে আহলে হাদিস আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবদুল্লাহ হিল কাফী আল কোরায়শী তর্জুমানুল হাদীস, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যায় সূরা ফাতিহার তফসির লিখতে গিয়ে মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

সূরা নূহ্ ২৩শ আয়াতটি থেকে তিনি অকাট্য রূপে প্রমাণ করেছেন যে হযরত নূহ (আঃ) এর সাথে বিশেষ ভাবে সম্পর্ক যুক্ত এবং বিশেষ ভাবে জন প্রিয় পাঁচ জন সাধু পুরুষের মূর্তিপূজা থেকেই এই পৃথিবীতে মূর্তি-পূজার সূচনা হয়েছিল।

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত অনুযায়ী সেই পাঁচ ব্যক্তির নাম যথাক্রমে ওয়াদ, ছুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নছুর। বিভিন্ন তফছির এবং হাদীস শরীফের বরাত দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে—এই পাঁচ ব্যক্তি হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্তর্বর্তী যুগের সাধু পুরুষ ছিলেন।

জীবদ্দশায় লোকেরা এদের অনুসরণ এবং এদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি পোষণ করতো। এদের মৃত্যুর পরে এই শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শনের জন্য এদের সমাধিতে গিয়ে ধর্ণা দেয় এবং ঘটা করে শোক প্রকাশ করার নিয়ম চালু করা হয়।

সকলের পক্ষে সমাধিতে গমন সম্ভব নয় বিধায় পরবর্তী সময়ে এদের ছবি অংকন করতঃ সভা সমিতি এবং প্রকাশ্য স্থান সমূহে টাঙ্গানো হতে থাকে।

পরবর্তী বংশধরেরা অজ্ঞতা এবং ভক্তির আতিশয্যে তাদের মূর্তি নির্মাণ

ও ঘরে ঘরে সেই মূর্তির প্রতিষ্ঠা দান করে। এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে পরবর্তী বংশধরগণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও বিভিন্ন কামনা বাসনা পূরণের অভিপ্রায়ে উক্ত মূর্তি সমূহের পূজা শুরু করে দেয়।

প্রখ্যাত তফছির ইবনে কছির (৯) ৭ ও ৮ পৃষ্ঠা এবং আরযুল কোর্‌আন (২) ২৩৫ পৃষ্ঠার বরাত দিয়ে তর্জুমানুল হাদীসের উক্ত সংখ্যায় বলা হয়েছে: অনাবৃষ্টির সময়ে মানুষেরা বৃষ্টি লাভের আশায় এই পাঁচ জনের প্রথম অর্থাৎ ওয়াদের মূর্তিকে ভোগ নৈবেদ্যাদি দিয়ে পূজা করতো এবং বৃষ্টি প্রার্থনা করতো।

বাকি মূর্তি চতুষ্টয়ের কোনটির পূজা কি উদ্দেশ্যে করা হতো তার বিবরণ দিতে গিয়ে উক্ত সংখ্যায় যে কথা গুলো বলা হয়েছে সে গুলোকে নিম্নে হুবহু উদ্বৃত করতঃ এই প্রসঙ্গের ইতি টানছি:

"মোট কথা, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মানুষেরা যাহাদের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের মতই মানুষ ছিল এবং তাহাদিগকে তাহারা আল্লাহ্‌ রূপে পূজা করিত না। আল্লাহ্‌র রবুবিয়তে অল্প বিস্তর তাহাদেরও ভাগ আছে এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই তাহারা তাহাদের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

পরবর্তী যুগে "ওয়াদ" প্রেমের দেবতা রূপে পূজিত হইত। তাহার প্রতিপক্ষ শত্রুতার দেবী ছিল "নকরাহ"। কেহ কেহ মনে করেন ওয়াদ 'উ' হইতে ব্যুৎপন্ন। বাবিলিয়দের ভাষায় উহা সূর্যের নাম।

'ইয়াউক'-এর অর্থ—বিপত্তারণ। 'ইয়াগুছ'-এর অভিধানিক অর্থ—শকুন। শকুনের আকারে আকাশে যে তারকা পুঞ্জ আছে আরাবী ভাষায় উহাকে 'নছর' বলা হয়। বাবেলিয়দের অন্যতম দেবতার নাম—'নছরক' ছিল"।

ওয়াদ-এর মূর্তিই যে পৃথিবীর প্রাচীনতম ও প্রথম পূজিত মূর্তি অর্থাৎ এ থেকেই যে পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল উপরোক্ত তফছির দ্বয়ের বিবরণ থেকে সে কথা সুস্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধ রূপে আমরা জানতে পারলাম। এবারে আসুন এখন থেকে কতদিন পূর্বে পৃথিবীর এই সর্ব প্রথম মূর্তি-পূজার সূচনা হয়েছিল সে কথা জানার চেষ্টা করি।

বিশেষজ্ঞ দিগের মতে—এখন থেকে প্রায় পনর হাজার বছর পূর্বে হযরত

নূহ্‌ (আঃ)-এর সময়ের মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল। এই প্লাবনের কারণেই যে ভূমধ্য উপত্যকা ভূমধ্যসাগরে পরিণত হয় এ বিশ্বাসও অত্যন্ত দৃঢ় রূপে তারা পোষণ করেন বলে জানা যায়।

উক্ত তফ্‌ছির দ্বয়ের বর্ণনানুযায়ী ওয়াদ এবং বাকি চারজন সাধু পুরুষ হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্তর্বর্তী সময়ে বিদ্যমান ছিলেন।

বাইবেলের বিবরণানুযায়ী হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত নূহ (আঃ) পর্যন্ত সময়ের ব্যবধান ৭,০৩০ বছর। বিশেষজ্ঞদিগের মতে হযরত নূহ (আঃ)-এর সময়ে সংঘটিত মহাপ্লাবন যে এখন থেকে প্রায় পনর হাজার বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল ইতিপূর্বে সে কথা বলা হয়েছে। ওয়াদ যদি হযরত আদম (আঃ) এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্তর্বর্তী সময়ের মানুষ হন তবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে এখন থেকে (১৫,০০০+৩,৫০০) সাড়ে আঠারো হাজার বছর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন।

অতএব মোটামুটি ভাবে ধরে নেয়া যেতে পারে যে এখন থেকে অন্ততঃ সাড়ে আঠারো হাজার বছর পূর্বে ওয়াদের মূর্তি নির্মাণ ও পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল।

শিয়ালকোটের প্রখ্যাত মওলানা মোঃ সাদেক উর্দু ভাষায় তাঁর লিখিত "আনোয়ারুত্‌ তাওহিদ" নামক গ্রন্থে এই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কীয় যে বিবরণ তুলে ধরেছেন উপরোক্ত বিবরণের সাথে তা হুবহু মিলে যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশাল বিশ্বের সকল দেশের এ সম্পর্কীয় তত্ত্ব ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তুলে ধরা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

পাঠকবর্গ আগ্রহী হলে এবং সুযোগ পেলে পরবর্তী সংস্করণে আরো কতিপয় দেশের বিবরণ তুলে ধরা হবে। তবে মূর্তিপূজার গোড়ার কথা বা পৃথিবীতে কখন এবং কিভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছিল সেটা নির্ণয় করাই ছিল বক্ষ্যমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। এই কতিপয় দেশের বিবরণ থেকেই আমাদের সেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বিধায় এখানেই নিবন্ধের ইতি টানা হলো।

মূর্তিপূজার সূচনায় পরিবেশের প্রভাব ঃ

মানুষকে "পরিবেশের সন্তান" বলা হয়ে থাকে। কথাটিকে একটু পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় যে, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বা প্রাকৃতিক অবস্থা, খাদ্যাখাদ্য, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতি অন্য কথায় স্থানীয় পরিবেশ ও উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রভাবকে অমান্য অগ্রাহ্য করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ফলে এসবের উপরে ভিত্তি করেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষদিগের শারীরিক গঠন, মন-মানস, স্বভাব-চরিত্র, অভ্যাস-আচরণ, আবেগ-অনুরাগ, রুচি-দৃষ্টিভঙ্গী, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি কম-বেশ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গড়ে উঠতে দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষদিগের প্রয়োজনের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ এক দেশের মানুষদিগের জন্য অপরিহার্য নয় এমন এক বা একাধিক দ্রব্য অন্য দেশের মানুষদিগের জন্য অপরিহার্য হতে পারে।

বলা বাহুল্য, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতেই ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী কল্পিত হয়েছে এবং তত্রত্য মানুষদিগের মন-মানস, স্বভাব-চরিত্র, আবেগ-অনুরাগ এবং রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি অনুযায়ী ওসব দেবদেবীদিগের চেহারা, কার্যকলাপ এবং স্বভাব চরিত্র কল্পিত হয়েছে।

কোন দেশের মানুষ তাদের প্রয়োজন এবং রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী কোন দেব বা কোন দেবীর মূর্তিকে প্রধান উপাস্যের মর্যাদা দিয়ে মূর্তিপূজার সূচনা করেছিল এবং কোন দেশ এ কাজে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেছিল এখানে সেটাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যেহেতু সভ্য-শিক্ষিত দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারতীয় হিন্দুসমাজেই অদ্যাপি মূর্তিপূজা বিদ্যমান রয়েছে—অতএব প্রথমে আমরা প্রাচীন ভারতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবো এবং পরে আরো কতিপয় দেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করবো।

হিন্দুসমাজে মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে লিঙ্গ এবং বিষ্ণুপুরাণের একটি উপাখ্যান হলো ঃ সৌনক রাজা অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতের কাছে প্রখ্যাত রাজা অম্বরীষের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছিলেন—বিরাট এক রাজ্যের রাজা হয়েও অম্বরীষ সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এতে সন্তুষ্ট হয়ে

ঈশ্বর একদা ইন্দ্রের রূপ ধারণ ও হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ অম্বরীষের কাছে আসেন এবং বর প্রার্থনা করতে বলেন।

অম্বরীষ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কারো কাছে বর প্রার্থনা করতে অস্বীকৃতি জানালে ইন্দ্ররূপী ঈশ্বর তাকে হত্যা করার ভয় দেখান। অম্বরীষ অটল থাকেন। তখন ঈশ্বর নীলপদ্মের বর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী গৈরিক বসন পরিহিত মানবরূপে এবং গরুড় নামক পাখির পৃষ্ঠে সমাসীন হয়ে অম্বরীষকে দর্শন দান করেন। এবং ঈশ্বরকে সর্বদা স্মরণ রাখার সাথে সাথে রাজ্যে শান্তি, ন্যায় ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্ম নিয়োগ করার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

রাজকার্যের ভীষণ ঝামেলার মধ্যে থেকেও সর্বদা ঈশ্বরকে স্মরণে রাখা যায় এবং সাধারণ মানুষেরাও যাতে অতি সহজে ঈশ্বরকে স্মরণে রাখতে পারে তার একটা উপায় করে দেয়ার জন্যে অম্বরীষ মানবরূপী ঈশ্বরকে অনুরোধ জানান।

উত্তরে ঈশ্বর বলেন—"আমার এই চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী মানবরূপের মূর্তি নির্মাণ করতঃ সেই মূর্তির ধ্যান ও পূজা করবে।

বলা বাহুল্য, এই বর্ণনানুযায়ী তখন থেকেই মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে বলে দাবী করা হয়ে থাকে। অতএব এই দাবী অনুযায়ী ধরে নিতে হয় যে ভারতীয় হিন্দুসমাজ কর্তৃক সর্বপ্রথম এই মানবাকৃতি এবং চতুর্ভুজ দেবমূর্তিটিই উপাস্য হিসেবে পূজিত হয়েছিল। কিন্তু তা ধরে নেয়ার উপায় নেই। কারণ কূর্মপুরাণ এ সম্পর্কে ভিন্ন বিবরণ পরিবেশন করেছে। উক্ত বিবরণটি হলো ঃ

এক ব্রাহ্মণের নারদ নামে এক সন্তান ছিল। ঈশ্বর দর্শনই ছিল তার একমাত্র কামনা। সৌভাগ্য বশতঃ একদিন পথ চলতে চলতে অদূরে এক অপূর্ব জ্যোতি তার দৃষ্টিগোচর হয়। সে জ্যোতির নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আকাশবাণী শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়। আকাশ বাণীটি এই ছিল যে, "তোমার অভিষ্ট পূরণ হবে না। সুতরাং আর অগ্রসর হয়ো না।" মানবাকৃতি এক জ্যোতির্ময় পুরুষকে সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। অকস্মাৎ তিনি বলেন—"আমার এই রূপ ছাড়া অন্য কোন রূপে তুমি আমার দর্শন

পাবে না।" সেই থেকে এই মানবাকৃতি জ্যোতির্ময় পুরুষের মূর্তি নির্মিত ও সম্পূজিত হয়ে আসছে।

উল্লেখ্য যে "আল বেরুনীর ভারততত্ত্ব" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থেও এই বিবরণ দুটিকে তুলে ধরা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো : একবার ইন্দ্রের ছদ্মবেশে, একবার চতুর্ভুজ মানবরূপে, আর একবার জ্যোতির্ময় পুরুষরূপে দর্শন দেয়া ছাড়াও পুরাণের বর্ণনানুযায়ী তিনি বিভিন্ন সময়ে নারী, বালক, মৎস, কচ্ছপ, শূকর প্রভৃতি রূপেও আবির্ভূত হয়েছেন বলে জানা যায়। —তার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ বা ছদ্মবেশ ধারণের কারণ কি?

সেই অসীম অনন্তকে যদি কোন কারণে রূপ পরিগ্রহ করতেই হয় তবে যে কোন একটি রূপেই তো যথেষ্ট হতো, আর মানব সমাজও অনর্থক বিভ্রান্তির শিকার না হয়ে অতি সহজেই তাঁকে চিনতে পারতো?

এখানে আর একটা অসুবিধা হলো : মানুষের স্বভাব। কেউ যদি অপরের ছদ্ম বেশ ধারণ বা যখন তখন রূপ পরিবর্তন করে তবে মানুষ তাকে "বহুরূপী" "সঙ" "ভাঁড়" প্রভৃতি বলে আখ্যায়ীত করে; উপেক্ষা এবং ঠাট্টা-বিদ্রুপও করতে দেখা যায়। অসীম অনন্ত এবং সর্বজ্ঞ বিশ্বপ্রভু অতি অবশ্যই মানুষের এই স্বভাবের কথা জানেন, সব কিছু জেনেও তিনি বহুরূপী, সঙ, বা ভাঁড়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন স্বাভাবিক বিবেক বুদ্ধি এটাকে কোন ক্রমেই সত্য ও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে চায় না।

এমতাবস্থায় লিঙ্গ, বিষ্ণু এবং কূর্ম পুরাণে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক রূপ পরিবর্তন বা ছদ্মবেশ ধারণের এসব বিবরণ কিভাবে সত্য ও শাশ্বত বলে স্থান পেলো সেটা বুঝতে পারা শুধু যে কঠিনই নয়—রীতিমত বিস্ময়করও সে কথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষীতে অধিকাংশ সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিই যে কালিকা পুরাণের এ সম্পর্কীয় বিবরণটিকে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন এখানে সে কথা বলে রাখা প্রয়োজন।

এই পুস্তকের "পুরাণের দেবতা" শীর্ষক নিবন্ধে কালিকা পুরাণের উক্ত বিবরণটিকে তুলে ধরা হয়েছে। বিবরণটি যত অদ্ভূত এবং অবিশ্বাস্যই হোক সেটা যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপাস্য হিসেবে শিবলিঙ্গ পূজার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে সুধী পাঠকবর্গ অবশ্যই তা লক্ষ্য করেছেন।

ভগবান ব্রহ্মার প্ররোচনায় মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অভিশাপে "গরুর সম্মুখ ভাগের পরিবর্তে পশ্চাৎভাগের পূজা" করার নির্দেশ এবং "অতঃপর কোন পূজায় কেতকী ফুলের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা" প্রভৃতি বিবরণ থেকে তৎকালে শিবলিঙ্গ পূজা এবং উক্ত পূজায় গো-দুগ্ধ ও কেতকী ফুল ব্যবহৃত হওয়ার ইঙ্গিতটিও পাঠকবর্গের নযরে পড়েছে বলে আশা রাখি।

তবে কেউ কেউ উক্ত বিবরণটিতে গো-পূজার ইঙ্গিতও যে রয়েছে সে কথা বলতে পারেন। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে বিবরণটি পাঠ করলে তাঁরা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে গো-পূজার ইঙ্গিত থাকলেও শিবলিঙ্গের পূজাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং শিবলিঙ্গকেই প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতীয় হিন্দুসমাজ কর্তৃক লিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ মূর্তিই যে সর্বপ্রধান উপাস্য হিসেবে সর্বপ্রথমে পূজিত হয়েছে পাঠকবর্গের ভেবে দেখার জন্য তার কতিপয় বাস্তব প্রমাণ নিম্নে তুলে ধরা যাচ্ছে।

o রামায়ণের বিবরণে প্রকাশ : রাবন বধের পরে রামচন্দ্র সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা হলো শিবলিঙ্গের পূজা। এজন্যে তিনি স্বহস্তে বালুকা দ্বারা একটি লিঙ্গমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন বলেও উক্ত বিবরণে উল্লেখ থাকতে দেখা যায়।

o ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দিরে যে মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং যার কিছু অংশ আজও গজনীর এক মাঠে পড়ে রয়েছে তাও বিশাল আকারের এক লিঙ্গমূর্তি।

o সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দুদিগের যত মন্দির রয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই শিবলিঙ্গের মূর্তি বিদ্যমান রয়েছে। তা ছাড়া গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী মাটি, পাথর ও বিভিন্ন ধাতব পদার্থ নির্মিত ছোট, বড়, মাঝারী আকারের যে সব লিঙ্গমূর্তি রয়েছে তার সংখ্যা সকল দেব-দেবী মূর্তির মিলিত সংখ্যার চেয়েও বেশী।

o অগ্নি পুরাণ তৃতীয় অধ্যায় ১৮শ থেকে ২২তম শ্লোকসমূহে লিঙ্গ-মূর্তির উদ্ভব সম্পর্কে যে বিবরণ রয়েছে তার হুবহু বঙ্গানুবাদ উক্ত পুরাণ থেকে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"অনন্তর ভগবান হর হরিকে বলিলেন, আমাকে তোমার মোহিনী মহিলা-রূপ দেখাও। তচ্ছ্রবনে হরি অমনি মোহিনী রূপ ধারণ করিলেন। মায়া মুগ্ধ মহাদেব তখন গৌরীকে ছাড়িয়া সেই মোহিনীর সহবাসে অভিলাষী হইলেন এবং নগ্ন ও উন্মত্ত হইয়া তাহার কেশ পাশ ধারণ করিলেন।

রমনী তখন কেশ পাশ ছাড়াইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে রুদ্র ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া চলিলেন। তখন স্থানে স্থানে মহাদেবের বীর্য পতিত হইয়াছিল তাহাতে সেই সেই স্থানে এক একটি কনকময় শিবলিঙ্গ সমুদ্ভূত হয়।"

লিঙ্গের উদ্ভব সম্পর্কে এমনি ধরণের বহু উপাখ্যানই ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বিদ্যমান রয়েছে। বাহুল্য বোধে সেগুলোকে আর এখানে তুলে ধরা হলো না।

০ যাজক শ্রেণী বিশেষ করে শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণদিগকে যাজনিক কাজ—অর্থাৎ দেবদেবী দিগের মূর্তিপূজা প্রভৃতি করার অধিকার লাভের জন্য উপনয়নের পরে নতুন করে আবার দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

এই দীক্ষা গ্রহণের পরে প্রত্যহ শিবলিঙ্গের পূজা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। বলা আবশ্যক যে অন্য কোন দেব বা দেবী মূর্তির পূজা ব্যক্তিগত ভাবে কারো জন্যে বাধ্যতামূলক নয়।

মাটি দিয়ে নির্মিত টাটকা লিঙ্গমূর্তির পূজাই বিশেষ ভাবে ফলপ্রদ বিধায় প্রত্যহ মাটি দিয়ে এই লিঙ্গ নির্মাণ করা হয় এবং পূজার পরে ফেলে দেয়া হয়। হিসেব করলে দেখা যাবে যে হিন্দুসমাজের বিভিন্ন মন্দির, মঠ, ও স্থানসমূহে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্তি সমূহ ছাড়াও প্রত্যহ এমনি ভাবে হাজার হাজার লিঙ্গমূর্তি নির্মিত ও সম্পূজিত হয়ে চলেছে।

শিবলিঙ্গ যে প্রধান উপাস্য এবং প্রধান উপাস্য হিসেবে এর পূজা যে প্রথমে শুরু হয়েছিল এবং তা-ই যে স্বাভাবিক উপরের এই কতিপয় তথ্য-প্রমাণ থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে বলে বাহুল্য বোধে আর অধিক তথ্য প্রমাণ তুলে ধরা হলো না। তবে এখানে একটি কথা বলা না হলে আলোচনার অঙ্গ হানি হবে বিধায় একান্ত বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে যে প্রতিটি লিঙ্গমূর্তির সাথে যোনি পীঠও সংযুক্ত থাকে। শাস্ত্র পাঠ করেছেন অথবা মন্দিরাদিতে প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গমূর্তি দেখেছেন এমন ব্যক্তি মাত্রেরই এটা জানা রয়েছে।

যারা এ সম্পর্কে অবহিত নন তাদের অবগতির জন্য বলা যাচ্ছে যে প্রতিটি লিঙ্গমূর্তির অগ্রভাগ অর্থাৎ লিঙ্গের নিম্নাংশ যার মাঝে প্রোথিত থাকে ওটাই "যোনিপীঠ" (স্ত্রী-অঙ্গ)। এই যোনিপীঠ সংযোগের কারণ সম্পর্কে পরে আলোকপাত করা হবে।

শিবলিঙ্গকেই যে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে পূজা করা হয়েছিল সে সম্পর্কে এখনও যদি কারো মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে থাকে তাদের অবগতির জন্য লিঙ্গপূজার সময়ে যে ধ্যান মন্ত্রটি (ধ্যানের মাধ্যমে লিঙ্গের যে পরিচয় অন্তরে ফুটিয়ে তুলতে হয়) পাঠ করা হয় বঙ্গানুবাদ সহ তা হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

ঐং প্রমত্তং শক্তি সংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহা প্রভং
কাম বাণান্বিত দেবং সংসার দহনক্ষমং
শৃঙ্গারাদি রসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্ ।।

অর্থাৎ—এই লিঙ্গ মাতাল সদৃশ, মহাশক্তিশালী, মহাপ্রভা যুক্ত ও বাণ নামে আখ্যাত। গোটা সংসার দহনে সক্ষম এটা এমনই কামবাণে পরিপূর্ণ। শৃঙ্গা-রাদি রসে উল্লাসিত এই বাণ আখ্যা প্রাপ্ত (লিঙ্গ)-ই পরমেশ্বর।

উল্লেখ্য যে শিবলিঙ্গকে "বাণলিঙ্গ" বা "বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ"ও বলা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, লিঙ্গের প্রতি এহেন গুরুত্ব আরোপ করা থেকেও লিঙ্গকেই যে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

পরিশেষে শিবলিঙ্গের সাথে যোণিপীঠ সংযুক্ত করার কারণ কি আর কি কারণেই বা লিঙ্গ মূর্তিকে প্রধান ও প্রথম উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে দু' কথা বলে লিঙ্গ সম্পর্কীয় আলোচনার ইতি টানছি।

নিবন্ধের শুরুতেই পরিবেশের প্রভাবের কথা এবং পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের মন-মানস রুচি প্রকৃতি প্রভৃতি গড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে। এই পরিবেশের প্রভাবই যে ভারতীয় হিন্দুসমাজে লিঙ্গ পূজা প্রবর্তনের কারণ পরবর্তী আলোচনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

বলাবাহুল্য, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত কথা-কাহিনী, প্রভৃতির মাধ্যমেই কোন্ দেশে, কোন্ সময়ে কিরূপ পরিবেশ বিরাজমান ছিল এবং

সেই পরিবেশের প্রভাবে তত্রত্য অধিবাসী দিগের গড়ে ওঠা মন-মানস, আচারানুষ্ঠান, রুচি-প্রকৃতি প্রভৃতিই বা কিরূপ ছিল তা জানা সম্ভব।

অতএব তদানিন্তন আর্যাবর্তে কি পরিবেশ বিরাজমান ছিল এবং সেই পরিবেশে তত্রত্য অধিবাসী বিশেষ ভাবে হিন্দুসমাজের মন-মানস প্রভৃতি কি ভাবে গড়ে উঠেছিল তার পরিচয় পেতে হলে আমাদিগকে তদানিন্তন কালের ইতিহাস, ধর্মগ্রন্থ প্রভৃতির সাথে পরিচিত হতে হবে।

এ কাজে বেশ কিছুটা অসুবিধাও রয়েছে। তা হলো—তদানিন্তন কালের সাহিত্য, ও বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আজ আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তবে ধর্মগ্রন্থ সমূহ একাজে বিশেষ ভাবে আমাদের সহায়ক হতে পারে। কেননা ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমেও মোটামুটি ভাবে তদানিন্তন কালের সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

সুধী পাঠকবর্গের যিনিই পুরাণ ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেছেন তিনিই দেবদেবী ও মুণি-মহাপুরুষদিগের অদ্ভুত অলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত, স্বভাব চরিত্র এবং কার্যকলাপাদির পরিচয় জানতে পেরেছেন বলে আশা করি।

তাঁদের কারণে-অকারণে ক্রোধান্ধ হয়ে অপরকে অভিশাপ প্রদান, কথায় কথায় আত্মগরীমা প্রকাশ, সর্বদা হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ ও কলহে লিপ্ত হওয়া, বিশেষ করে অতি জঘন্য ধরণের যৌন উচ্ছৃংখলতা প্রভৃতির বিবরণে ওসব ধর্মগ্রন্থ যে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে সে গুলোর পাঠক মাত্রই তা লক্ষ্য করেছেন। এমনকি স্বয়ং ভগবানকেও যে এ থেকে রেহাই দেয়া হয় নি নিশ্চিত রূপেই অত্যন্ত বেদনার সাথে এটাও তাদের লক্ষ্যিভূত হয়েছে।

এ ধরনের বিবরণ নেই এমন একখানা ধর্মগ্রন্থও যে খুঁজে পাওয়া যাবে না ওসব গ্রন্থের খবরা-খবর রাখেন তাঁরা অবশ্যই সে কথা স্বীকার না করে। পারবেন না।

এটা যে নিশ্চিত রূপেই পরিবেশের প্রভাব সে কথা খুলে বলার প্রয়োজন হয় না। বলাবাহুল্য, এই পরিবেশে গড়ে ওঠা মন-মানস নিয়েই তারা তাদের প্রধান ও প্রথম উপাস্য নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিলেন।

এ কাজ করতে গিয়ে এই বিশ্বনিখিলের স্রষ্টাই যে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হওয়ার উপযুক্ত সে কথা অতি-অবশ্যই তারা ধরে নিয়ে ছিলেন।

তিনি কি ভাবে এই সৃষ্টিকার্য সমাধা করেছিলেন এটাই ছিল তাদের

পরবর্তী বিবেচ্য বিষয়। এ কাজে তারা যে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করেছিলেন লিঙ্গপুজা তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ বহন করছে। কথাটিকে খুলে বললে বলতে হয়—

জননেন্দ্রিরই যে জীব সৃষ্টির মূল অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের সক্রীয়তা ছাড়া কোন জীব যে সৃষ্টি হতে পারে না এ বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের বাস্তব, প্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘ দিনের। অতএব এই বিশ্ব-সৃষ্টির মূলেও জননেন্দ্রিয় সক্রীয় থাকার ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে পড়েছিল। আর এই বিশাল বিশ্বের সৃষ্টি যে সর্বপ্রধান বা সকল দেবতার দেবতা মহাদেব বা শিবলিঙ্গের সক্রীয়তা ব্যতীত সম্ভব হতে পারে নি এ বিশ্বাসও তারা করে নিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, লিঙ্গমূর্তিকে প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার এটা-ই ছিল কারণ। এখানে উক্ত লিঙ্গের সাথে যোনি-পীঠ সংযোজনের প্রশ্নে আসা যাক—

বিভিন্ন পুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায়ঃ মহাদেব একদা স্বীয় পত্নী পার্বতীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হন। হঠাৎ তাঁর কামোদ্দীপনা এতই বৃদ্ধি পায় যে পার্বতীর প্রাণ নাশের আশংকা দেখা দেয়। তিনি মনে মনে শ্রী-কৃষ্ণকে স্মরণ করা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে, তিনি সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিবলিঙ্গটির গোড়ায় আঘাত করেন,* ফলে ওটা দ্বি-খন্ডিত হয়। লিঙ্গটি যোনি-পীঠের মধ্যে যে ভাবে অবস্থিত ছিল ঠিক সেভাবেই যোনি সহ লিঙ্গটির মূর্তি নির্মিত ও পুজিত হয়ে আসছে এবং এটাই শাস্ত্রীয় বিধি।

ভগবান মহাদেবের কামোত্তেজনা পার্বতীর প্রাণ নাশের পর্যায়ে উপনীত হওয়া, সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি, তদানিন্তন অবস্থায় লিঙ্গের গোড়ায় সুদর্শনচক্রের অনুপ্রবেশ ও লিঙ্গকর্তন প্রভৃতি সম্ভব কিনা এসব প্রশ্ন মনে জাগা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পুরাণ-প্রণেতা এবং ভক্ত অনু-রক্তদিগের মতে এসব কিছুই ভগবানের লীলা; আর লীলার ক্ষেত্রে সবই সম্ভব। সুতরাং এ নিয়ে কোনদিনই তাঁদের মনে কোন প্রশ্ন জাগে নি। ভবিষ্যতে জাগবে কিনা একমাত্র ভবিতব্যই সেকথা বলতে পারে।

তবে স্থীর-প্রাজ্ঞ, নিরপেক্ষ এবং চিন্তাশীল মানুষদিগের মনে স্বাভা-বিক রূপেই এ নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে, এবং তাঁরা এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাও করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের অভিমত হলোঃ

এই উভয় অঙ্গের সংযোজনও তদানিন্তন পরিবেশ এবং সেই পরিবেশে গড়ে ওঠা মানুষদিগের বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফল। কেননা 'জীব-সৃষ্টির জন্য পুংলিঙ্গের সক্রীয়তাই যথেষ্ট নয়—স্ত্রীলিঙ্গের সক্রীয়তারও প্রয়োজন রয়েছে।" অতএব এই বাস্তব অভিজ্ঞতাই তাদিগকে উভয় অঙ্গের সংযোজন এবং সংযোজিত অঙ্গের মূর্তি নির্মাণে ও পূজানুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে উক্ত মহল দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না, কেননা তদানিন্তন পরিবেশে পবিত্র ধর্মের নামে তারা যে কাজ করতে পেরেছেন বর্তমান পরিবেশে সে কথা লিখতেও আমাদের বিবেক সঙ্কুচিত হয়—লজ্জায় মাথা অবনত হয়ে পড়ে। সে যা হোক, শিবলিঙ্গের মূর্তিকে কেন তারা প্রধান ও প্রথম উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেকথা বুঝানোর জন্যই এখানে এমন বিস্তারিত আলোচনা করতে হলো। অতঃপর অন্যান্য কয়েকটি দেশের এ সম্পর্কীয় বিবরণকে অতি সংক্ষেপে পৃথক পৃথক ভাবে তুলে ধরা যাচ্ছে।

ইতালী: ইতালীর অধিবাসী বিশেষ করে রোমানগন জুপিটারকে স্বর্গের রাজা, মানুষও দেবতাদিগের পিতা এবং প্রধান দেবতা কল্পনা করতঃ তার মূর্তিপূজা করতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। জুপিটারকে তারা স্যাটার্ণ (কৃষি ও সভ্যতার কর্তা)-এর পুত্র নেপচুন (সমুদ্র ও অন্যান্য জলাশয়ের কর্তা)-কে ভ্রাতা এবং জুনো (স্বর্গের রাণী, নারী জাতি ও বিবাহের কর্ত্রী)-কে তার স্ত্রী এবং ভগ্নি বলেও কল্পনা করতো। মোট কথা জুপিটারের মূর্তির পূজা থেকে সেখানে মূর্তিপূজার সূচনা হয়।

পারস্য: পারস্য বাসীরা আহুরা মজদা বা জ্ঞানময় পরম ব্রহ্ম নামে একজন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও তেজময় অগ্নিকে তার প্রতীক কল্পনা করতঃ অগ্নির উপাসনা শুরু করে এবং এমন ভাবেই পারস্যে প্রতীক পূজার সূচনা ঘটে।

পরবর্তী সময়ে হবারে (Hvre) বা সূর্যদেবকে আহুরা মজদার চক্ষু কল্পনা করতঃ সূর্যপূজার সূচনা করা হয়। ফলে অগ্নি এবং সূর্য প্রধান উপাস্য হয়ে দাঁড়ায়।

এরও পরবর্তী সময়ে পারস্যবাসীদিগের মনে এই ধারণার

সৃষ্টি হয় যে, মঙ্গল এবং অমংগলের স্রষ্টা একজন হতে পারে না। বলা বাহুল্য, এমনি ভাবে দু'জন উপাস্যের সৃষ্টি হয়। মংগলের স্রষ্টার নাম দেয়া হয় "ইজদ" আর অমংগলের স্রষ্টার নাম —আহরমন।

দেশের রাজার অধীনে এই দুই খোদার মূর্তি স্থাপিত হয় এবং কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ ঘটলে রাজার বিচারানুযায়ী উভয়ের শাস্তি বা পূজা-পুরস্কার প্রদানের নিয়ম চালু করা হয়। এমনও প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে যে কারো পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে রাজার বিচার অনুযায়ী ইজদ মূর্তির উদ্দেশ্যে মহা ধুম ধামের সাথে লোভনীয় নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হতো। আবার কারো পুত্রের মৃত্যুতে রাজার বিচারানুযায়ী আহরমনের মূর্তির পৃষ্ঠে দশ, বিশ, পঁচিশ বা তার কমবেশী বেত্রাঘাত করা হতো।

এই নৈতিক তথ্য ধর্মীয় অধঃপতনের পরিণামে-'জন জমিন জরু" বা নারী এবং ভূমিতে সবল পুরুষদিগেরই অধিকারের দাবী প্রবল হয়ে ওঠে, এর নারকীয় পরিণতির বিবরণে পারস্যের ইতিহাস চিরকলঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

এ বিবরণ থেকে বুঝতে পারা সহজ যে, প্রথমে অগ্নি এবং সূর্যপূজার মাধ্যমে পারস্যে প্রতীকপূজার সূচনা হয় এবং পরে প্রতীক পূজাই মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্রষ্টা রূপে ইজদ ও আহরমনের মূর্তিকে পূজার আসনে প্রতিষ্ঠা দান করে।

চীন: আকাশে চন্দ্র, সূর্য, তারকাদির উদয়, আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত, আকাশে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের ঝলক প্রভৃতি দেখে চীনবাসীরা প্রাচীন কাল থেকেই দয়ালু এবং রুদ্ররূপী একজন আকাশী খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই আকাশী খোদার ধারণা এমন ভাবেই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে হলে আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। ফলে চীনাদের চিন্তাধারায় আকাশ এক মৌলিক উপকরণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই আকাশ-চিন্তা তাদের মন-মগজে এমন করেই বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে তাদের সংঘ, প্রতিষ্ঠান এমন কি চীন রাষ্ট্রটিও "আকাশী রাষ্ট্র" বলে আখ্যায়ীত হতে থাকে।

রোমকগণ যখন সর্বপ্রথম এই দেশটির সাথে পরিচিত হয় তখন তারা একটি আকাশী রাষ্ট্রের সাথে পরিচিত হয়েছে বলে মনে করতে থাকে। সেই সময় থেকে "Exlum" শব্দটির বিভিন্ন রূপেই চীনের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। যার অর্থ দাঁড়ায়—"আকাশ-বাসী" বা "আকাশী"। এখনও ইংরাজীতে চীনের জন্য celestial শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যার অর্থ "আকাশী রাষ্ট্রের বাসিন্দা।"

কালক্রমে চীন বাসীরা মৃত স্বজন পরিজনদিগের আত্মার শক্তিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। মৃত স্বজনদিগের আত্মা পরবর্তী জগতে আকাশী খোদার নৈকট্য লাভের ফলে শক্তিশালী হয়ে ওঠে বলে তারা বিশ্বাস করতে থাকে এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, অভীষ্ট সিদ্ধি, আকাশী খোদার নৈকট্য লাভ প্রভৃতির জন্য ঐসব শক্তিশালী আত্মার পূজা অপরিহার্য বলে মনে করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এমনি ভাবেই সেখানে মৃত "স্বজন পরিজন" দিগের পূজা শুরু হয়ে যায়।

গ্রীস : গ্রীকগণ তাদের ভাষায় জুপিটারের নাম দিয়েছিল—জিউস (Zeus)। এই জিউস বা জুপিটারের মূর্তিপূজা থেকেই সেখানে মূর্তিপূজার সূচনা হয়। পরে অ্যাপোলো (সূর্যদেব), ডায়েনা (জুপিটারের কন্যা এবং মৃগয়া ও সতীত্বের দেবী), মিনার্ভা (জুপিটারের অন্যতমা কন্যা এবং জ্ঞান, যুদ্ধ ও চারুশিল্পের দেবী) প্রভৃতির মূর্তিও সেখানে পূজিত হতে থাকে। তদানিন্তনকালে বিশেষ সভ্যজাতি বলে প্রসিদ্ধি লাভের কারণে গ্রীক সভ্যতা এবং তাদের মূর্তিপূজার প্রভাব পাশে পাশের দেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের ভারতে আগমনের পরে এখানে গ্রীক সভ্যতার এবং মূর্তিপূজার প্রভাব পড়েছিল বলেও অনেকে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন।

মিসর : খৃষ্টপূর্ব ৩৭০০ অব্দে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৫৬৮২ বছর পূর্বে মিসরের প্রথম পিড়ামিডটি নির্মিত হয়েছিল বলে জানতে পারা যায়। এ পর্যন্ত মোট ৭০টি পিড়ামিড আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরো ১৬টির অস্তিত্ব ছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে।

গীজ (Gizah)-এর পিরামিডটিই সর্ববৃহৎ। প্রায় ৪০ বিঘা জমির উপরে এক লক্ষ শ্রমিক কুড়ি বছরে এর নির্মাণ কার্য সমাধা করে। রাজা কিয়াপস্ (cheops)-এর মমীকৃত শবদেহ এখানে সমাহিত রয়েছে।

পিড়ামিড গুলি যে তদানিন্তন কালের মিসরীয় রাজাদিগের সমাধি এবং এগুলোর মধ্যে যে তাদের মমীকৃত শবদেহ গুলিকে বহু ধনরত্ন, আসবাব পত্র, খাদ্যদ্রব্য, দাস-দাসী প্রভৃতি সহকারে সমাহিত করা হয়েছে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিরই সে কথা অজানা নয়।

মিশরের রাজা বা ফেরাউনগণ যে নিজদিগকে প্রজা সাধারণের প্রভু, প্রতিপালক, হুকুম দাতা, দন্ড মুন্ডের কর্তা প্রভৃতি বলে দাবী করতো আর দেশবাসী দিগকে যে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক তাদের এই দাবীকে মেনে চলতে হতো সে কথাও প্রায় সকলেরই জানা রয়েছে।

হযরত মূসা (আঃ) যে একাজের বিরোধীতা করার কারণে তদানিন্তন ফেরাউনের রোষ-ভাজন হয়ে অগত্যা বনী ইসরাইল দিগকে নিয়ে মিসর থেকে পালিয়ে এসে ছিলেন সে কথাও প্রায় সর্বজন বিদিত।

জীবদ্দশায় প্রভু, প্রতিপালক, হুকুমদাতা, দন্ড-মুন্ডের কর্তা প্রভৃতি বলে স্বীকৃতি জানানো এবং মৃত্যুর পরে তাদের শবদেহকে ঘটা করে মমীতে পরিণত করণ এবং এহেন ব্যয়-বহুল ও রাজকীয় ভাবে সমাহিত করণকে যে রাজা বা সম্রাট পূজা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না সে কথা বলাই বাহুল্য। অতএব এখন থেকে ৫৬৮২ বছর পূর্বে যে মিসরে এই সম্রাট পূজার সূচনা হয়েছিল সে কথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

বাবিলোনিয় অঞ্চল (ভূমধ্য উপত্যকা—Mediterranean valley)

এই পুস্তকের "মূর্তিপূজার প্রাচীনত্ব" শীর্ষক নিবন্ধে এখন থেকে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার বছর পূর্বে হযরত আদম (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর অন্তর্বর্তী সময়ের ওয়াদ, ছুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নছর নামক পাঁচজন বিশেষভাবে জনপ্রিয় সাধু-পুরুষের মূর্তিপূজা থেকেই এই পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা হওয়ার তথ্য-প্রমাণাদি তুলে ধরা হয়েছে।

অতএব বাবিলোনিয় অঞ্চলের পরিবেশ অনুযায়ী সেখানে যে সাধু-পুরুষদিগের পূজা, অন্য কথায় নর-পূজার সূচনা হয়েছিল সেকথা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে।

তবে মনে রাখা ভাল যে, এটা সাধুপুরুষ পূজার সূচনা মাত্র। কালক্রমে অন্যান্য দেশে কোন না কোন পদ্ধতিতে সাধুপূজা শুরু হয়ে যায়। খোদার পুত্র কল্পনা করতঃ হযরত ওজায়ের (আঃ) এর পূজা, ঈশ্বরের ঔরসজাত একমাত্র পুত্র, অন্যতম ঈশ্বর, ত্রাণকর্তা প্রভৃতি আখ্যাদান করতঃ হযরত ইছা (আঃ) বা যীশু খৃষ্টের পূজা, জগাই-মাধাই (জগদানন্দ গোস্বামী এবং মাধবানন্দ গোস্বামী), শ্রী চৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জৈন প্রভৃতির পূজা তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ বহণ করছে।

তৌহিদের প্রতি প্রকৃত আস্থাশীল ব্যক্তিবর্গ নিজেদের আশেপাশে একটু নযর দিলেও এমনি ধরনের সাধু-পূজা, স্বজন-পূজা, নরপূজা, নারীপূজা, কবর পূজা প্রভৃতির অসংখ্য বাস্তব নিদর্শন স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

একথা ভেবে নিদারুণ দুঃখ, বেদনা ও হতাশায় অভিভূত হতে হয় যে, যেসব মহাপুরুষ ও জননেতা বিলাস-ব্যসনকে অতীব ঘৃণা ভরে পরিত্যাগ করতঃ কঠোর কৃচ্ছ সাধনার পথ বেছে নিয়েছিলেন, সারা জীবন রোজা ও স্বল্পাহারে দিন কাটিয়ে দুঃস্থ, দুর্গত ও অভুক্ত অর্ধভুক্ত কাঙালদিগের সেবায় অকাতরে সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন, লঙ্গরখানা খুলে প্রত্যহ হাজার হাজার অভুক্ত অর্ধভুক্তের দুমুঠো অন্নের সংস্থান করেছিলেন এক শ্রেণীর তথা কথিত ধার্মিক ব্যক্তি আজ কোটি কোটি অভুক্ত অর্ধভুক্ত মানুষকে বঞ্চিত রেখে সেইসব মহাপুরুষ ও জননেতাদিগের কবরকে লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের নিত্য নতুন গিলাফ বা চাদরে আবৃত করতঃ ধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন। আর এক দিকে নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা উপরোক্ত মহাপুরুষ ও জননেতাদিগের আদর্শকে পদদলিত করে চলেছেন আবার অন্যদিকে প্রত্যহ হাজার হাজার টাকার মোমবাতি, আগরবাতি, চন্দন, আতর প্রভৃতি দিয়ে উপরোক্ত কবর সমূহের রওনক ও মর্যাদা বৃদ্ধির অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমার আশংকা হয় যে সেই মহাবিচারের দিনে উপরোক্ত মহাপুরুষ এবং জননেতাগণ এই অন্যায়, অপচয়, কবর পূজা এবং আদর্শ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কঠোর ভাষায় শুধু প্রতিবাদই করবেন না—চরম শাস্তি বিধানের জন্যও আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদী হবেন।

পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যায় বলে পরিবেশের প্রভাব কিভাবে মূর্তিপূজাকে প্রভাবান্বিত করেছে তার আর কোন উদাহরণ তুলে ধরা সম্ভব হলো না।

পরিবেশের প্রভাবেই যে এই ভিন্ন ভিন্ন কয়েকটি দেশের মানুষ শিবলিঙ্গ, কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি, অগ্নি-সূর্যাদি প্রাকৃতিক পদার্থ, মৃত স্বজন, পরিজনদিগের আত্মা, দেশের রাজা, সাধুপুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এবং সত্তা ও শক্তিকে প্রধান উপাস্য হিসেবে গ্রহণ ও তাদের পূজা উপাসনার সূচনা করেছিল তা অনায়াসে বুঝতে পারা যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অবস্থা যে এ থেকে ভিন্ন নয় উল্লেখিত কয়েকটি দেশের নমুনা থেকেই তা বুঝতে পারা যাবে বলে আশা করি।

উপসংহার

পৃথিবীতে মূর্তিপূজার সূচনা কিভাবে হয়েছিল "আল বেরুণীর ভারত তত্ত্ব" নামক গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের শুরুতে সেকথা সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তার কিছু অংশ এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :

"একথা সুবিদিত যে সাধারণ লোকের মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার দিকেই আকৃষ্ট হয়, এবং ভাব জগতের প্রতি তাদের সহজাত বিরাগ থাকে। যে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভাবাত্মক বস্তু হৃদয়ঙ্গম করতে পারে সাধারণ লোকের মন চাক্ষুস দৃষ্টান্তেই তৃপ্ত হয়, যেহেতু ইহুদী, খৃষ্টান ও বিশেষ করে Manichacan প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতারা তাদের গ্রন্থে ও উপাসনা গৃহে চিত্র ও প্রতিমূর্তি রচনা করে পথভ্রষ্ট হয়েছেন।

"একটি উদাহরণ থেকেই আমার এ কথার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে। আমাদের নবীর বা মক্কা-মদীনার একটি চিত্র যদি কোন অশিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রী লোককে দেখান হয়, তুমি দেখবে যে সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চিত্রটিকে চুম্বন করছে, কপোল স্পর্শ করাচ্ছে, তাকে সম্মুখে রেখে ধুলোর গড়াগড়ি দিচ্ছে, যেন সে আসল ব্যক্তি বা পবিত্র গৃহকেই দেখছে এবং সেই ধারণার সে যেন সাধারণও বিশেষ হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানই পালন করছে।"

"প্রতিমা নির্মাণ এই কারণেই হয়ে থাকে। এগুলি আসলে নবী, জ্ঞানী, দেবতা প্রমুখ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে তৈরী হয়, যার দ্বারা তাদের অনুপস্থিতিতে বা মৃত্যুর পরে তাদের গুণের কথা লোকের মনে জাগরূক থাকে, সাধারণের অন্তরে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব অম্লান থাকে।"

"স্মারকমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবার বহুকাল, বহু শতাব্দী কেটে গেলে তার আসল উদ্দেশ্য লোকে ভুলে যায় এবং তাকে অর্চনা করে সম্মান করা প্রথা ও অভ্যাসে পরিণত হয়ে পড়ে। পরে সাধারণের এই মনোবৃত্তির সুযোগ নিয়ে শাস্ত্রকারেরা এ অভ্যাসকে বিধানের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। এখন এই মূর্তি ও চিত্রগুলিতে পূজা করা লোকের ধর্মীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।"

কিভাবে মূর্তিপূজার সূচনা হয়েছে এবং দিনে দিনে তা কিভাবে ধর্মীয় কর্তব্য রূপে চিরস্থায়ী হয়ে চেপে বসেছে গ্রন্থের লেখক এখানে তার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই পুস্তকেও মূর্তির উদ্ভব ও মূর্তিপূজার সূচনা সম্পর্কে বহু তথ্য-প্রমাণ আমি তুলে ধরেছি। এখানে বলা আবশ্যক যে, আমি নিজে মূর্তি-পূজক ছিলাম এবং বেশ কিছুদিন আমাকে স্বহস্তে মূর্তিপূজা করতে হয়েছে। অতএব এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ।

আমার বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত দৃঢ় কন্ঠে এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আমি বলতে পারি যে মূর্তিপূজকদিগের মধ্যে জ্ঞান-বিবেক সম্পন্ন এমন বহু ব্যক্তিই রয়েছেন যাঁরা অন্তর দিয়ে মূর্তিপূজাকে সমর্থন করেন না, এমন কি এ কাজকে বর্বর যুগীয় চিন্তাধারা-প্রসূত বলেও তাঁদের অনেককে মন্তব্য করতেও দেখা যায়, শুধু বংশানুক্রমিক প্রথা হিসেবে এবং সমাজের ভয়ে অগত্যা তাঁরা মূর্তিপূজার নামে প্রহসন চালিয়ে যাচ্ছেন।

মূর্তিপূজা যে মূল লক্ষ্য নয়, মনকে একত্ববাদী ধ্যান-ধারণার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণমূলক একটি সাময়িক ব্যবস্থামাত্র এবং মনস্থির হওয়ার সাথে সাথে মূর্তির অপসারণ না করা যে একত্ববাদকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করা সুতরাং অতি জঘন্য পাপজনক শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই সেকথা জানা রয়েছে। হাজার হাজার বছরে একটি মনও যে স্থির হয় নি ফলে কুত্রাপি একটি মূর্তিরও অপসারণ ঘটে নি উপরন্তু মূর্তিপূজাকে যে আসল

কাজ বলে চিরস্থায়ী ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সে দৃশ্যও তাঁদের চোখের সম্মুখেই রয়েছে।

অথচ এর প্রতিকারের কোন উদ্যোগ তাঁরা গ্রহণ করছেন না। এমন কি এই প্রশিক্ষণমূলক ব্যবস্থাটি যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ক্ষণিকের তরেও সেকথা তাঁরা ভেবে দেখছেন না।

অবশ্য এর কারণও রয়েছে। আমরা মনে করি এর অন্যতম প্রধান কারণটি হলো—মূর্তিপূজাকে সত্য সনাতন এবং অভিষ্ট সিদ্ধি ও ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ লাভের সুপরিক্ষিত একমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে জনমনে যে বিশ্বাস গড়ে তোলা হয়েছে এবং হাজার হাজার বছরে যে বিশ্বাসের শিকড় মস্তিস্কের প্রতিটি রন্ধ্রে এবং প্রতিটি শিরা-উপশিরায় বদ্ধমূল হয়ে গেড়ে বসার সুযোগ পেয়েছে তাকে অপসারিত করা কত কঠিন সেকথা তাঁরা জানেন এবং জানেন বলেই তাঁরা এই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

এতদ্বারা তাঁরা যে তাঁদের নৈতিক এবং সামাজিক দায়িত্বকে ভীষণভাবে উপেক্ষা ও অবহেলা করে চলেছেন অতীব দুঃখের সাথে সেকথা না বলে পারা যাচ্ছে না।

অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় বাধা-বিঘ্ন এবং বিপদ-আপদ অবশ্যম্ভাবী, সকলেই যদি এই বাধা-বিঘ্ন ও বিপদাপদের ভয়ে দায়িত্ব পালনে বিরত থাকে তবে গোটা জাতিকেই ধ্বংসের কবলে নিপতীত হতে হয়। আর এজন্য তাদিগকেই দায়ী হতে হয়—যারা সব কিছু জেনে বুঝেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

পূর্বেই বলেছি আমি নিজেও মূর্তিপূজক ছিলাম; মূর্তিপূজা সম্পর্কে আমার সাধ্যানুযায়ী আমি দীর্ঘদিন নিবিষ্ট মনে চিন্তা গবেষণা করেছি। ফলে তার অসারতা এবং ক্ষতিকর দিকগুলি আমার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সুতরাং সংশ্লিষ্ট মহলের কাছে সেগুলো তুলে ধরাকে আমি আমার একটি অপরিহার্য নৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব বলে মনে করি। এই দায়িত্ব পালনের কাজে অন্যান্যদের মতো নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা হলে মহাবিচারের দিনে মহান বিশ্বপ্রভুর কাছে আমাকে যে ভীষণ ভাবে দায়ী হতে হবে সে সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

এই দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই সকল প্রকার ভয়-ভীতি, বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ, নিন্দা-সমালোচনা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করে প্রায় সারাটি জীবন আমার সীমিত সাধ্য শক্তি অনুসারে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা আমি করে চলেছি।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত এবং বার্ধক্য কবলিত অবস্থায়ও আমি আমার সেই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। "মূর্তিপূজার গোড়ার কথা"-ই আমার লিখিত একমাত্র পুস্তক নয়। ইতিপূর্বেও এই একই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি পুস্তক-পুস্তিকা আমাকে লিখতে হয়েছে।

এসবের মধ্যে আমার বৈষয়িক স্বার্থ রয়েছে বলে কেউ যদি মনে করেন সে কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে, এসব পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রয়-লব্ধ অর্থের এক কপর্দকও আমি গ্রহণ করিনা বা নিজের কাজে ব্যয় করি না। এসবের বিক্রয়-লব্ধ প্রতিটি পয়সা "ইসলাম প্রচার সমিতি"র তহবিলে জমা হয় এবং সমিতির কাজে ব্যয় হয়।

এমনও দেখা গিয়েছে যে, কোন কোন সময়ে লাভের পরিবর্তে সমিতিকে লোকসানই বহন করতে হচ্ছে। কেননা অমুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নিদিগের নিকট থেকে এসব পুস্তকের কোন মূল্য বা বিনিময় গ্রহণ করা হয় না। বিনা মূল্যে এবং চাহিদা অনুযায়ী দূরবর্তী স্থান সমূহে বিনা মাশুলে এগুলো প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সমিতিকে লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়।

এসব পুস্তকাদি লিখে নাম, যশ, প্রসংশা, ধন্যবাদ প্রভৃতি কোন কিছু লাভের সামান্যতম ইচ্ছা এবং আগ্রহও আমার নেই। আজ জীবনের বেলা-ভূমিতে দাঁড়িয়ে ওসবের কোন কিছু চিন্তা করার মানসিকতাও আমার নেই। দায়িত্ব পালনের ত্রুটির জন্য সমাজ এবং মহান বিশ্বপ্রভুর কাছে ক্ষমা লাভের একমাত্র বাসনা নিয়েই আমি একাজ করে চলেছি।

পরিশেষে সাধারণ ভাবে গোটা হিন্দুসমাজ এবং বিশেষ ভাবে আমার প্রাণ প্রিয় ভট্টাচার্য সম্প্রদায়ের কাছে আমার অন্তরের একটি আকুল আবেদন জানিয়ে প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই।

জানি, আমার এই আবেদনকে তাঁদের অনেকেই অতীতের মতো উপেক্ষা অবহেলা প্রদর্শন অথবা ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করবেন। তবে যিনি যা-ই ভাবুন এবং যা-ই করুন আমার কর্তব্য আমাকে পালন করে যেতেই হবে।

সেই আবেদনটি হলো—লিঙ্গ বা শিবলিঙ্গ পূজার বিষয়টি বিশেষ ভাবেই ভেবে দেখার আবেদন। অবশ্য এই লিঙ্গপূজার সমর্থনে বহু দার্শনিক ব্যক্তি আপনাদের রয়েছে এবং বিজ্ঞতা সহকারে সেগুলোকে উপস্থাপিত করতেও আপনারা সক্ষম। কিন্তু যত কিছুই থাক বাহ্যতঃ এটা যে অশ্লীল, বিভৎস এবং আধুনিক সভ্য-শিক্ষিত সমাজের একান্তই অনুপযুক্ত সে কথা কোন ক্রমেই আপনারা অস্বীকার করতে পারেন না।

সুদূর অতীতের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল হলেও বর্তমান পরিবেশে লিঙ্গপূজা যে ভীষণভাবে অসমঞ্জস এবং রুচি বিগর্হিত কাজ আপনাদের মতো জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি যে সেকথা বোঝেন না এটা কোন ক্রমেই স্বীকার করে নেয়া যায় না।

অতীতের সাথে সুসমঞ্জস ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি অগ্রগতির সাথে তেমন বহু কিছুকেই বর্জন অথবা যুগোপযোগী করে নিয়ে আধুনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলা হয়েছে।

এমতাবস্থায় শিবলিঙ্গ পূজার কাজটি আপনাদের পুনর্বিবেচনার দাবী রাখে বলেই আমি মনে করি। আপনাদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে বহুদিন পূর্বে শিবলিঙ্গপূজা বর্জন করে এসেও আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। মাঝে মাঝেই আমাকে এ নিয়ে ভীষণ ভাবে বীরূপ ও লজ্জাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এ সম্পর্কে দুটি মাত্র বাস্তব ঘটনা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে এখন থেকে ১১ বছর পূর্বে। আমার ছেলে মোহাম্মদ শামসুদ্দোহা তার জনৈক বন্ধুকে সাথে নিয়ে কার্যোপলক্ষে কলকাতা গিয়েছিল। আমার পরামর্শ অনুযায়ী একদিন তারা আমার ভগ্নিপতির বাসায় যায়। তিনি সে সময়ে পূজামন্ডপে লিঙ্গমূর্তিকে সম্মুখে রেখে চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায় ধ্যান করতে ছিলেন।

পূজার পরে তিনি বাইরে আসেন এবং বেশ হৃদ্যতা সহকারে উভয়ের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। আমার ছেলের বন্ধুটি কৌতুহল বশতঃ জানতে চায় যে, তিনি এতক্ষণ যে মূর্তিটির পূজা ও ধ্যান করলেন ওটা কোন্ দেবতার মূর্তি। সেটা যে শিবলিঙ্গের মূর্তি আমার ভগ্নিপতির উত্তরে সে কথা সে জানতে পারে।

কিছুটা সময়ের অভাব আর কিছুটা দ্বিধা-সংকোচের কারণে মূর্তিটির আর কোন পরিচয় সে জানতে চায় নি। কিন্তু জানার একটা বিশেষ আগ্রহ সে পোষণ করতে থাকে।

ঢাকায় ফিরে এসে একদিন কথা প্রসঙ্গে 'শিবলিঙ্গ' বলতে কোন্ মূর্তিকে বোঝায় এবং কেন তার পূজা করা হয় ছেলেটি সহজ-সরল ভাবে আমার কাছে সে কথা জানতে চায়।

পুত্রের বন্ধু হিসেবে ছেলেটি আমার পুত্র সদৃশ। শিবলিঙ্গের উৎপত্তি এবং পূজার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরাণ সমূহে যেসব বিবরণ রয়েছে পুত্র সদৃশ ছেলেটির কাছে তা তুলে ধরা এবং সম্ভাব্য প্রশ্নাদির উত্তর দেয়ার বিষয়টি চিন্তা করতেই লজ্জায় এবং দুঃখে আমি ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। বাধ্য হয়ে কৌশলে সেদিন তার প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যেতে হয়। পরবর্তী সময়েও নানা কৌশলে এ প্রশ্নের পুনরুল্লেখের সুযোগ তাকে আর আমি দেই নি।

অন্য ঘটনাটি ঘটে নাটোর দিঘাপাতিয়া জমিদারের সুপ্রসিদ্ধ কালী-বাড়ীতে। তখন আমি সরকারের কৃষিতথ্য কেন্দ্রে চাকুরী করি। আমেরিকার জনৈক উপদেষ্টা সহ আমরা কতিপয় সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন কৃষি প্রকল্প দেখার জন্য নাটোর গিয়েছি। উপদেষ্টা সাহেবের আগ্রহাতিশয্যে আমরা নাটোর এবং দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ী দেখে কালী বাড়ীতে যাই।

হঠাৎ পাথরের বৃহদাকৃতি লিঙ্গমূর্তিটির প্রতি সাহেবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওটা কিসের মূর্তি পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাছে সেকথা তিনি জানতে চান। উক্ত ভদ্রলোক সাহেবকে আমার কথা বলেন এবং দলের মধ্যে একমাত্র আমিই যে ও-সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত সে কথাও সাহেবকে জানান।

তখন শুধু সাহেবই নন উপস্থিত সকলে ও-সম্পর্কে কিছু বলার জন্য আমাকে অনুরোধ করতে থাকেন। কিন্তু একজন বিদেশী সাহেবের কাছে এই লিঙ্গমূর্তির ব্যাখ্যা প্রদান করলে বাঙ্গালী জাতি বিশেষ করে হিন্দু-সমাজের রুচি, প্রকৃতি, শালীনতা-বোধ প্রভৃতি সম্পর্কে তার মনে কি ধারণার সৃষ্টি হবে এবং হয়তো এ নিয়ে তিনি ঠাট্টা বিদ্রূপও করতে পারেন ইত্যাদি ভেবে আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ি। অবশেষে সকলের পিড়াপিড়িতে বেশ কিছুটা রেখে-ঢেকে একটা মনগড়া উত্তর দিয়ে আমাকে সেদিন রেহাই পেতে হয়।

বলা বাহুল্য, জীবনে অনেকবারই এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, হয়তো মৃত্যুর পূর্বে এ থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব হবে না।

এসব ছাড়াও পথ চলতে শিবলিঙ্গের কোন মূর্তি চোখে পড়ার সাথে সাথে একটি কথাই বিশেষভাবে এবং অত্যন্ত বেদনার সাথে আমার মনের মাঝে তোলপাড় করতে থাকে। সে কথাটি হলো: সাধারণ ভাবে গোটা হিন্দুসমাজ এবং বিশেষ ভাবে আমার প্রাণপ্রিয় এবং স্নেহ ও শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয়-স্বজনেরা আজও একটি অপরিহার্য এবং মহাপুণ্যজনক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে শিবলিঙ্গের পূজা করে চলেছেন আর তাদের অলক্ষ্যে আধুনিক বিশ্ব অতীব বিস্ময়ের সাথে তাদের এবং তাদের এই লিঙ্গমূর্তির দিকে চেয়ে শুধু বিদ্রূপের হাসিই হাসছে না—তাদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রুচি, শালীনতাবোধ এবং লজ্জাশীলতা সম্পর্কেও ভীষণ ভাবে সন্দীহান হয়ে উঠছে।

তাই আজ বৃদ্ধ বয়সে হৃদয়ের সকল ব্যাকুলতা নিয়ে হয়তো শেষ বারের মতো আপনাদের কাছে এই আবেদনই জানাচ্ছি যে—আধুনিক বিশ্বে সাধারণ-ভাবে কোন কল্পিত দেবদেবীর মূর্তি এবং বিশেষ ভাবে শিবলিঙ্গের মূর্তি উপাস্য হিসেবে পূজা পেতে পারে কিনা গভীর ভাবে সে কথাটা আপনারা ভেবে দেখুন এবং এ কথাটাও ভেবে দেখুন যে এই পূজার দ্বারা বিশ্ববাসীর কাছে আপনারা অজ্ঞ, লজ্জাহীন এবং বিকৃত রুচি সম্পন্ন বলে পরিচিত হচ্ছেন কিনা।

শেষ বিচারের দিনে আমাকে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে বিশেষ ভাবে দায়ী হতে হবে বলে অতঃপর মুসলমান সমাজের কাছে হয়তো শেষ বারের মতই একটি আকুল আবেদন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি কঠিন সতর্কবাণী রেখে যেতে চাই। আর তা হলো:

ইসলাম এবং একমাত্র ইসলামই বিশ্ববাসীকে নির্ভেজাল তাওহীদের উদাত্ত আহবান জানিয়েছে এবং আদর্শ মানুষ ও আদর্শ তওহীদবাদী হয়ে গড়ে ওঠার নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য পথও প্রদর্শন করেছে। আর একমাত্র এপথেই যে যাবতীয় পুতুল, প্রতিমা, মূর্তি, প্রতীক, প্রতিকৃতি, রাজা-বাদশাহ, সাধু সজ্জন, গুরু-পুরোহিত, নেতা, প্রিয়জন, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, সম্পদ, স্বজন প্রভৃতি এক কথায় তাগুতি শক্তির পূজা এবং আনুগত্য থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে কথাও ঘোষণা করেছে।

মুসলমান অর্থাৎ ইসলামের ধারক এবং বাহক হিসেবে বিশ্ববাসীকে সার্থক ও সফল ভাবে এই পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আপনাদেরই। বিশেষভাবে এবং প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখা প্রয়োজন যে নিষ্ঠার সাথে এবং যথাযথ ভাবে এই দায়িত্ব পালন করা না হলে বিশ্বপ্রভুর কাছে আপনাদিগকে শুধু ভীষণ ভাবে দায়ী-ই হতে হবে না কর্তব্যে অবহেলার জন্যে আপনাদের সার্বিক জীবনেও নেমে আসবে চরম দুর্গতি।

এর কোনটাই আমার নিজের কথা নয়। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের বাণীকেই আমি আমার নিজের ভাষায় এখানে তুলে ধরলাম।

ইসলামের সৌন্দর্য বিশেষ করে তার তওহীদি শিক্ষায় মুগ্ধ হয়েই আমি এবং আরো অগণিত ব্যক্তি সহায়-সম্পদ, স্বজন-পরিজন, বাড়ী-ঘর প্রভৃতি সবকিছু পরিত্যাগ করতঃ যুগে যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে।

আমরা সুস্পষ্ট রূপে দেখতে পাচ্ছি যে আপনারা আপনাদের উপরোক্ত সু-মহান দায়িত্বকে শুধু ভীষণ ভাবে অবহেলাই করে চলেছেন না—আপনাদের অধিকাংশের মধ্যে সেই দায়িত্বের অনুভূতিটুকুও বিদ্যমান নেই।

অতীব দুঃখ এবং হতাশার বিষয়ঃ অবস্থা এখানে এসেই থেমে যায় নি। আপনাদের অনেকেই নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারা তাওহীদের চরম অবমাননাও করে চলেছেন। আপনাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে পীরপূজা, নেতা পূজা, গোত্রপূজা, কবর পূজা, দেশপূজা, স্থানপূজা, ভাষা-পূজা, লগ্নপূজা, দিনপূজা, আত্মপূজা, প্রভৃতির যে সমারোহ ও তান্ডবতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা ইতিমধ্যেই বিশ্বের নাম করা মূর্তিপূজক সমাজ গুলিকে হার মানিয়েছে।

সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা প্রয়োজন যে আমাদের প্রাণপ্রিয় আত্মীয় স্বজন এবং বিশ্বের কোটি কোটি অমুসলমান আপনাদের এই কার্য্যকলাপের জন্য ইসলামের সৌন্দর্য অনুভব করতে পারছেনা এবং ইসলাম গ্রহণের তাৎপর্য অনুধাবণ করতে পারছেনা।

অতএব আপনাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ! দয়া করে আপনারা ফিরে আসুন এবং আপনাদের উপরে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে মহান দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করুন।

অন্যথায় নিজেদের জীবনে চরম দুর্গতি ছাড়াও বিশ্বের এই কোটি কোটি মানুষের পথ-ভ্রষ্টতার জন্য আপনারা তো দায়ী হবেন-ই উপরন্ত আমরা নওমুসলিমেরাও হয়তো আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বজন পরিজনদিগের ইসলাম গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্যে মহান আল্লাহ্‌র দরবারে বুকফাটা আর্তনাদ সহকারে আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করতে বাধ্য হবো।

মহান আল্লাহ তাঁর অর্পিত দায়িত্ব সমূহকে অতীব নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে আমাদিগকে পালন করার তওফিক দান করুন এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আমাদিগকে তৎপর ও একনিষ্ঠ করে তুলুন তাঁর সুমহান দরবারে আকুল ভাবে এই প্রার্থনাই জানাই, আমিন।

পরিশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার অংশ বিশেষ সুধী পাঠক বর্গকে উপহার দিয়ে বিদায় গ্রহণ করছিঃ

মুগ্ধ ওরে স্বপন ঘোরে
যদি প্রাণের আসন কোণে।
ধূলায় গড়া দেবতারে
লুকায়ে রাখিস আপন মনে॥
চিরদিনের প্রভু সে যে
তোদের তরে বিফল হবে
বাইরে সেযে দাঁড়ায়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে॥

সমাপ্ত

লেখকের আরো তথ্য সমৃদ্ধ কতিপয় গ্রন্থ :

প্রকাশিত :

- বিশ্বনবী (সঃ)-এর বিশ্ব সংস্কার
- রোজাতত্ব
- 'আমি' কে ?

প্রকাশের পথে :

- দ্বীন, ধর্ম ও রিলিজন (যন্ত্রস্থ)
- পর্দার ইতিবৃত্ত
- পাপ ও পাপী
- নামাযের দার্শনিক তত্ব
- 'এপ্রিল ফুল'-এর বেড়াজালে মুসলমান
- অশ্রু দিয়ে লিখে যাই

বিঃ দ্রঃ লেখকের প্রকাশিত অবশিষ্ট গ্রন্থাবলীর নাম ইপ্রস কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় দেখুন।

ইসলাম প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

আরও কয়েকটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই

মওলানা অবুল হোসেন ভট্টাচার্য্যের

১।	আমি কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম ?			১৫'০০	
২।	আমি কেন খৃীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলাম না	১৫'০০	সাদা	১২'০০	নিউজ
৩।	ইতিহাস কথা কয়			১৫'০০	,,
৪।	শেষ নিবেদন	৮'০০	,,	৫'০০	,,
৫।	বিড়াল বিভ্রাট	৫'০০	,,	৪'০০	,,
৬।	আর্তনাদের অন্তরালে	৬'০০	,,	৪'০০	,,
৭।	ঠাকুর মার স্বর্গযাত্রা	৩'৫০	,,	২'৫০	,,
৮।	উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে	৫'০০	,,	৩'৫০	,,
৯।	কোরবানীর মর্মবাণী	৬'০০	,,	—	—
১০।	নবী দিবস	৩'০০	,,	—	—
১১।	কারবালার শিক্ষা			২'৫০	,,
১২।	দীন ধর্ম রিলিজিয়ন (যন্ত্রস্থ)				
১৩।	একটি সুগভীর চক্রান্ত ও মুসলমান সমাজ			২'৪০	,,

সুশান্ত ভট্টাচার্য্যের

১৪।	বেদ-পুরাণে আল্লাহ ও হযরত মুহাম্মদ (সঃ)	১৫'০০
১৫।	বিশ্বপ্রভুর আসল নাম	৪'০০

অধ্যক্ষ মওলানা আবদুর রাজ্জাকের

১৬।	মানবতার মুক্তির পথ	১৩'০০

জনাব লুতফর রহমানের

১৭।	কেন ইসলাম গ্রহণ করিলাম	১০'০০

ডাঃ এস, এম, আহসানুজ্জামানের

১৮।	দশচক্রে ভগবান ভূত	২'০০